সাহিত্যের বিচিত্র জগৎ

ডঃ স্নেহময় সিংহরায়
এম এ পি এইচ ডি

সাহিত্যশ্রী পাবলিশার্স
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪০৬
এপ্রিল ১৯৯৯

প্রকাশক
শ্রীতপনকুমার ঘোষ
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৯

লেজার টাইপ সেটিং
শ্রীসনৎকুমার মাইতি
লেজার রাইটার
২১/৪ জি. টি. রোড (দক্ষিণ)
হাওড়া ১

মুদ্রাকর
শ্রীমৃণালকান্তি বিশ্বাস
শান্তিমুদ্রণ
৩২/৩ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

কবি দার্শনিক আর সমালোচনার গুরু তুমি –
তোমার সৌন্দর্যে ও জ্ঞানে ধন্য হল প্রিয় বঙ্গভূমি,
স্নেহে তুমি সুকোমল, শিক্ষাগুরু, শাসনে কঠিন,
তোমার স্মরণে আজ কাঁদে চিত্ত শ্রদ্ধায় বিলীন।
কবিগুরু আশীর্বাদ দিলেন তোমায় প্রীতিভরে
এ দীনের প্রণতিও নিবেদিত হল চিরতরে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ (কলিকাতা) এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, স্বনামধন্য কবি সমালোচক ও মানবতাবাদী দার্শনিক প্রয়াত ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র-এর পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে।

তাঁর অশীতিতম জন্মবার্ষিকীতে

১৯৯৭

সালকিয়া, হাওড়া

স্নেহময় সিংহরায়

লেখকের নিবেদন

এই গ্রন্থটি পাঠকসমাজে নিবেদিত মোট ১৬ টি বিভিন্নধর্মী ছোট ও বড়ো প্রবন্ধ নিয়ে প্রধানত সাহিত্য-সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ।

প্রবন্ধগুলি 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'অনুবাদ পত্রিকা', 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা', 'ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর' এবং 'চর্যাপদ' লিটিল্ ম্যাগাজিন ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসঞ্জীবকুমার বসু রবিবাসরীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরী, 'ভারত ও সমাজতান্ত্রিক জি. ডি. আর' পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পঞ্চানন সাহা এবং 'চর্যাপদ' লিটিল্ ম্যাগাজিনের সম্পাদক কবি ও কথাসাহিত্যিক শ্রীতেজেশ অধিকারীর বিশেষ আনুকূল্যে আমার প্রবন্ধসমূহ তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং প্রশংসা লাভ করে। এ জন্য ধন্যবাদ জানাই। কবি সাহিত্যিক ও অধ্যাপক আশিস সান্যাল ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমির 'ইণ্ডিয়ান লিটারেচার' (Indian Literature) পত্রিকার একটি সমীক্ষায় সাম্প্রতিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধকে চিহ্নিত করেছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 'বাংলা সাহিত্যে প্রেম চেতনা' প্রবন্ধ রচনার সময় বিশেষ মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় আমাকে ঐকান্তিক সাহায্য করেছিলেন। তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

আমার প্রবন্ধ রচনার ধারাকে ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখতে গেলে তার যাত্রা শুরুর পর্বের লেখা 'সাহিত্য ও প্রকৃতি' প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে হবে। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে লেখকের যে পরিণতি, তাতে পৌঁছতে তাকে পঁচিশ বছর সময় অতিক্রম করে আসতে হয়েছে।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে আমার যে মনস্বী অধ্যাপক আমাকে সর্বাধিক অনুপ্রাণিত করেছেন, তিনি হচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক পুণ্যশ্লোক প্রয়াত ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র। তাঁর তত্ত্বাবধানে 'রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি উপন্যাসে স্বদেশবোধ বিশ্বমানবরূপের ভাবনা' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী পেয়েছি। তাঁর কাছে আমার ঋণের সীমা নেই। তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করে, আমি নিজেকে আংশিক ঋণমুক্ত মনে করছি।

বাংলা সাহিত্য বিশ্বব্যাপ্ত মহিমা অর্জন করেছে। তার গবেষণা ক্ষেত্রটিও ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর প্রসারিত হয়ে চলেছে। এই গ্রন্থে সংগৃহীত প্রবন্ধগুলো কোন কোনটি যদি গবেষকদের কৌতূহল উদ্রেক করে কিংবা কাজে লাগে, তবে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে মনে করব। সাধারণভাবেও প্রবন্ধগুলো সাহিত্যরসিকজনের প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যদৃষ্টি অর্জন করতে পারবে বলে আমার ধারণা। তাহলে, তাঁদের প্রীতিতেই আমার পরিতৃপ্তির পূর্ণতা।

আমার সমস্ত গবেষণার মুখ্যসহায়িকা আমার স্ত্রী শ্রীমতি অন্নপূর্ণা সিংহরায়। তাঁর কাছে আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা জানানোর চেষ্টা বাহুল্য মাত্র।

গ্রন্থ প্রকাশে শ্রীতপনকুমার ঘোষ মহাশয় যে সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। নিবেদন ইতি—

স্নেহময় সিংহরায়

৬৭, ত্রিপুরা রায় লেন,
ফ্ল্যাট নং ২০২, দ্বিতল
সালকিয়া, হাওড়া-৭১১ ১০৬
১০ই নভেম্বর, ১৯৯৮

সূচীপত্র

সাহিত্যিক ও সাহিত্য

ভাষাতত্ত্ব ও অনুবাদ প্রসঙ্গে

সাহিত্য-সমালোচক-বিষয়ক

কবি ও কবিতা

বিবিধ প্রসঙ্গ

টল্‌স্টয় ও রবীন্দ্রনাথ

—চিন্তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রসঙ্গে

যে কোন মহৎ লেখকের নিজস্ব জীবনদর্শন থাকে, থাকে আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্ববীক্ষা। টল্‌স্টয়ের তা ছিল। রবীন্দ্রনাথেরও। বাইরের দিক থেকে বিচারে টল্‌স্টয় ও রবীন্দ্রনাথের মিল অপেক্ষা পার্থক্যই বেশি করে চোখে পড়ে। কিন্তু চরম লক্ষ্যের বিচারে উভয়ে একই পথের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। সেই পথ মানব-বিশ্বের ঐক্য সংহতি, শান্তি ও প্রগতির পথ ; মানবসমাজে সর্ববিধ শোষণের বাঁধন থেকে মুক্তির পথ। উনিশ শতকে য়ুরোপে রাজ্য-সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে যে বিপ্লব-চেতনা জনসাধারণকে দেশে দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উন্মুখ করে তুলতে চাইছিল টল্‌স্টয়-প্রতিভা তারই বাণীমূর্তি। জীবনের সর্ববিধ ভাবরসকে উপলব্ধি তথা আত্মসাৎ করেও মহাশিল্পী যখন ভোগের পঙ্কে বারংবার আকণ্ঠ নিমজ্জিত হন আর উত্তরণের জন্য আত্মায় অনুভব করেন মরণান্তিক যন্ত্রণা তখন এই দ্বন্দ্ব-ক্ষত যে শিল্পের জন্ম দেয় তাকে বলা চলে জীবনশিল্প। টল্‌স্টয় য়ুরোপের যন্ত্রণাবিদ্ধ বিবেকের রূপকার এবং তার আত্মার গ্লানি পাপ ক্ষয় ও বিনষ্টি থেকে উত্তীর্ণ মহত্তম রূপের ভাষ্যকার, জীবনশিল্পী। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ সুরের গুরু। তিনি যেখানেই মানুষে মানুষে দারুণ আত্মবিচ্ছেদ দেখেছেন, জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের রণহুংকার শুনেছেন, লক্ষ্য করেছেন প্রলয়ের সংকেত— সেখানেই উচ্চারণ করেছেন 'মা মা হিংসী ঃ" শুনিয়েছেন বিশ্বমৈত্রীর বাণী। মানবহিতব্রত উভয়ের জীবনে অলক্ষ্যে রচনা করেছে এক আশ্চর্য সুবর্ণসেতু।

অভিজ্ঞতার জগতে এবং কখনও বা আত্মজীবনের প্রেক্ষাপটে টল্‌স্টয় চিরন্তন মানব-স্বভাবের ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বকে চিত্রিত করেছেন। উদাহরণ, 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' 'আনা কারেনিনা', 'রেজারেকশান' ও 'ইভান ইলিচের মৃত্যু'। অপরপক্ষে অধ্যাত্মজীবনে আত্মনিমগ্ন ভাবরস-সম্মিলনে অপার শান্তিলাভ অপেক্ষা বিশ্বশান্তির সীমাহীনতায় আত্মোৎসর্গ রবীন্দ্র-সাধনার মর্মকথা। উদাহরণ, 'গীতাঞ্জলি' 'বলাকা' 'রক্তকরবী' ও 'ঘরে-বাইরে'।

রবীন্দ্রনাথ ও টল্‌স্টয়—উভয়েই ছিলেন জমিদার। কিন্তু জমিদারি সম্পর্কে তাঁদের বিরূপ মনোভাব ও এই প্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের অন্তরের গ্লানি কথায় ও কাজে ব্যক্ত হয়েছে। জমিদারির তত্ত্বাবধান করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাসী জনসাধারণের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের কল্যাণ ও সেবার মানসিকতা লাভ করেন। তাঁর জমিদারি কুষ্ঠিয়ায় বসেই তাঁর মনে শ্রীনিকেতনের কর্মাদর্শ কর্মপরিকল্পনার কথা অস্পষ্টভাবে জেগে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের একথাও মনে হয়েছিল যে, জমিদারকে হতে হবে জমির মালিক নয়, ট্রাস্টি। ট্রাস্টির কাজ কখনোই স্বার্থসিদ্ধি হতে পারে না, বরং তা হবে জনসেবার অভিমুখে উৎসর্গীকৃত। রাশিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৩০ সনে প্রতিমা দেবীকে লিখিতপত্রে তিনি লিখেছেন, 'ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। ... নিজেদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষি প্রজাদের উপরে যেন আর চাপাতে না হয়। ......

বহুকাল থেকেই আশা করছিলুম, আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদের জমিদারি হয়—আমরা যেন ট্রাস্টিব মত থাকি। অল্প কিছু খোরাক-পোশাক দাবি করতে পারব কিন্তু সে ওদেরই অংশীদারের মত।' এই সময়ে রথীন্দ্রনাথের কাছেও তিনি অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করে জমিদারি প্রসঙ্গে লেখেন, 'ও জিনিসটির উপরে অনেককাল থেকেই আমার মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেছি এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারির ব্যবসায়ে আমার লজ্জাবোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নিচে নেমে এসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি। প্রশ্ন এই যে, রবীন্দ্রনাথ শোষণ ও পরোপজীবিত্বের দিকগুলি বর্জন করে তাকে কোণ কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন? এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত খুব স্পষ্ট। তিনি জনহিতকর কাজে জমিদারির সমস্ত আয় দান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কর্মসাধনা ব্যাপক রূপ লাভ করতে না পারলেও তার সংক্ষিপ্ত রূপের পরিচয় আছে শ্রীনিকেতনে বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা ও তার রূপায়ণের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, চীনের মত ভারতবর্ষ পল্লীপ্রধান। ইংরেজ এসে আমাদের সেই পল্লীজীবনের বন্ধন কেটে দিয়েছে। দেশকে রক্ষা করতে হলে তাই তাঁকে গ্রামের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে—কবির মনে এই ধারণা ছিল বদ্ধমূল। অমিয় চক্রবর্তীকে ১৯৩৪ সালের ১৫ নভেম্বর তারিখে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছিলেন, 'শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ'। বলা বাহুল্য, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরিকল্পিত দু'ধরনের কাজের সূচনা করেছিলেন। আশ্চর্য হতে হয় এই ব্যাপার লক্ষ্য করে যে, এর বহুপূর্বে টল্স্টয়ও জমিদারি-প্রথার ওপর বিরূপ হয়েছিলেন। শাসন ও শোষণ অথবা অত্যাচার না করে জমিদারি চালানো যায়না। এসবই তাঁর কাছে মানবতা-বিরোধী ও অন্যায়। তাঁর মতে, সব জমি চাষীদেরই দিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু এত বড় ত্যাগের জন্য তার পরিবার প্রস্তুত ছিল না। প্রকাশকের হাতে গ্রন্থ দিয়ে লাভ কম হত বলে তাঁর গৃহিণী ১৮৮১ সাল পর্যন্ত তাঁর লেখা গ্রন্থের প্রকাশিকা হয়েছিলেন। টল্স্টয়ের পুত্রকন্যা ছাড়া বিস্তর আশ্রিতা ছিল। ক্রমে ব্যয়নির্বাহ করা কঠিনতর হয়ে ওঠায় তাঁর পত্নী সোনিয়া নিজেই জমিদারির ভার গ্রহণ করেন। তাঁর কড়াকড়ির জন্যে চাষীদের কাছে টল্স্টয়ের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। অসৎ উপায়ে গাছ কাটার জন্যে জমিদারপত্নী কয়েকজনের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। তাদের শাস্তি হয়। টল্স্টয়ের মতে একাজ অধর্ম। তাঁর স্ত্রীর মতে আইনসঙ্গত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের শেষপর্বে এসে 'ঐকতান' কবিতায় বলেছিলেন— 'চাষী ক্ষেতে চালাইছে হাল,/ তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল— / বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার, / তারি ' পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার। / অতিক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে / সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে / মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ; / ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে । / জীবন যোগ করা / না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা'। তিনি যে সমাজের উঁচুতলার লোক,



জনসাধারণের সঙ্গে একাসনে বসতে তাঁর যে বাধা ছিল সেই বেদনা কখনও কখনও তাঁকে পীড়িত করেছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, রুশ বিপ্লবের বহু আগেই টল্‌স্টয় ক্রান্তদর্শী মনীষীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলতে শুরু করেছিলেন যে, উঁচুনীচু- সমাজভেদ তিনি মানেন না। তিনি দরিদ্রের সঙ্গে দরিদ্রের মত থাকতে চান। ধনীদের সঙ্গে ধনীদের মত থাকায় তাঁর একান্ত অনিচ্ছা। চাষীদের মত পোশাক পরা এবং সেই পোশাকে মুচির মত বসে জুতো তৈরি করা হল টল্‌স্টয়ের নিত্যকর্ম। কিন্তু টল্‌স্টয় শ্রেণী-বিচ্যুত হতে চেয়ে পরিবার থেকে তীব্র বাধা পান। সোনিয়া তাঁর সন্তানদের শ্রেণী-বিচ্যুত হতে দেবেন না। জন্মসূত্রে তো তারাও কাউন্ট ও কাউন্টেস্‌।

বিপ্লব-পূর্ব জার-শাসিত রাশিয়ায় তাঁর জন্ম হলেও, টল্‌স্টয় ছিলেন সর্বকালের সমকালীন মানুষ—কারণ, তাঁর মত ও আদর্শের উদারতা ও ব্যাপ্তি। দরিদ্র অশিক্ষিত ও কঠোর শ্রমজীবী রুশ-অধিবাসীদের দুঃখ তাঁকে পীড়িত ও বিচলিত করত। ১৮৫৭-তে তাঁর প্রথম য়ুরোপ ভ্রমণ শেষে তিনি ডায়েরীতে লিখেছিলেন ; 'দ্য আইডিয়া কেম ক্লিয়ারলি এ্যাণ্ড স্ট্রংলি ইনটু মাই হেড টু স্টার্ট এ স্কুল ইন মাইন ওন ভিলেজ ফর দ্য হোল ডিস্ট্রিক্ট, এ্যাণ্ড জেনারেল এ্যাক্টিভিটি অফ্‌ দ্যাট কাইণ্ড'। গ্রামের আশেপাশের কৃষকদের ছেলেমেয়েদের নিজের বাড়িতে ডেকে এনে খুলেছিলেন এক বিদ্যালয়। নিজেই পড়াতেন। সব খরচ, এমনকি তাদের দুপুরের খাবার খরচও তাঁর নিজের অর্থ থেকে দিতেন। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যচর্চা ছেড়ে এদের জন্যে সহজ পাঠ্যবইও লিখেছেন, লিখেছেন ব্যাকরণ। রবীন্দ্রনাথও এ ধরনের কাজ করেছেন, এ সকলের জানা। সুতরাং শিক্ষাসংস্কার ও গ্রামোন্নয়নের ব্যাপারে টল্‌স্টয় রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী বললে অত্যুক্তি করা হয়না। রবীন্দ্রনাথ এমন বহু গ্রন্থ লিখেছেন যা তাঁর মত প্রতিভাবানের লেখার কোন দরকার ছিল না ; তবু জনসাধারণের জন্যেই সবকিছু লিখেছেন। টল্‌স্টয়ের ওপর এ চিন্তা একসময় ভর করেছিল যে, তাঁকে 'লিটরেচার ফর দ্য পিপল' সৃষ্টি করতে হবে। কারণ, তা না হলে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। এ একরকম দায়িত্ব—যা মহতের মধ্যে শোভা পায়।

খ্রীষ্টে আস্থা না হারালেও টল্‌স্টয় চার্চে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর ডায়েরী থেকে জানা যায়, তিনি একবার একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। সে ধর্মের লক্ষ্য 'কনসোনেন্ট উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ম্যান'। মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই তাঁর জীবন-দর্শন ও ধর্ম-দর্শনের মূলকথা। এই দর্শনচিন্তাকে তিনি তাঁর রচিত সাহিত্য এবং কর্মে রূপ দিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে মানুষ ও তার বোধশক্তির ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন, বলেছেন, 'আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। আর একথাও তাঁর মতবাদের চরম সীমাকে প্রসারিত করেছে যে, 'এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। তাঁর বাইরে অন্য কিছু থাকা না-থাকা মানুষের পক্ষে সমান। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।'

রাষ্ট্রচিন্তাব ক্ষেত্রে টল্‌স্টয় ও রবীন্দ্রনাথের মতের মিল লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, গান্ধীজীও এই দুই মনীষীর সঙ্গে এ ব্যাপারে, ঐক্যমত্য লাভ করতে পেরেছিলেন। এই তিন মনীষীর ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনচিন্তারই অংশ রাষ্ট্রচিন্তা। এই জীবনচিন্তার মধ্যে ছিল দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ;—প্রথমত, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্বমানবসমাজের প্রতি শুভেচ্ছা। টল্‌স্টয় যে রাষ্ট্র ও চার্চের বিরোধিতা করেছিলেন, তার কারণ এই দুইয়ের প্রতি ছিল তাঁর অন্তরের ক্ষোভ। যীশুখ্রীষ্টের জীবনের মূলকথা অহিংসা ও প্রেম ; আর রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে হিংসা ও অপ্রেম বা দমননীতি। চার্চ রাষ্ট্রেরসঙ্গে মিলেযেদিন থেকে একসঙ্গে চলতে শুরু করেছে সেদিন থেকে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং যীশুকে অবমাননা করেছে। তাই চার্চকে বর্জন করাই কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি'। ধর্মমন্দিরে ও পুরোহিততন্ত্রে এই প্রেমের অভাব লক্ষ্য করেই তিনি লিখেছিলেন—

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

—১৫ নং কবিতা, 'পত্রপুট'

"ভগবানের রাজ্য তোমার নিজের ভিতরেই' (দ্য কিংডম গড ইজ উইদিন ইউ)—এই বইটিতে টল্‌স্টয় বলতে চেয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় বিধানের ফাঁদে পড়ে দাস না হয়ে যন্ত্র না হয়ে নিজের স্বাধীন হৃদয়ে মনুষ্যত্ববোধকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তার মধ্য দিয়েই নিজের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের কর্তব্য। গান্ধীজীর অভিমত এই ছিল যে, অহিংসা দ্বারা স্বরাজলাভ নিখিল মানবের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র অহিংসার ভিত্তিভূমিতেই সত্যিকারের বিশ্বজাতিসংঘ গড়ে ওঠা সম্ভব। রাষ্ট্র কোন ক্ষেত্রেই হিংসাত্মক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে না—রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবে একথা কোথাও বলেননি। কিন্তু গান্ধীজী যখন কেবল ভারতবর্ষ নয়, জগতেরও রাষ্ট্রক্ষেত্রে অহিংসার বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন, তখন তিনি তাঁর প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। রাষ্ট্রচিন্তায় অহিংসাকে টল্‌স্টয় ও গান্ধীর মত মৌলিক সত্য বলে গ্রহণ করতে না পারলেও তাকে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে মহৎ আদর্শরূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ, শারীরিক শক্তি অপেক্ষা নৈতিক ও আত্মিক শক্তির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল চিরকালই অধিক। বিশ্বশান্তির সপক্ষে টল্‌স্টয় ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পরিচ্ছন্ন ও উদার।



গান্ধীজী সত্য ও অহিংসার পথ অবলম্বন করে জীবনপথে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং কখনও কোন অবস্থাতেই এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি ভারতবর্ষের মুক্তিসন্ধানী বলে সচরাচর পরিচিত, কিন্তু তা হতে গিয়ে বিশ্ববিমুখতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁকে পেয়ে বসেনি। তাই তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, 'আমি ভারতের সেবক নই, সত্যের সেবক।' ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমৈত্রীর পথ ধরে চিরকাল অগ্রসর হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেই পথেরই পথিক। তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন যে, 'যথার্থ পুরাতন ভারত, যে-ভারত চিরনূতন— যে ভারতের বাণী, আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু য পশ্যতি— তাকেই আমি চিরদিন ভক্তি করেছি। ... আমার চিত্ত মহাভারতের অধিবাসী— এই মহাভারতের ভৌগোলিক সীমানা কোথাও নেই।' সমগ্র মানবসমাজের শান্তির অন্বেষণে যাত্রা শুরু করে টলস্টয় পৌঁছেছিলেন খ্রীষ্টের পাঁচটি নির্দেশেঃ— আক্রোধ (ডু নট বি এ্যাংরি), অনাসক্তি (ডু নট লাস্ট), ধৈর্য (ডু নট গিভ এ্যাওয়ে দ্য কন্ট্রোল অফ ইওর ফিউচার এ্যাক্সন্স), অপ্রতিরোধ (রেসিষ্ট নট হিম দ্যাট ইজ ইভিল) এবং শত্রুদেরও প্রতি করুণায় (লাভ ইওর এনিমিস্)।

টলস্টয়ের কাছে জীবনই মহত্তম প্রাপ্তি, জীবনই ঈশ্বর। এই ঈশ্বরের নামে ব্যবসা চালায়— গীর্জা— অহমিকা হিংসা, আত্মম্ভরিতা স্থবিরত্ব ও মৃত্যুকে তা পোষণ করে চলে। চার্চকে কেন্দ্র করে ধর্মসংঘ এক কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তা সমর্থন করে চলে অশুভ রাষ্ট্রশক্তিকে। রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধার শোষকগোষ্ঠী। রাজভক্তিই দেশপ্রেম— এই বিশ্বাস শোষকেরা জনসাধারণের মনে গেঁথে দিতে চায়। এই ভ্রান্তির সাহায্যে সৃষ্ট প্রবল উত্তেজনাতেই এক দেশের জনগণ অন্যদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অথচ ব্যক্তিগতভাবে কেউ কারও শত্রু নয়। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, রবীন্দ্রনাথও টলস্টয়ের পূর্বোক্ত ধরণের চিন্তাদর্শকে সমর্থন করতে গিয়ে তাঁর শিক্ষাসংস্কার প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বর্তমান কালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টলস্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহা কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।—

'ইট সিম্স্ টু মি দ্যাট ইট ইজ নাউ স্পেশ্যালি ইমপর্টান্ট টু ডু হোয়াট ইজ রাইট কোয়াইটলি এ্যাণ্ড প্লারসিসটেন্টলি, নট ওনলি উইদাউট আস্কিং পারমিশন ফ্রম গভর্ণমেন্ট বাট কনসাসলি অ্যাভয়েডিং ইট্স্ পার্টিসিপেসন'। টলস্টয়কে যে 'গুরুর আসনে' অধিষ্ঠিত দেখেছেন, এটি তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধারই প্রকাশ— সন্দেহ নেই। মনে রাখা প্রয়োজন, চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে উভয়ের মতৈক্য থাকার ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে।

টলস্টয়ের কোন কোন রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন রচনার মিল লক্ষ্য করা দুরূহ ব্যাপার নয়। টলস্টয়ের 'রেজারেকসানে'র সঙ্গে অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের 'বিচারক' গল্পের তুলনা করা চলে। অন্তত দীনদরিদ্র নারীর সামাজিক মূল্য উচ্চবিত্ত সমাজে প্রকৃতপক্ষে কি এবং কতখানি, এ প্রশ্নে উভয় লেখকের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির আশ্চর্য সাদৃশ্য আমাদের

বিস্ময় বিমুগ্ধ করে। টলস্টয় গোর্কিকে বলেছিলেন, 'মানুষ দুর্ভিক্ষ মহামারী দুরারোগ্য ব্যাধি এবং নানারকম আধ্যাত্মিক সঙ্কট পেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু মানুষের জীবনে সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ট্রাজেডি যা চিরকাল থাকবে তা হ'ল শয়নগৃহের।'রবীন্দ্রনাথের চিত্রিত সন্ন্যাসী—প্রতিম শচীশ (চতুরঙ্গ) এবং টলস্টয় কর্তৃক চিত্রিত সন্ন্যাসী ফাদার সিয়েগি (ফাদার সিয়েগি) এই ট্রাজেডি তথা প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্ত নয়। ধর্ম আর কামনার দ্বন্দ্ব টলস্টয়ে যেমন তীব্র সংঘাত সৃষ্টি করেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে তেমন নেই। টলস্টয়ের ধর্মীয় দৃষ্টি অনুতপ্ত পাপীর পরিত্রাণ ও পুণ্যলাভের আকাঙ্কার মত। বহু দুঃখের দহনের মূল্যে এই সব কিছু সে অর্জন করতে পারে। অপরপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের পাপের প্রতি উদাসীনতা ও বৈরাগ্য তাঁর সাহিত্যে প্রশান্তির স্নিগ্ধচ্ছায়া রচনা করেছে। 'ফাদার সিয়েগির গুহাদৃশ্যে সিয়েগির সংযম-সাধনায় এমন নির্মমতা আছে যে, গোর্কির মত লেখকও লিখেছেন, 'তিনি (টলস্টয়) কি নিষ্ঠুর হতে পারেন। আমরা সিয়েগির জন্য সবাই চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলাম তার প্রতি করুণায়।'

টলস্টয়ের 'দ্য ডিভাইন এণ্ড দ্য হিউম্যান অর থ্রি মোর ডেথ্স্' নামক গল্পটি জারের শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদেব সংগ্রামের কাহিনী। বিপ্লবীদের ওপর সরকারের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের অনেক মর্মস্পর্শী বর্ণনা আছে নানা গ্রন্থে। কিন্তু বিপ্লবীদের মনে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংকট-সমস্যা তার নিখুঁত ছবি অন্যত্র দুর্লভ। তবে বিপ্লবীদের মনোজগতের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বেব বর্ণবহুল আর্তির চিত্র রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়ে' আবেগস্পন্দিত ভাষায় ও লিরিকেয় প্রবাহের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।

রাশিয়ার ইতিহাস যে কিভাবে বদলে যাচ্ছিল—প্রতিভার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে টলস্টয় তা জানতেন। ধনী জমিদার ও উচ্চবিত্ত সমাজের আভিজাত্য এবং বিলাস-আড়ম্বর ইত্যাদির দিন চলে গিয়ে যে দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন আসছে টলস্টয়ের সাহিত্যে তারই পূর্বাভাস পরিস্ফুট হয়েছে। 'আনা কারেনিনা' উপন্যাসের লেভিন আগে মনে করত ফসল তোলা, ঠিকে মজুরের কথা ইত্যাদি প্রসঙ্গ খুবই একটা নিকৃষ্ট ব্যাপার ; কিন্তু এখন তার মনে হ্ল, ঐসব ব্যাপারই জীবনযাত্রার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী বিষয়। রবীন্দ্রনাথ 'ওরা কাজ করে' কবিতায় ঐ কথাই বলেছেন—'ওরা চিরকাল/টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;/ওরা মাঠে মাঠে/বীজ বোনে পাকা ধান কাটে।/...রাজছত্র ভেঙে পড়ে; রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;/জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে; রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আঁখি/শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।/ওরা কাজ করে/দেশে দেশান্তরে—'। এই যে দেশে দেশে অসংখ্য মানুষের সাধারণ জীবনধারণের ইতিহাস—এটাই মানুষের প্রকৃত ইতিহাস। সাধারণ মানুষকে দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যের সঙ্গে উপেক্ষা করে কিছু কিছু মানুষ বা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় যে সমাজে সংসারে চিরকাল কর্তৃত্ব করে এসেছে, ক্রমাগত স্ফীতকায় হয়ে উঠেছে ও ধনমদে মত্ত হয়ে থেকেছে তার বিরুদ্ধে একধরণের ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন টলস্টয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্মান জানাতে দ্বিধা করেননি।



বস্তুত টল্‌স্টয় ও রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার স্বরূপ মূলত একই। সত্যই তাঁদের জীবন তথা শিল্পের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। একসময় সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে টল্‌স্টয় ছাড়া এমন অন্য একটি কণ্ঠস্বরও ছিল না। ভার্জিনিয়া উলফ্‌ বলেছেন; আত্মা হচ্ছে রুশ কথা সাহিত্যের প্রধান চরিত্র। চেখভের সাহিত্যে এই আত্মা নম্রতা সূক্ষ্মতা এবং বর্ণবৈচিত্র্যে উপস্থিত, ডস্টয়েভ্‌স্কিতে তার স্থান গভীরতার মধ্যে, ব্যাপ্তিতে। 'সকল উপন্যাসিকের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক' টল্‌স্টয়ের সাহিত্যে জীবন ও তার ন্যায় সত্যবোধ এবং 'কেন বেঁচে থাকা?' এই প্রশ্ন সর্বদা লেখককে ঘিরে থাকে। রাষ্ট্র ও তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকেই অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন তিনি। এরা খ্রীষ্টবিরোধী। এদের দাঁত নখ উৎপাটনের জন্যই তিনি তাঁর 'এক্রাসে ল্যাফাম' অর্থাৎ অশুভকে গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করার তত্ত্ব প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর পন্থাপদ্ধতি প্রস্তুত হয়েছে 'নন-রেসিস্টেন্স টু ইভিল' বা 'অশুভকে শক্তির সাহায্যে প্রতিহত কোরো না।' —এই খ্রীষ্টীয় বাণীকে অবলম্বন করে। তাঁর 'অন সিভিল ডিলওবিডিয়েন্স অ্যাণ্ড নন-ভায়োলেন্স' গ্রন্থে অহিংসা সম্পর্কিত তাঁর সব মতামত অভিব্যক্ত হয়েছে। গান্ধীজী তাঁকে শিক্ষাগুরুর সম্মান দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্যক্তিত্ব' গ্রন্থে লিখেছেন যে, আত্মদানের ইচ্ছায় ব্যক্ত ঈশ্বরের জীবন স্পর্শ করেছে মানুষের জীবনকে। মানুষও তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিশ্বের অভিমুখে অগ্রসর হতে চেয়েছে। যখনি অনৈক্যের সুর বেজে ওঠে, তখনই মানুষ কাতর প্রার্থনা করে 'অসতো মা সদ্‌গময়'। দুঃখ এবং প্রেম মিলিত মিশ্রিত হয়ে এসে পৌঁছেছে মানব-জীবনে। জগতে সব অসতের আঘাত মানুষ সহ্য করতে চেষ্টা করেছে এবং 'প্রমাণ করেছেযে, আত্মার জীবন মৃত্যুহীন'। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের আত্মরূপের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিজীবনের সংকট এবং স্বদেশবোধের উদ্বোধনের সমস্যার দ্বিধাদীর্ণ মুহূর্তে সে প্রার্থনা করেছে, 'হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও—কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিও না ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে'। নিখিলেশের পরিপূরক চরিত্র মাস্টারমশায়। পাশ্চাত্য পররাষ্ট্রগামী রাজনৈতিক উদগ্র লালসা থেকে ভারত বেরিয়ে এসে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুক, এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু তার পথ হবে সত্যের—যা মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে অগ্রসর হবে ভবিষ্যতের দিকে। তিনি বলেছেন, 'সত্যের জন্যে মানুষ মরে অমর হয়, কোন জাতিও যদি মরে তাহলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সর্তের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে'।

টল্‌স্টয়ের শিল্পদৃষ্টি আলোচনা করতে গেলে তাঁর শিল্পচিন্তায় দু'ধরনের শিল্পের সমাদর প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপন করা দরকার। প্রথম, ধর্মীয় শিল্প—যা মানুষ থেকে মানুষে ধর্মীয় অনুভূতির সঞ্চার করে। দ্বিতীয়, সার্বজনীন শিল্প—যা সর্বমানবের নিকট বোধগম্য প্রাত্যহিক অনুভূতিসমূহ সঞ্চারিত করে। তাঁর মতে এই দু'শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শিল্প একান্ত নিকৃষ্ট শিল্প ; কারণ তা মানুষকে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তবে তিনি শিল্প অপেক্ষা

কল্যাণ কর্মকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'লেট কালচার পেরিস বাট জাসটিস ট্রায়াম্‌ফ্‌।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিল্প সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বক্তব্য হল, শিল্প মানুষের বিশুদ্ধ আনন্দ। প্রয়োজন-রহিত নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যসৃষ্টি শিল্পের বিশুদ্ধির পরিচয় বহন করে। তাঁর মতে, শিল্প অপ্রয়োজনের আনন্দ এবং তা মুখ্যভাবে শিল্পীর আত্মোপলব্ধির আনন্দ। অবশ্য কালিদাসের সৌন্দর্য-উপাসনার মধ্য দিয়ে মঙ্গলের উপাসনার আদর্শকেও রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ শিল্পাদর্শ বলে মনে করেছেন।

সত্য ও অহিংসার পথে টল্‌স্টয় তাঁর মহামানবসেবার আদর্শের জন্যে বিশ্ববন্দিত। রবীন্দ্রনাথের কাছে মহামানবসেবার অর্থের বিশেষত্ব আছে। তাঁর ধারণা ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তিমানব এক একটি জীবন-কমল। বহু যুগ ও জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে জীবন-কমল বিকশিত হয়ে উঠছে। অনন্ত জীবন-কমল বিকাশলাভ করতে চাইছে এক পরমপুরুষের 'মানস-সরোবরে'। প্রত্যেক ব্যক্তিমানবের জীবন-বিবর্তন নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে বিশ্বজীবন—সৃষ্ট হচ্ছে মহামানবের ইতিহাস। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ব্রহ্ম-কমল'। অখণ্ড মানবতার বিকাশই হল ব্রহ্ম-কমলের বিকাশ। এই বিকাশকে যতদূর সম্ভব অগ্রসর করে দেবার চেষ্টাই হল মহামানবের সেবা। বিকাশেই মানুষের মুক্তি। 'শাশ্বত মানুষ'কে পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর করে দেবার যে শিল্পজনোচিত ভাবানুভূতি তা-ই তাঁকে মানবতার মহাসাধক টল্‌স্টয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

জনৈক ফরাসী সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে 'হিন্দু টল্‌স্টয়' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর সেই উক্তি সর্বতোভাবে অবিবেচনাপ্রসূত বলে অস্বীকার করা চলে না। নানাদিক থেকে জীবনাচরণে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিশ্বমানবসমাজের কল্যাণে নিরন্তর বিবেকের অগ্নিদহনে দগ্ধ হতে হতে টল্‌স্টয় ও রবীন্দ্রনাথ এর ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন—স্বেচ্ছাবৃত বেদনা ও দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে।

অন্য দৃষ্টিতে আনন্দমঠ

'আনন্দমঠে'র প্রথম খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে আছে—"ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন, এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্র। মা-যা ছিলেন।

ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর-কেশরী প্রভৃতি বন্য পশুসকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্য পশুর আবাস-স্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ,,, ইঁহাকে প্রণাম কর।

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুরঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পথে আইস।" .... ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "দেখ মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী।"

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। ..... আজি দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী।.....

"বন্দে মাতরম্" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন বহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুরঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন।.... দেখিলেন, এক সুবর্ণনির্মিত দশভূজা প্রতিমা নবারুণ কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"এই মা যা হইবেন।" ....

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্‌গদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার এ মূর্তি কবে দেখিতে পাইব?"

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

এখানে এই উদ্ধৃতিতে কয়েকটি পদ ও বাক্যাংশ সবিশেষ লক্ষণীয়। প্রথমত, 'জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমি'। মহেন্দ্র যাঁকে প্রণাম করেছেন তিনি আসলে 'মাতৃভূমি'—তাঁর 'রূপ' দেবী জগদ্ধাত্রী'র মতো। দ্বিতীয়ত, মহেন্দ্র কালীকে যখন প্রণাম করলেন, তখন তিনি কোন শাস্ত্র থেকে প্রাপ্ত মন্ত্র উচ্চারণ করলেন না। তাঁর প্রণাম-মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্।' এখানেও সেই মাতৃভূমির পূজা। তৃতীয়ত, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

—এখানে দেবী দুর্গার অলৌকিক করুণা বা কৃপার কথা নেই। দুর্গা অথবা দেশমাতৃকার সকল সন্তান যখন তাঁর সেবায় নিযুক্ত হবে, তখন তিনি প্রসন্ন হবেন। দেশের পূর্বের সমৃদ্ধ অবস্থা জগদ্ধাত্রীমূর্তিতে। দেশের বর্তমান হৃতসর্বস্ব-অবস্থার যথার্থ প্রতিরূপ কালীমূর্তিতে। আর, দেশের অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বাংলা তথা ভারতের সর্বৈশ্বর্যময় অবস্থার রূপচিত্রণ দুর্গামূর্তিতে। এখানে এক দেবীরই তিন মূর্তি—সেই দেবী দেশমাতৃকা। তাঁর স্তব-গান 'বন্দে মাতরম্' সংগীত। দেশমাতৃকার বন্ধন-মোচনের জন্য যে স্বেচ্ছাব্রতী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বা সন্তানদল সংগ্রামে লিপ্ত তাঁদের রণ-সংগীত "বন্দে মাতরম্"।

'বন্দে মাতবম্' সংগীতকে জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভবানন্দ বলেছেন, "আমরা অন্য মা মানি না...আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, "আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা ... শস্য-শ্যামলা,-"

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, 'ফরাসি বিদ্রোহের সময বিখ্যাত 'লা মার্সেলিস' সঙ্গীত ছাড়া বিশ্বের ইতিহাসে আর কোনও সঙ্গীত একটি জাতির মনে এরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি করে নাই। ইহার প্রথম দুইটি শব্দ "বন্দে মাতরম্" ১৯০৫ সনে বঙ্গদেশের জাতীয় আন্দোলন ও নব জাগরণের মন্ত্ররূপে গৃহীত ও লোকমুখে উচ্চারিত হইত। আজ পর্যন্তও ইহা সমগ্র ভারতে সেই স্থান অধিকার করিয়া আছে। ...ইহা ইংরেজী, হিন্দী, মারাঠি, তামিল, তেলেগু ও কানারিজ ভাষায় অনুদিত হইয়াছে।"

উত্তরকালে বিপ্লবীদের মনে প্রাণে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্ররূপে এবং 'আনন্দমঠ' প্রধান দেশাত্মবোধক মহান্ গ্রন্থরূপে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। 'আনন্দমঠে'র সন্তানগণ ছিলেন বিপ্লবীদের আদর্শ। এই মন্ত্র বিপ্লবীদের মনে উৎসাহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিত। এই মন্ত্র উচ্চারণ করে বিপ্লবীরা নির্ভীক চিত্তে জীবন বিপন্ন করেও বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে। ফাঁসীর দড়ি যখন তাদের পরিয়ে দেওয়া হত তখন তারা 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র উচ্চারণ করেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের ঐতিহাসিক মর্যাদা এবং সর্বভারতীয় জনজীবনে এই সংগীতের অপরিসীম প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বন্দে মাতরম্'ই ছিল জাতীয় সঙ্গীত—স্বাধীন ভারতে নূতন জাতীয় সঙ্গীত আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু সেদিন 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসীর হৃদয়ের গভীরে যে আসন পাতিয়াছিল কোনদিন তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না।"

এই সমস্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র ভারতের জনমানসে দেশপ্রীতির প্রবল আবেগ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। এই দেশ-পূজার চিন্তাধারা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব অবদান।

মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার ছিলেন অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, সংস্কৃতি,



রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—জ্ঞান বিজ্ঞানের এইসব নানা শাখার নিষ্ঠাবান পাঠক গবেষক ও লেখক। তিনি বলেছিলেন, "প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে প্রভেদ আমি স্বীকার করি না।" ভারতবর্ষের আদর্শ শুধু আধ্যাত্মিকতা নয়, এর সঙ্গে বস্তুতান্ত্রিকতাও বিদ্যমান। তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'হিন্দু পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ হিন্দু সোসিওলজি' (হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি) গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ড 'ইনট্রোডাকশন টু হিন্দু পজিটিভিজম্' নাম নিয়ে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট ফরাসী মনীষী লিখেছিলেন, 'ডক্টর বিনয়কুমার সরকার ঠিক যেন একটা বিশ্বকোষ। বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান এবং ইতালিয়ান ভাষায় তাঁর লেখা আছে সুবিস্তর। আর তিনি বহুসংখ্যক বিভিন্ন বিষয় সম্পূর্ণ নূতন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আলোচনা করতে অভ্যস্ত। পাশ্চাত্য-বাসিগণ যদি সমাজবিজ্ঞানে বর্তমান ভারতকে সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে চায়, তবে এই বইখানা অপরিহার্য।" এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের যে মূর্তি দেখা যায় সেটি সংসার-নিষ্ঠা ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠার মূর্তি। বিনয় সরকারের আর একটি বই—'বিনয় সরকারের বৈঠকে (বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি)' দুখণ্ডে বিভক্ত। বইটি সম্পর্কে অমৃত বাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—eeThe book may be best styled a pocket encyclopaedia of Bengali Culture" বইটি নানা বিদগ্ধজনের সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গিতে লিখিত। প্রশ্নকর্তা সুবোধকৃষ্ণ ঘোষালের প্রশ্নের উত্তরে বিনয় সরকার বলেছিলেন, "বঙ্কিম ছিলেন ফরাসী দার্শনিক কঁৎ-প্রবর্তিত ধর্মের অনুরাগী ও প্রচারক। কঁৎ (১৭৯৮—১৮৫৭) খৃষ্ট ধর্মের বিরোধী দর্শন ও ধর্ম খাড়া করেছিলেন। তাতে দেবদেবী, পূজা-অর্চনা ইত্যাদির ঠাঁই নাই। কঁৎ-ধর্মকে মানব পূজা ও মানব-সেবার দর্শন বা ধর্ম বলে। এর পারিভাষিক নাম "পজিটিভিজম্" (সংসার-নিষ্ঠা বা জগৎ প্রীতি) সমাজ-সেবা কঁৎ-ধর্মের আসল কাজ। সহজে এ হচ্ছে নিরীশ্বর-ধর্ম বা নাস্তিকতার অন্তর্গত।"

বাঙালিরা মনে করেন যে 'অনুশীলন-তত্ত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের নিজ চিন্তাপ্রসূত। কিন্তু সে কথা আদৌ ঠিক নয়। শিক্ষিত জনসমাজ মনে করেন আনন্দমঠ (১৮৮২), দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে লেখা এবং এই তত্ত্ব হিন্দু শাস্ত্রসমূহ পাঠের ফলে লব্ধ। কিন্তু এধারণা ভুল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দর্শন বাঙালি, ভারতীয় কিংবা হিন্দু জীবনাদর্শ থেকে প্রাপ্ত নয়। এমনকি 'ধর্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) গ্রন্থটির বক্তব্যও পাশ্চাত্য দর্শনের বাঙালি সংস্করণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। বিনয় সরকার স্পষ্টই বলেছেন, "হিন্দুধর্মের প্রচলিত দেব-দেবী, যাগযজ্ঞ, পূজা-অর্চনার বালাই বঙ্কিমদর্শনে নাই। "ধর্মতত্ত্ব" আগাগোড়া অহিন্দু, হিন্দু-বিরোধী।" বঙ্কিমচন্দ্রের "শ্রীমদ্ভগবতগীতা" থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দেখানো যায় যে, তিনি কি ধরনের ধর্মীয় মূলতত্ত্বে আস্থাশীল ছিলেন। এই উক্তিই একমাত্র বর্ম যার সাহায্যে সুদীর্ঘকাল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে শত সহস্রবার উচ্চারিত মুসলমান সম্প্রদায় বা ইসলামধর্ম-বিদ্বেষের অপবাদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মমহিমায় ভাস্বর থাকতে পারেন। উক্তিটি এই—"ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথেষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দু ধর্মের সারভাগ। .... ইহা সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যাগায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহা জগতে একমাত্র ধর্ম—ইহাই একমাত্র Catholic religion"

কঁৎ বা অগস্ত কোম্‌ত (Auguste Comte) ছিলেন খ্রীষ্টধর্মে আস্থাহীন, যুক্তিপূজক, মানব-সেবক ও নাস্তিক। অবশ্য এ কথাগুলোর তাৎপর্য দার্শনিক ভাবজগতের দিক থেকে বুঝতে হবে। লৌকিকভাবে, এসব কথার সাধারণ অর্থ ধরলে বিচারে গোলমাল হয়ে যাবে। লৌকিক বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু, তিনি তাঁর নানা গ্রন্থে শাস্ত্রগ্রন্থাদি থেকে বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর তা ছাড়া তিনি নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ। বিনয় সরকার বলেছেন, "কঁৎ হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্রের আসল গুরু।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বহু রচনা সাধারণ পাঠকের কাছে এখনও অপরিচিত থেকে গেছে। তা না হলে, বঙ্কিমচন্দ্র মনীষী হিসেবে কী বা কোথায় তাঁর স্থান—তার মূল্যায়ন হত সঠিকভাবে। গোঁড়া হিন্দু যাঁরা, তাঁরা বঙ্কিম-সাহিত্যে মধ্যে মধ্যে ইসলামধর্মবিরোধী বা মুসলমান-সম্প্রদায় বিরোধী কথা লক্ষ্য করে উল্লসিত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যখন বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বজনীন ধর্মবোধের সম্মুখীন হবেন, তখন তাঁদের সব কুসংস্কার একে একে খসে পড়তে থাকবে। তাঁরা তাঁদের সব উদ্ধৃতিটি পড়ে কী ভাববেন তা ঔৎসুক্যের বিষয়। উদ্ধৃতিটি এই—"সাকার পূজায় সহস্র উপকার থাকিলেও, নিরাকার পূজায় কোন ইষ্ট না থাকিলেও, সাকার পূজা লুপ্ত হওয়াই উচিত। ইহার কারণ, সত্য ভিন্ন অসত্যে কোন মঙ্গল নাই। সত্যই ধর্ম, সত্যই শুভ, সত্যই বাঞ্ছনীয়, সত্যমেব জয়তে।"

"কৃষ্ণচরিত্রে" বঙ্কিমচন্দ্র-প্রবর্তিত কৃষ্ণ দেবতা নন। ইনি কোম্‌ত কর্তৃক অসংখ্য 'বীর-মানব' বা 'মানব-বীরের' মতো মহামানব বা অতিমানব। এই মানব-বীর আবিষ্কার বঙ্কিম-দর্শনের অসাধারণ কীর্তি। অপর এক সমালোচক ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ ভারত-ইতিহাসে কৃষ্ণের স্থাননির্ণয়ে পুরাণগ্রন্থের প্রাসঙ্গিকতা-প্রসঙ্গে বলেছেন,—"একদিকে ভারতের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে অখণ্ড জাতীয় চেতনার সূত্রধারণ, আর এক দিকে মহত্তম অধ্যাত্মচিন্তার আলোকে ভারতবাসীর চিরন্তন ধর্মসাধনার উত্তরাধিকার 'গীতা' সৃষ্টি—এ দুয়ের দ্বারাই কৃষ্ণচরিত্র ভারত-ইতিহাসে অনন্য ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক এই চরিত্রের কথা ইতিহাসচেতনার পক্ষে এইজন্যই আবশ্যিক যে, প্রাচীন ভারতের মূল ইতিহাস আছে পুরাণগ্রন্থের অন্তর্লোকে।"

'আনন্দমঠের' তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ টমাস ও তাঁর সৈন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের পূর্বে সন্তানদলকে উৎসাহিত করার জন্য নারায়ণ তথা কৃষ্ণকে স্মরণ করে ভাষণ দান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ, যিনি কেশিমথন, মধুমুরনরকমর্দন, লোকপালন, তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন,



মনে ভক্তি দিন, ধর্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর।" সন্তানদল প্রস্তুত ছিল। লেখকের ভাষায়—"তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল—"জয় জগদীশ হরে।"

দেশের মুক্তিযুদ্ধে যে দেবতাকে স্মরণ করা হয়েছে তিনি ভারতের সুচিরকালের ঐতিহাসিক মহামানব-বীর কৃষ্ণ। একথা একান্তভাবে স্মরণীয় যে, মানব-পূজক কোম্‌ত-মতাদর্শে বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা থেকেই উৎসারিত হয়েছিল দেশ-পূজা, দেশ-সেবার আদর্শ। বিনয় সরকার বলেছেন, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের দেবী মামুলি হিন্দু দেবদেবীর অন্যতম নন। এই দেবী জলমাটির দেবী, পাহাড়ের দেবী, নদনদীর দেবী, দেশ-দেবী বাঙলাদেশ। নয়া আধ্যাত্মিকতার ফোয়ারা ছুটছে এই মন্তব থেকে। অথচ ইহার ভিতর বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের গন্ধমাত্র নাই। "বন্দে মাতরম্" অহিন্দু আধ্যাত্মিকতার মন্তর, ভক্তিমার্গী নাস্তিকতার "সুরা"! এই মন্ত্রে কঁৎ-পন্থী বঙ্কিম-দর্শনের সমাজসেবা বা মানব-পূজা সরস মূর্তি পেয়েছে। স্বদেশপূজা-প্রবর্তক বঙ্কিম নবীন অধ্যাত্মজীবনের ভগীরথ।"

"আনন্দমঠে'র কোন কোন স্থলে মুসলমান-বিদ্বেষ প্রকট—আপাতদৃষ্টিতে এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসংগত নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টির পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে আছে—"ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিলেন। ভবানন্দ বলিলেন,—"ভাই, নেড়ে ভাঙ্গিতেছে. চল একবার উহাদিগকে আক্রমণ করি।"

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আছে—"সেই একরাতের মধ্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে বলিল,—"মুসলমান পরাভূত হইয়াছে, দেশ আবার হিন্দুর হইয়াছে। সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে হরি হরি বল।" গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুঠিয়া লইতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল। অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাগিল, "মুই হেঁদু।" পুনশ্চ—"দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানেরা নগরাভিমুখে ধাবিত হইল।"

এই সমস্ত বিবরণ পাঠান্তে মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হবার যুক্তিসংগত কারণ আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উপন্যাসে যে সমস্ত মন্তব্য করেছেন তাও প্রণিধানযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র মীরজাফরের শাসন-ব্যবস্থাকে আদৌ সহ্য করতে পারেননি। ইংরেজের দেওয়ানিকেও তিনি একধরনের রাজনৈতিক অব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবন সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষাঃ "মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্পাচ্ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" এমন অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান রাজত্বের অবসান চেয়েছেন। তা বলে, তার বদলে যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু রাজত্বের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন তাও নয়। ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে কোন গোঁড়ামি দেখা যায় না। কোন রকমের ধর্মবিদ্বেষ যে তাঁর চিন্তাজগতে স্থান পেয়েছিল তা

কল্পনা করাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে যখন আমরা তাঁর এই রচনাংশ পাঠ করি—"আমি কোন ধর্মকে ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করি না। ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি।"

'আনন্দমঠে'র শেষ পরিচ্ছেদে মহাপুরুষ বলেছেন, "এখন ইংরেজ রাজা হইবে।" পুনশ্চ সত্যানন্দকে তিনি বলেছেন, "ব্রত সফল হইয়াছে—মার মঙ্গলসাধন করিয়াছ—ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।" বলা বাহুল্য বাংলায় সর্বপ্রথম ইংরেজরাজ্য স্থাপিত হয়। ১২৮০ সালের 'বঙ্গ দর্শনে' বাংলা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ—একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক্, পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে।" অতঃপর 'আনন্দমঠ' রচয়িতার সমদর্শিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। থাকা সম্ভবও নয়।

"ইংরেজ মিত্ররাজা।"—সত্যানন্দকে মহাপুরুষ একথা বলেছেন। এর কারণও তিনি ব্যক্ত করেছেন—"প্রকৃত হিন্দু ধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক।—ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।—ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।—তখন প্রকৃত ধর্ম আপনা আপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যত দিন না তা হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান্, গুণবান্ আর বলবান্ হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আধুনিক জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে পারদর্শী হয়ে ভারত জ্ঞানে গুণে বলে উন্নত হয়ে উঠবে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে হলে চাই ইংরেজের সহযোগিতা। কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইংরেজ এদেশে প্রভুত্ব করবে তা তিনি চাননি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "সকল ধর্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।" কিন্তু এই স্বদেশপ্রীতির স্বরূপ ইউরোপীয় প্যাট্রিয়টিজম্ নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য, "ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে,—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।—জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন।"

বঙ্কিম-মানসকে জানা এক হিসেবে অতীত ভারত—যে ভারত জ্ঞানে প্রাণে বিশ্বমৈত্রীর আদর্শে উদ্ভাসিত, রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খলা এবং সমাজ-সংগঠনে সমুন্নত, যে ভারত বলিষ্ঠ ও সংকীর্ণতামুক্ত মানসিকতায় গৌরবান্বিত—সেই ভারতকে জানা। আধুনিককালের বহু সাহিত্য-সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দু পুনর্জীবনের (Hindu Revivalism) অন্যতম নেতা বলে ভাবেন। তাঁরা অন্যান্য ধর্মের মত হিন্দুধর্মকে একটি বিশেষ জনসমাজের ধর্ম বলে মনে করেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ তা নয়। হিন্দুধর্ম বিশ্বজনীন ধর্ম। ভারতবর্ষে এই ধর্মের উদ্ভব—

বিশ্ববাসীকে 'মহাভারতবর্ষে' মহান মানবধর্মে চিরন্তন কাল ধরে আহ্বান এবং উদ্বোধিত করবার জন্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন, ভারত সুপ্রাচীন কালের মত রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ হয়ে উঠুক, ভারতের জনসমাজ জাগ্রত হোক নবযুগের জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে ও শিল্পকলায়। তিনি অতীত ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা কী রকম ছিল তা জানতেন। তিনি গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লিখেছিলেন—"If the profoundest European thinker of the nineteenth century had any acquaintance with India, he might have known that his dream of a positive polity and an intellectual hierarchy had, thousands of yaars ago, been thought out and realised with a success transcending all his anticipations." সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে 'আনন্দ মঠে' সুমহান অতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতবর্ষকে নবজাগ্রতরূপে দেখতে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন।"

সম্প্রতি ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের লেখা একটি প্রবন্ধে ('জিজ্ঞাসা' পত্রিকায় বর্ষ ১, সংখ্যা১—এ প্রকাশিত 'উনিশ শতকী বাঙালীর পুনরুজ্জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পুনর্বিবেচনা'য়) কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এসব তথ্য থেকে সহজে প্রমাণিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে মুসলমান বিদ্বেষের অভিযোগ কত অসত্য ও কষ্টকল্পনা-উদ্ভুত। নীহার রঞ্জন লিখেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত অবস্থায় 'আনন্দমঠে'র পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল। উপন্যাসের যে সব জায়গায় ইরেজ বা ঔপনিবেশিক রাজত্বের বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল, তারা সব জায়গা বদলে বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমানদের বসাতে বা দায়ী করতে হয়েছিল। উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছিল ইংরেজের এদেশে শুভাগমনের প্রশস্তিতে। 'আনন্দমঠ' প্রকাশতে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রকে চাকরির ক্ষেত্রে ক্ষতি ও ব্যক্তিগত অবমাননা সহ্য করতে হয়েছিল, এ প্রসঙ্গে সে কথা উল্লেখ না করলেই নয়। কিছু কিছু সরকারী দলিল-পত্রে এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণও পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ বলেছে, "ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।" বঙ্কিম-সাহিত্যে এ সত্যের স্বীকৃতি উপলব্ধি করা কোন কঠিন কাজ নয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলা সাহিত্য

সূচনা

'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে মানিক বলেছেন : "ভদ্রজীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচাব, অনাচার, বিকারগ্রস্ততা, সংস্কার-প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়েও মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে ভদ্র জীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ? ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মাঝি-মাল্লা-হাড়ি-বাগ্‌দীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্রজীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা -যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে -সাহিত্যে স্থান পায় না?"

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যেই বাংলা সাহিত্যে মানিকের আবির্ভাব। তাঁর সাহিত্য আলোচনা করলে দুটি প্রধান ধারার পরিচয় পাওয়া যায় -(ক) ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা এবং শেষ হয়ে যাওয়ার আগে সর্ববিধ গ্লানির বহিঃপ্রকাশ। (খ) শ্রমিক ও কৃষক ইত্যাদি অবহেলিত মানুষের সমাজের অকৃত্রিম পরিচয় তাদের অমার্জিত জীবনের নিরাবরণ রূপ এবং যুগে যুগে সঞ্চিত সবরকমের অকৃতার্থতা কাটিয়ে উঠে আগামী যুগের উজ্জ্বল দিনে নবজীবনের প্রত্যাশায় জেগে ওঠা এবং শোষণ-মুক্ত সমাজগঠনে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলা।

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহ্য যাঁর সবচেয়ে কম কাজে লেগেছে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বসূরীদের চিন্তাধারাকে প্রায় অস্বীকার করে এবং সময়ে সময়ে বিরোধিতা করেও যিনি 'স্বয়ংসিদ্ধ' তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা কাব্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং বাংলা কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বামপন্থী চেতনার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীবহ। বাংলা সাহিত্যে মানিক যে নতুন ধারা নিয়ে এলেন তার সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করলে দেখা যায়ঃ

১। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ,

২। বৈজ্ঞানিক চেতনার সাহায্যে মানব মনের বিশ্লেষণ,

৩। বাস্তবতা তথা যুগসত্যের নির্মোহ নিরাবরণ বহিঃপ্রকাশ,

৪। জটিল জীবন সমস্যার অন্ধকার প্রদেশে আলোকপাত,

৫। তীক্ষ্ণতীর্যক বিষয়ঘনিষ্ঠ ব্যঙ্গ ও রহস্যসংকেতের সাহায্যে চরিত্র বিশ্লেষণে আশ্চর্য সত্যসন্ধানীর শিল্পদক্ষতা,

৬। ঘৃণা ও পাপবোধকে যা জাগিয়ে তোলে এমন বিষয়বস্তুকে নতুন প্রসঙ্গ হিসেবে ব্যবহার এবং তার বিশ্লেষণে ইতঃপূর্বে অনাস্বাদিত জীবনসত্যের সহস্যা আবিষ্কার,

৭। জীবনদর্শী,—নতুন অর্থে, রুক্ষ কঠোর ভাষাই হাতিয়ার, -তার সাহায্য জীবনের



নীরস বস্তুপুঞ্জের অন্তরালেই জীবনের রসরূপ উন্মোচন,

৮। মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার সাহায্যে সাহিত্য নবদিগন্ত আবিষ্কার - নতুনের প্রবর্তন - যেন এক ভাবীসমাজ গঠনের জন্য গভীর অন্তঃপ্রেরণা অনুভব। সংগ্রামশীল শ্রমিক ও কৃষক জনসমাজের সঙ্গে একাত্মতা বোধ এবং কমিউনিজ্‌ম্‌-ভাবধারা-সম্মত সমাজচেতনা গঠনে অগ্রণী হওয়া।

তাঁব সাহিত্যের কালপরিক্রমা শুরু হয়েছে রোমান্টিক ভাবধারার অনুবর্তনে, পরে তার মধ্যে এসেছে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণ রীতি এবং অবশেষে মার্ক্‌সীয় চেতনা। অন্যভাবে বলতে গেলে তাঁর সাহিত্য বিকাশের তিনটি স্তর ঃ

১। অনুকবণ পর্ব ও রোমান্টিকতার প্রকাশ—'দিবারাত্রির কাব্য' পর্যন্ত। (১৯৩৫)।

২। ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানরীতি প্রয়োগ ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বহুবিধ উন্নত আধুনিক ভাবধারা অনুচিন্তন এবং রিয়ালিজ্‌ম্‌ ও ন্যাচারালিজ্‌ম্‌কে সাহিত্যে প্রথম স্থান দেওয়া ; সাহিত্যিক-রূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা।—'প্রতিবিম্ব' উপন্যাস ও 'ভেজাল' গল্পগ্রন্থ পর্যন্ত। (১৯৩৬-১৯৪৪)।

৩। শিল্পীর গোত্রান্তর—মার্কস্‌বাদে দীক্ষাগ্রহণ। নতুন শিল্পচেতনার সাহায্যে সমাজসত্যের পুনর্মূল্যায়ন এবং আগামী দিনের সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠায় লেখক-কর্মীরূপে আত্ম-আবিষ্কার এবং ভাবীসমাজের অন্যতম সত্যদ্রষ্টারূপে নিয়তিনির্দিষ্ট পরিণতি। 'দর্পণ' থেকে শেষ পর্যন্ত। (১৯৪৫-১৯৫৬)।

মানিক সম্পর্কে যাঁরা যা বলেছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভিমত হলঃ

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততঃ পক্ষে পাঁচখানি উপন্যাস ও গল্পপুস্তক রচনা করিয়াছেন, যাহা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সাদরে স্বীকৃত হইবে এবং বাংলা দেশের সাহিত্যকে অধিকতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। (সজনীকান্ত দাস।)

২। মধ্য-বিশ-শতকের বাংলা দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলার ঘনিষ্ঠ রূপকার তিনি ; যে সময়ে তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণীর একটা অংশ নিচে নেমে এলো, এবং তথাকথিত দীন শ্রেণীর একটা অংশ প্রবল হ'য়ে উঠলো, সেই অধ্যায়ের বিবিধ লক্ষণ ভাবীকালের জন্য মূর্ত হ'য়ে রইলো তাঁর রচনায়। বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয় ..... (বুদ্ধদেব বসু।)

৩। "নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি" প্রতি স্থিরপ্রতিষ্ঠিত বিরূপতা নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনসত্যের অসঙ্কোচ উন্মোচনে ব্রতী হলেন। ভাবালুতা বৈজ্ঞানিকের সর্বথা বর্জনীয়— তিনিও সে সম্পর্কে প্রথম থেকেই সতর্ক হয়ে থাকলেন। জীবন-জ্যামিতির পাতা খুলে আঙ্কিক লেখক প্রথম পর্বে 'সম্পাদ্যে'র জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন। এই-ই জীবন? এই

তার রূপ? এই তার পরিণাম? 'সরীসৃপ?' 'সমুদ্রের স্বাদ?'' মহাকালের জটার জট?' 'চোর?' 'প্রাগৈতিহাসিক?' 'আত্মহত্যার অধিকার?' .... কিন্তু জিজ্ঞাসাই তাঁর শেষ কথা নয়। সম্পাদ্যের সমাধান আছে দ্বিতীয় পর্বে। ..... তাই সাহিত্যিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর সাম্যবাদী পরিণতি, অনেকের কাছে অবাঞ্ছিত হলেও, অনিবার্য ছিল। (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।)

৪। ...জীবনের শেষ দিকে ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে তাঁহার লেখনী এক আশ্চর্য দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বিপ্লবী জীবন ও বিপ্লবী ঘটনাকে রসোত্তীর্ণতার শিখরে তুলিয়া তিনি বাংলার প্রগতি সাহিত্যকে নূতন পথের নির্দেশ দিয়াছিলেন।(সম্পাদকীয়। 'স্বাধীনতা' পত্রিকা । ৩.১২.৫৭।)

বিশ্বসাহিত্যের প্রভাব

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ঃ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে ; ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল। মৃত্যু ঃ ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ রা ডিসেম্বর ; ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৩ সাল। সাহিত্যজীবনের শুরু ১৯৩৫এ এবং শেষ ১৯৫৬-তে। ১৯২৮-এ প্রথম গল্প 'অতসীমামী' লেখা। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যজীবনের দৈর্ঘ্য ১৯৩৫-১৯৫৬ ঃ মোট ২২ বছর। ১৯৩৫এ 'জননী' উপন্যাস, 'অতসীমামী' গল্প এবং 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসের প্রকাশ। তারপর ১৯৩৬প্রকাশিত হয় তিনখানি উপন্যাস—'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'পদ্মানদীর মাঝি' এবং 'জীবনের জটিলতা'। ১৯৩৬ থেকেই তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে যথার্থ আত্মপ্রকাশ আরম্ভ হয়। তাঁর সাহিত্যিক-বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত নিজস্ব প্রতিভার স্বাক্ষরসমন্বিত এবং সবিশেষ বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উপন্যাস দুটি—'পুতুলনাচের ইতিকথা' এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে তাঁর জন্য একটি স্থায়ী আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাঁর রচনার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে 'রিয়ালিজম্' এর সার্থক এবং সর্বাত্মক প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ এ তিনি ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। মার্কস্‌বাদের প্রভাবে তাঁর সাহিত্যজীবনে তথা সাহিত্যিক ভাবধারায় বিশেষ পরিবর্তন আসে। 'দর্পণ' উপন্যাসে তাঁর নতুন ভাবধারার প্রথম প্রকাশ ঘটে। মার্কসীয় দর্শনের বহু বিখ্যাত বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত সংগ্রাম (পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের সংগ্রাম)-এর চিন্তাদর্শ এবং শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের আসন্ন শোষণমুক্ত জীবনের অভ্যুদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাহিত্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠে। এক নতুন যুগের স্বপ্ন সম্ভাবনা ব্যর্থতা জ্বালা ও সংঘাত-সংগ্রামের বিচিত্র ইতিহাস তাঁর সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা, বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণ, রিয়ালিজম্ ও ন্যাচারালিজ্‌'মের ভাবধারাপুষ্ট তাঁর সাহিত্যধারা হঠাৎ নতুন বাঁকে এসে পৌঁছায় ; সেখানে প্রবল হয়ে ওঠে—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী (Historical Materialism) ভাবধারা। "শ্রমিক ও বিপ্লবী জনসাধারণের নূতন সংস্কৃতি" তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। গণসংগ্রামের জন্য তাঁর সাহিত্যকে উদ্দীপনাময় ও অর্থবহ করে তুলতে নিজস্ব প্রচেষ্টায় এককভাবে এবং 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'র মাধ্যমে যৌথভাবে অগ্রসর হন।

মানিকের সাহিত্যজীবন শুরু হওয়ার পূর্বে ও সমসাময়িক কালে তাঁর উপরে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রভাব পড়েছিল তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কিভাবে তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল তার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের বিশ্বসাহিত্যকে জানবার আগ্রহ তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, বিশেষ যোগ ছিল অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সঙ্গে। যদিও 'বিচিত্রা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ, তথাপি অচিন্ত্যকুমারের 'সে কল্লোলেরই কুলবর্ধন' অথবা বুদ্ধদেব বসুর তাঁর সম্পর্কে 'belated Kallolean' উক্তিটির সত্যতা আংশিকভাবেও স্বীকার্য। 'কল্লোলে'র ঢেউ সরে গেলেও তার তীর ভাঙবার ও বিশ্বসাহিত্যের অকূল দরিয়ায় মিশে যাবার অন্তঃপ্রেরণা এবং ভাবপ্লাবনের বহিঃপ্রেরণা তখন নবীন ও তরুণ সব সাহিত্যিকেরই ওপর প্রভাব ফেলেছিল। কল্লোলযুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকের সাহিত্য চেতনায় যে নতুন যৌবনোদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় তার বিচিত্রতা যদিও জীবনের এ যাবৎ অপাংক্তেয় নানা বিষয়কে স্পর্শ করে গেছে—(যেমন নিরাবরণ যৌনতা ও বাস্তব বিশ্লেষণযুক্ত দৈনন্দিন জীবনচিত্র ইত্যাদি) তথাপি তা সম্পূর্ণভাবে রোমান্টিকতার প্রাধান্যকে অস্বীকার করে এগিয়ে যেতে পারে নি। রোমান্টিকতার প্রাধান্যকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই মানিক-সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়।

কিন্তু তৎকালীন বা তার পূর্ব পূর্ব যুগের বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। এই দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্যকে বিচার করার সার্থকতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যুক্তি গ্রহণ করা যেতে পারে—"বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবকে দেখিবার লক্ষ্য আমরা স্থির করিব, প্রত্যেক লেখকের রচনার মধ্যে একটি সমগ্রতাকে গ্রহণ করিব এবং সেই সমগ্রতার মধ্যে সমস্ত মানুষের প্রকাশচেষ্টার সম্বন্ধ দেখিব, এই সংকল্প স্থির করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" ('বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধ)। প্রাচীনকালে ইতালির জনজাগরণের প্রভাব পড়েছিল দেশে দেশে। তার ফলে নানা দেশে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য শিল্প ও দর্শন ইত্যাদির ভাবধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বর্তমান জগতে দুটি মহাযুদ্ধই মানবসংস্কৃতির সমন্বয়কে দ্রুতগতিতে অগ্রসর করে দিয়েছে—সংঘাতের মধ্য দিয়ে পরিচয়ের মাধ্যমে এবং নানাভাবে যোগস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আঘাত ভারতে তেমনভাবে লাগেনি, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘাত এবং তজ্জনিত নানা অর্থনৈতিক সামাজিক মানবিক মূল্যবোধ এবং ব্যক্তির জীবনে যে চিত্তদ্বন্দ্বের সংকট দেখা দিল তার প্রভাব ভারতীয় জনজীবনেও আলোড়ন তুলেছিল। দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব প্রধানতঃ মূল্যভ্রান্তির প্রভাব এবং ভারতীয় তথা বাঙালির জীবনে তার কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। তৎকালীন সাহিত্যিক প্রবণতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃই মনে পড়ে প্রখ্যাত লেখকের লেখা সেই কথাগুলিঃ-

"The common view of the war as a vast crime imposed upon mankind by man, a crime to be combated by plodding endurance, was qualified by a minority who saw the war as a consequence of Sin against God."

এবং

"No previous generation had shown so close an interest in mental and spiritual disturbance as to create a growing assumption that most men and women as cases to be diagnosed, that the world is a vast clinic, and that nothing but abnormality is normal"

(Twentieth-Century Literature A C Ward)

যুদ্ধোত্তর পাপচেতনায় সমগ্র বিশ্বসাহিত্য তখন সংক্রামিত। এই বিষাদ, বিস্বাদ জীবনবোধের কৃষ্ণচ্ছায়া নতুন যে যুগচেতনার সৃষ্টি করল তাতে প্রচলিত মূল্যবোধগুলি হয়ে উঠল ধ্বংসোন্মুখ এবং সর্বত্র দেখা দিল প্রশ্নচিহ্ন। প্রশ্নের পর প্রশ্নের চিহ্ন দিয়ে আঁকা হল সাহিত্যিকের জীবনজিজ্ঞাসা। সুতবাং বিংশ শতাব্দীব সাহিত্যের যুগচিন্তায় সেই যে 'Age of Interrogation' নামটি দেওয়া হয়েছে তা একান্তই সার্থক। যেন পুরানো সঞ্চয়ের ভাণ্ডার শেষ, রিক্তহস্তে নতুনের অভ্যর্থনা,—তার ফলেই দেখা দিয়েছে শূন্যতাবোধ ও হতাশাজর্জর বর্তমানে অনীহা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশৈশব কৌতূহল-প্রবণতার সঙ্গে যুগধর্মের সাদৃশ্যও মিলে গেছে ঐক্যসূত্রে। তিনি বলেছিলেন, "ছেলেবেলা থেকে 'কেন?' নামক মানসিক রোগে ভুগছি, ছোট বড় সব ষিষয়ের মর্মভেদ কবার অদম্য আগ্রহ যে রোগের প্রধান লক্ষণ।" আসলে তিনি এযুগেরই মানসসন্তান। সমাজজীবনে এই যুগের ব্যাপক বিবর্তনধারার পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক যথার্থই বলেছেন-

'In face of any naturally horryfying phenomenon like war we must measure suffering, direct and indirect, against the spiritual goods which may come of suffering We may find that the proportion of futile suffering, and of that kind of suffering which makes men worse rather than better, which abates their human dignity and deadens their sense of responsibility, is far too high, and that the total effect is at best one of futility"

("War' Selected prose T S Eliot)

এই যে 'futility' বা নিষ্ফলতা—যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমাজজীবনে এই ফসল তোলার জন্যেই সেদিন বিশ্বমানব অনিবার্যভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল। রুগ্ন, ফাঁপা, ব্যথাদীর্ণচিত্ত শিল্পী কালো কালো অক্ষরে এঁকে চলেছিলেন ভাবী সমাজের ভয়াবহ পরিণতির ভাষাচিত্র। সর্বত্রই ছড়ানো ছিল 'Waste Land' সেদিন সাহিত্যে যে বিভিন্ন দেশের বাণী এসে পৌঁছেছিল ইংল্যাণ্ডে—এবং সেখান থেকে বাংলায়—তারও পরিচয় নিতে হবে। ইতঃপূর্বেই স্তাঁদাল বালজাক ফ্লবেয়ার ও মোপাসাঁ প্রমুখ ফরাসী, টুর্গেনিভ টলস্টয় ওগোগোল প্রমুখ রুশ এবং ডিকেন্‌স্ ও হার্ডি প্রমুখ ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সাহিত্যচিন্তা বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপর এলো ন্যাচারলিজম্-এর প্রবর্তক ফরাসী সাহিত্যিক এমিল জোলার ভাবপ্রবাহ। ১৯০৯-তে চেখভের ছোটগল্প অনুদিত হল ইংরেজিতে, ১৯১২-তে এলো ডস্টয়েভ্স্কির অনুবাদ (যদিও ফরাসী অনুবাদ হয়েছিল পূর্বেই)। ক্রমে ক্রমে টমাস মান্, মার্সেল প্রুস্ত, গোর্কি, হামসুন ও উইলিয়ম ফকনার প্রমুখের সাহিত্যচিন্তা বিস্তৃত হল। ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যাঁরা ১৯১০-এর Post-

Impressionist Paintings এর প্রদর্শনীর সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগের লেখক-লেখিকা তাঁদের উপন্যাসে দেখা দিল মনস্তত্ত্বের প্রবল ধারা। জেম্‌স্‌ জয়েস ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ প্রমুখ লেখক-লেখিকাদের উপন্যাসে এলো Stream of Consciousness -এর ভাবধারা। প্রবল দেহবাদী ভাবধাবার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আত্মিক চৈতন্যের উন্মেষ ঘটালেন ডি. এইচ. লরেন্স এবং "Lawrence appeared in the Post-war period as a significant novelist, a literary force " লবেন্স এইকথাও বলতে চাইলেন, যৌনাবেগের আধিক্যই যৌন-আকাঙ্কার অবদমনের হেতু হবে। ঈডিপাস গূঢ়ৈষণার প্রাবল্যও তাঁর রচনার মধ্যে বিধৃত। যে সমস্ত সাহিত্যবিষয়ক মতবাদ এই সময়ে প্রাধান্য লাভ করল তা হল—রিয়ালিজ্‌ম্‌ ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ ও সুররিয়ালিজ্‌ম্‌। ফ্রয়েড, হেগেল ও মার্কস - তিনজনের চিন্তাধারা থেকে সুররিয়ালিজ্‌মের উদ্ভব। ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান-উদঘাটনের চিন্তা, হেগেলীয় দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সংস্কার এবং মার্ক্সীয় সোসালিস্ট রিয়ালিজ্‌ম্‌ - এই তিন মতবাদের মিলনেই এর জন্ম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব সাহিত্যে বিয়ালিজ্‌ম্‌-এর ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ তৎকালে ইংরেজি সাহিত্য ও রুশ সাহিত্যে-এর "there is little true Naturalism " (The English Novel Walter Allen) তবুও গল্‌স্‌ওয়ার্দির ব্যাপকতা তাকে নাড়া দিয়েছিল। দেশের সামাজিক পরিস্থিতিও ছিল অনুকূল। রিয়ালিজ্‌ম্‌ প্রসঙ্গে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের আগেও ইংরেজি সাহিত্যে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে বিদগ্ধ সমালোচক বলছেন—" between the mid-eighties and 1914, while there is plenty of realism in English fiction there is little true Naturalism " (The English Novel Walter Allen) তবু গল্‌স্‌ওয়ার্দির "Forsyte Saga" উপন্যাসে এবং সমরসেট মমের "Liza of Lambeth" ও "Of Human Bondage" উপন্যাসে ন্যাচারিলজ্‌মের সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ রিয়ালিজ্‌মেরই প্রকারভেদ। রিয়ালিজ্‌ম্‌ বিষয়ের যথার্থতা এবং রূপের সামঞ্জস্য স্থাপনে সচেষ্ট। ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ সামাজিক পরিবেশের প্রভাব, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীব হিসেবে সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি ও বিকৃতি এবং বুর্জোয়া জীবনধারার বিকৃতি প্রদর্শনে নিরত। ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ যে সমস্ত উপন্যাসে অনুসৃত হয় সেখানে চরিত্রসৃষ্টি হয় মনস্তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব ও ঐতিহ্যসূত্রানুসারী। যথাযথভাবে সংগঠিত পারিপার্শ্বিকে রাখা হয় হয় তাদের স্থান। তাদের ব্যক্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকের সংঘাত থেকে সৃষ্টি হয় তাদের আচরণধারার। Naturalistic Novel-এর জগৎ যান্ত্রিক এবং বাস্তববাদী। খেয়ালীপনা, আত্মগতভাবনা এবং লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তাকল্পনার উৎকেন্দ্রিকতা উপন্যাস রচনা কৌশল থেকে হয় বর্জিত। ন্যাচারালিস্ট বা প্রকৃতিবাদী ঔপন্যাসিকেরা সবচেয়ে গুরুত্ব দেন পারিপার্শ্বিকের ওপর। ঐ ধরনের ইংরেজ ঔপন্যাসিক জর্জ মুর তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'A Mummer's Wife'-এ মানুষ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন— "Change the surroundings in which man lives, and in two or three generations, you will have changed his physical constitution, his habits of life, and a goodly member of his ideas."

গোর্কির রচনার মধ্য দিয়ে রুশ সাহিত্যের প্রভাব পড়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। গোর্কি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে রুশ জনগণের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তাদের

সর্ববিধ দুর্গতি দারিদ্র্য ও রূঢ় রুক্ষ জীবনাচরণের অন্তরালে মনুষ্যত্বের অম্লান ফল্গুধারাকে দেখান। এই মনুষ্যত্বই তাদের মুক্তির সন্ধান দেবে—তার ইঙ্গিত দেন। রুশ জনজীবনের অধঃপতন মালিন্য এবং নৈতিক অবক্ষয় প্রদর্শন করেন নির্মোহ বিশ্লেষণের আলোকে, তবু জীবনের যথার্থস্বরূপ সন্ধানে তাঁর লেখনী কোথাও ক্লান্তিবোধ করেনি। তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ প্রহসনের নিন্দাবাণ বর্ষণ করলেও তাঁর রচনায় জনমানসের গতিপ্রকৃতির প্রতি যথার্থ দরদীসুলভ সহানুভূতি কখনো হারাননি। প্রকৃতপক্ষে গোর্কির জীবনকথা ও তাঁর সাহিত্যসন্ধান জার-শাসনমুক্ত কমিউনিষ্ট দেশ হিসাবে রাশিয়ার সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনারই সমপর্যায়ী বিষয়। গোর্কির জীবনের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণা তাঁর সাহিত্যে মানবজীবনের অসহায়তার বন্ধনজ্বালা ব্যর্থতায় কালো কালো অক্ষরে গাঁথা হয়ে আছে। অথচ তাঁর সাহিত্যেই মানবমুক্তি ও মানবমানসের উত্তরণের বাণী খনিগর্ভের অন্ধকারে হীরকদীপ্তির মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে গোর্কির এই ব্যস্তববাদ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাবিদ্গণেব মধ্যে ডারউইন এবং ফ্রয়েড মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যচিন্তার ওপরে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তাব কবেছেন। ডাবউইনের বিবর্তনবাদ মানব মনের মৌলিক চিন্তাধাবা এবং বিশ্বজগৎ সম্পর্কে মানসিক অভিজ্ঞতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফ্রয়েড Id, Ego, Super Ego তথা নির্জ্ঞান, (Unconscious), প্রাকচেতন (Preconscious), চেতনা (conscious) ও অধিশাস্তা (Super-Ego)—মনের এ ধরনের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। আত্মরক্ষাকারী প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা পরিব্যাপ্ত কামশক্তিকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন Eros বা Life-instinct তথা জীবন-এষণা। তিনি সন্ধান দিযেছেন, মানবমনে জীবন-এষণার ঠিক বিপরীতমুখী আরও একটি ইচ্ছা আছে—তাকে বলেছেন Death instinct তথা মরণ- এষণা। মানুষের আত্মহত্যা, আত্মপীড়ন এবং ধ্বংসের আকাঙ্ক্ষা—মরণ-এষণার পরিচয় দেয়। ফ্রয়েড দেখালেন, প্রত্যেকটি জীব-কোষের মধ্যেই যেন জীবন—মৃত্যুর একসঙ্গে লীলাসঙ্গম। মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে ফ্রয়েড দেখালেন, Id বা অদসের অন্ধ সুখান্বেষণস্পৃহা - যা মানুষের মনোগহনে অসংখ্য কামনার দ্যোতনা করে ও বহির্জগতে সুখী ও তৃপ্ত হতে চায় ; Ego বা অহম্ বহির্জাগতিক পারিপার্শ্বিকে মানবমনের অন্তঃস্থলবাসী অসংখ্য কামনার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সামঞ্জস্য করে ; আর Super Ego বা আধিশাস্তা বিবেকের মতো কাজ করে,-তার কাজ সমাজসচেতন প্রাণী হিসেবে মানুষের মধ্যে যথার্থ স্থান গ্রহণে সাহায্য করা। এ ছাড়া তিনি 'ঈডিপাস গূঢ়ৈষণার' কথা বললেন, যা নিষিদ্ধ যৌনচেতনার পরিচয় দেয়। মনের নানাধরনের দ্বন্দ্ব (Conflicts), অবদমন (Repression) এবং গূঢ়ৈষণার (Complexes) কথাও এসেছে তাঁর মনস্তাত্ত্বিক আলোচনার প্রসঙ্গে। ফ্রয়েড বিশেষভাবে বলেছেন Libido বা যৌন-মানস শক্তির কথা। লিবিডো হল বিভিন্ন প্রকার জীবনতৃষ্ণা এবং উদ্যমের প্রেরণা ও শক্তি। লিবিডো সম্পূর্ণ মানসিক শক্তি - দেহ অতিক্রম করে এর কার্যধারা বিস্তৃত। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বসাহিত্যে ফ্রয়েডের 'মনঃসমীক্ষণ' ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কস্‌বাদে দীক্ষিত হবার পূর্ব পর্যন্ত যে সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কার্ল মার্কসের চিন্তাধারার ব্যাপক

প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রুশ বিপ্লবে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার বিজয় লাভে। যদিও প্রকৃত দার্শনিক চিন্তার জগতে কার্ল মার্কসের দর্শন নতুন দর্শন হিসাবে স্বীকৃত হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তবু তার বিশ্বব্যপী প্রভাব এবং প্রয়োগ—সার্থকতায় তা এ যুগের সমস্ত শ্রেণীর দর্শনকে ছাড়িয়ে গেছে বহুপূর্বেই। মূলতঃ তার সম্পর্কে বলা যায়—একজন বিশেষজ্ঞ দর্শনবিদের ভাষায় —"What Marx founded was a new system of economics, and not philosophy " (Contemporary Philosophy — Dhirendramohan Datta) মার্ক্সের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে ধারাবাহিকভাবে চারটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ—

১। The Labour Theory of Value—মূল্য সম্পর্কে শ্রমের তত্ত্ব।

২। The Theory of Surplus Value—উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব।

৩। The Theory of ClassWar—শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্ব।

৪। The Theory of economic determination—অর্থনৈতিক নির্ধারণের তত্ত্ব।

এ সম্পর্কে কমিউনিজ্‌মের মূলতত্ত্ব কি—সে প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। মার্ক্সের চিন্তাধারা অনুযায়ী কমিউনিজ্‌মের মূলতত্ত্ব হল "Abolition of private property" অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ। কার্ল মার্ক্‌স্ ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্ প্রণীত ও ইংরেজি ভাষায় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Manifesto তথা 'ইশতেহারে'র প্রথম অধ্যায়ের সূচনায় বলা হয়েছে—"আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।" .... "বুর্জোয়া বলতে আধুনিক পুঁজিপতি শ্রেণী বোঝায়.....প্রলেতারিয়েত হল আজকালকার মজুর-শ্রমিকেরা।" (এঙ্গেল্‌সের টীকা)

'ইশতেহারে' একথা বলা হয়েছে—"প্রলেতারিয়েতের বিকাশের সাধারণতম পর্যায়গুলির ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে বর্তমান সমাজের ভিতরে কমবেশি প্রচ্ছন্ন গৃহযুদ্ধ চলেছে যে যুদ্ধ একটা বিন্দুতে এসে প্রকাশ্য বিপ্লবে পরিণত হয় এবং তখন বুর্জোয়াদের সবলে উচ্ছেদ করে স্থাপিত হয় প্রলেতারিয়েতের আধিপত্যের ভিত্তি।"

শ্রেণী-সংগ্রামের এই চিন্তা প্রবলতম আবেগ সৃষ্টি করেছে রুশ সাহিত্যে যার বিশ্বজনীন কার্যকরী প্রভাব পড়েছে বিশ্বের নানা দেশের সংগ্রামী-চেতনা-উদ্দীপ্ত সাহিত্যে। আমাদের দেশেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এর দ্রুত বিস্তার ঘটে। মানিক-সাহিত্য (একদা যা সামন্ততান্ত্রিক শোষণে ধ্বংসশ্রদ্ধ ভাবধারা প্রকাশে যাত্রা শুরু করেছিল)—তার ক্রমপরিণতি হয় এই শ্রেণী-সংগ্রাম ও তার ভাবী সম্ভাবনার দিক-নির্ণয়ে।

এই পর্বের আলোচনার শেষে কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানিককে যেমন সচেতন করেছিল, তেমনি সাহিত্যে এমিল জোলা ডি. এইচ, লরেন্স ও গোর্কি, বিজ্ঞানে ফ্রয়েড এবং রাজনীতিতে মার্ক্সও তাঁকে তেমনি নানাভাবে প্রভাবিত এবং তাঁর জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রভাব—দেশ ও কালের প্রভাব

কল্লোল যুগের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে এই যুগের দ্বৈধ সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা দরকার। প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি পত্রে লিখেছিলেন, "জীবনকে দেখাবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি..." এ সম্পর্কে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন "হ্যামসুন আর গোর্কিকে প্রেমেন্দ্রবাবু মেলাবেন কি করে?...ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?" মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে এই দ্বৈধ কাটিয়ে উঠলেন। 'ভাবের আকাশের ঝড়' তাঁর বেশিদিন সইল না। তিনি বলেছেন—"ভাববাদ যদি একেবারে বর্জন করতেই পারতাম—তবে আর সংঘাত থাকতো কিসের! সচেতনভাবে বস্তুবাদের আদর্শ গ্রহণ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্য করিনি বটে—কিন্তু ভাবপ্রবণাতার বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ সাহিত্যে আমাকে বাস্তবকে অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল।কোন সুনির্দিষ্ট জীবনাদর্শ দিতে পারিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব খানিকটা মিটিয়েছি নিশ্চয়।" সুতরাং, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল "মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যা"র দিকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন এ-কথা ভেবে অতৃপ্তি অনুভব করেছিল যে, শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলো হৃদয়সর্বস্ব, মধ্যবিত্তসুলভ হৃদয়াবেগই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। শৈলজানন্দের গ্রাম্যজীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি তাঁকে আশান্বিত করলেও সেখানে তিনি অনুভব করলেন যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা রয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সেখানে কোন বাস্তব সংঘাত আসেনি। বস্তিজীবনের কথা এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসেনি। বস্তির মানুষের জীবনকথায় এসেছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। দেহকে আশ্রয় করে অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বড়ো হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষের মন নেই-সেই মনের বিশ্লেষণ-পরম্পরায় তাদের আঁতের কথা ফুটে ওঠেনি। এই অসম্পূর্ণতার জন্য তাঁর শিল্পীসুলভ মনোবেদনা তাঁকে নতুনতর পথসন্ধানে আগ্রহী করে তুলল। তাঁর মনে এ প্রশ্ন আলোড়িত হয়ে উঠল যে, "শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের —সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?" 'জীবনের কঠোর নগ্ন বাস্তবরূপ' আর 'সাধারণ বাস্তব মানুষ' যে কেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে বড়ো হয়ে উঠেছে তা এই সমস্ত উক্তি থেকে অতি সাবলীলভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই ধরনের সাহিত্যচেতনা থেকেই তাঁর সাহিত্য এগিয়ে চলেছে জটিল জীবন-সমস্যার রহস্য-উন্মোচনে এবং তার গতিপ্রকৃতি ও পরিণাম নির্ধারণে। সাহিত্যের দর্পণে সাহিত্যিক হিসেবে তিনি সমাজের মধ্যে যে অসঙ্গতি মনোবিকার মানসিক সংঘাত ও অসাম্যকে দেখিয়েছিলেন, উত্তর জীবনে সাহিত্যিক ও জনসেবক কর্মী হিসেবে যেন এক কর্মী-শিল্পীর যুগ্মসত্তার নিরলস প্রচেষ্টায় সেই সমস্ত সমস্যার সমাধানে সংগ্রামশীল চেতনার দীপশিখা নিয়ে এগিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তিনি যে কবিতা লিখতে চান তা হবে—

মানুষের আসল কবিতা—

আমার যে মানুষেরা

রোগ শোক ক্ষুধা ব্যথা বঞ্চনা হত্যায়

জীবিকার ব্যভিচারে পচে গলে যায়

আমার জীবন জুড়ে স্বপ্ন জাগরণে।

কিন্তু তাঁর এ উক্তি প্রণিধান করতে হলে সমাজজীবন বিশ্লেষণ ও সামাজিক সংঘাত অন্বেষণ—এই উভয় ধারার দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাস ও গল্পে যে কয়েকটি লক্ষণ প্রাধান্য লাভ করল তার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে:—

১। সামাজিক প্রতিবেশে ব্যক্তির মূল্যায়ন, অনেক পরিমাণে পুরানো মূল্যবোধ ভেঙে ফেলা ও নতুন জীবনপ্রত্যয় প্রবর্তন

২। অসংকোচে ব্যধিগ্রস্ত সমাজের বীভৎস গলিত রূপ প্রদর্শন।

৩। ফ্রয়েড, অ্যাড্লার ইয়ুং এবং হ্যাভলক এলিসের প্রভাব-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও চরিত্রের স্বরূপ নিণয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন

৪। সাম্যবাদের আলোক লব্ধ সোসালিস্ট রিয়ালিজ্‌মের নতুন ধারা—তথাকথিত "নীচুতলা"র মানুষের অকুণ্ঠ পদসঞ্চার

উপন্যাসের গঠনরীতিতে যে প্রধান প্রাধান শিল্পকৌশল লক্ষ্য করা গেল তা হচ্ছে-

১। ব্যক্তির জীবনপথ পরিক্রমা এবং তার সমস্যা—নতুন কালের সংঘাতে তার ক্ষতবিক্ষত আর্তরূপ প্রদর্শন

২। সমষ্টি-জীবনের সামগ্রিক ছবি প্রদর্শন

৩। "চেতনাপ্রবাহ" পদ্ধতিতে চরিত্রের অন্তর্নিহিত মৌলস্বরূপের রহস্য ও মর্মগত সত্য উদ্‌ঘাটন - অবচেতন উন্মোচন এবং অন্তর্মুখী নব-বাস্তবতার প্রকরণের আলোকে চরিত্র রূপায়ণ। গল্প উপন্যাসের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে যে নতুনত্ব এলো, তারও বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায় এইভাবে যে-

১। নতুন পরিবেশ ও তার বর্ণনা-উপযোগী ভাষা : "নীচুতলা"র মানুষের আমদানি ও তাদের মুখের ভাষা ব্যবহার

২। চলিত ভাষা ব্যবহার, আটপৌরে ভাষার দিকে ঝোঁক ও লালিত্য চাকচিক্য বর্জন

৩। সহজ স্বাভাবিক সুরে গভীর সত্য ও জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটন—আবেগবর্জিত বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি সহ যুক্তিঋদ্ধ রীতি

৪। ভাষায় ধ্বনি প্রবাহ নয়, বরং চিত্র প্রতীক সংকেত ও বস্তুঘনিষ্ঠ ইঙ্গিতধর্মী রঙ রেখার সাহায্যে মর্মসঞ্চারী সংবেদন সৃষ্টি।

ফ্রয়েডের চিন্তাধারা সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ফ্রয়েড ও তাঁর উত্তরসূরী চিন্তাশীলদের বক্তব্য, মানুষের অবচেতনাই চেতন মনের নিয়ামক আর এই অবচেতনার মূলে আছে যৌন অনুভূতি। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হ্যাভ্‌লক এলিস এই মতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন। ফ্রয়েড ও এলিস উভয়েই মানবিক প্রেমচেতনার দেহভিত্তিক যৌন আবেগের উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিলেন। মানবিক প্রেমের রোমান্টিক স্বপ্নসভার মানুষের চোখ থেকে তার মায়া-অঞ্জন নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেল, পরন্তু তার পরিবর্তে দেখা দিল দেহের সঙ্গে মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে জানবার অনুসন্ধিৎসা। যুদ্ধোত্তর কালচেতনা বিপুলভাবে মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছিল। সেদিনের ঝড়ো হাওয়ায় অনেক পুরানো দিনের কুসংস্কার, বদ্ধমূল ভুল ধারণা ও আকাশচারী স্বপ্নকামনা অপসৃত হচ্ছিল। বাস্তবতা-সচেতন মন রুগ্ন বিপর্যস্ত কালিমাম্লান জগতে মানব অস্তিত্বের সকল দৃঢ়ভিত্তিক যুক্তিনির্ভর চিন্তাকে আশ্রয় করতে চাইল। এজন্যে মনোবিকলন তত্ত্বের এই বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা সে যুগের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিন্তা ও সাহিত্যিক কল্পনাভাবনাকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করেছিল। তারই প্রভাবে সমকালীন বাংলা সাহিত্যে মনস্তত্ত্বনির্ভর অথবা অবচেতন-রহস্য-বিশ্লেষণকারী এক নতুন প্রবাহ দেখা দিল।

শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, বাংলার সাহিত্য যেদিন রুশ সাহিত্যের মতো 'সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে, তাদের দুঃখবেদনার কথা বলতে পারবে, সেদিন তা স্বদেশ ও বিশ্বসাহিতেও স্থান পাবে। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেছেন—"রুশ সাহিত্যে বাঙালী দেখেছে,বেদনার সিন্ধু মন্থন করে জয়মাল্যগলে মানবের অন্তরের বিজয়লক্ষ্মী উঠেছে। ....তার মনে একটা অনুভূতি জেগেছে যে এই বেদনার পথ দিয়েই বুঝি আমাদের যাত্রাপথ।" যদিও সম্পূর্ণভাবে রুশ সাহিত্যের মর্মরস সে যুগের তরুণ লেখকদের সকলেই উপলব্ধি ও আত্মস্থ করতে পারেননি, তবু রুশ সাহিত্যে জনজীবনের হৃৎস্পন্দনের তরঙ্গ সেযুগের বাঙালি যুবচিত্তে ও বুদ্ধিজীবী সমাজে ব্যাপক প্রেরণা প্রভাব ও নতুন সৃষ্টির উদ্দীপনা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। আর, তরুণ লেখকদের সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছিলেন ১৯১৭-এর রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালের লেখকবৃন্দ : এঁদের মধ্যে টুর্গেনিভ ডষ্টয়েভ্‌স্কি টল্‌স্টয় চেখভ এবং গোর্কি প্রধান। উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনদশকে রাশিয়ার হতাশ মধ্যবিত্ত, মানসিক সংকটে বিপন্ন বুদ্ধিজীবী ও অবহেলিত শোষিত শ্রমিক কৃষক সমাজের জীবনসমস্যার সঙ্গে আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের জীবনযন্ত্রণার আশ্চর্য ও অনিবার্য মিল সেদিন চোখে পড়েছিল অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই। টুর্গেনিভের 'ফাদার্স এ্যন্ড সন্স'-এর 'বাজারভ' চরিত্রে যে সংস্কারদ্রোহী বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায় তা সে যুগের



বাঙালি তরুণের ভাবগত প্রেরণায় বিদ্যুৎ-দীপ্তি সঞ্চার করেছিল। ডস্টয়েভস্কির 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট', 'দি ব্রাদার্স কারামাজভ' ইত্যাদি উপন্যাসে আধুনিক মানুষের যে দ্বন্দ্বজটিল প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ মানসিক সংবেগ ও সংশয়, বিক্ষোভ আলোড়ন ও আত্মিক রহস্যজিজ্ঞাসা প্রস্ফুটিত হয়েছে, মহাযুদ্ধনিপীড়িত পাপনিমগ্নচিত্ত নির্বেদসম্বল যুগমানবের অন্তররহস্যন্ধানী বাঙালি সাহিত্যিক তাতে আকৃষ্ট না হয়ে পারে নি। টলস্টয়ের 'ওয়র অ্যান্ড পীস' উপন্যাসের বাস্তবতা এবং 'অ্যানা কারেনিনা'ব মনস্তত্ত্ব-জটিলতা ও জীবনের ব্যাপক অনুভূতি-অভিজ্ঞতা সহজেই আলোড়ন তুলেছিল সেদিন। চেখভের 'দি চেরী অর্চার্ড্' প্রভৃতি নাটকও সাধারণ বিষয় বর্ণনার অন্তরালে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কুশলতায় সহজেই সমাদৃত হয়েছিল সেদিন। সবচেয়ে জনচিত্তজয়ী হযে সর্বাপেক্ষা আলোচিত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন গোর্কি। গোর্কির 'মাদার' উপন্যাস সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শে ও সাম্যবাদী সমাজগঠনে উদ্বুদ্ধ করতে রুশদেশের চিত্তদূত রূপে আবির্ভূত হল। তাঁর 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' নাটকে সমাজের তথাকথিত "নীচুতলা"র মানুষের জীবনচিত্র যেভাবে রূপাযিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ অভিনব ও যুগান্তকারী প্রেরণা জাগাতে সমর্থ। এ কথা বলা হয়েছে "The strength with which Gorky projects his ideas and the power of this belief in the eventual worth of man make The Lower Depths a notable play" সেদিন রুশসাহিত্যের ভাবাদর্শই কেবল বাঙালি সাহিত্যিককে প্রেরণা দেয়নি, মার্কসীয় দর্শন ও লেনিনের বৈপ্লবিক কর্মনীতিও উদ্দীপ্ত করেছিল তাদের। ১৯৩১-১৯৩৫ : এই কাল-পর্বে বাঙালী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মার্ক্‌স্‌বাদ লেনিনবাদের আলোচনা শুরু করেন। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত থেকে আরম্ভ করে যে সমস্ত সাহিত্যিক উত্তরকালে প্রখ্যাত হয়েছেন তাদের অনেকের সাহিত্যিক জীবনে এবং গল্পে উপন্যাসে পূর্বোক্ত দুইধারার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের সূচনা এবং তার ধারা চলেছে পরবর্তী বহু উপন্যাসে। 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' এর সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্রষ্টা হিসেবে কেমন ছিলেন এবং তাঁর সৃষ্টিতে তাঁর মন কেমন ধরা পড়েছে এই দুই বিষয় আমাদের প্রধান আলোচ্য। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান ও প্রভাব আমাদের আলোচ্য। এজন্যেই যে প্রভাব ও প্রেরণায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিকাশ তার আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া চলে না। এজন্য অনিবার্যভাবে তাঁর সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্যকৃতির পরিচয় পাওয়াও আবশ্যক। এ থেকে সমানধর্মাদের প্রেরণা তাঁকে কোন্ কোন্ ভাবে প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষে আত্মপ্রত্যয় জাগাতে সাহায্য করেছিল, তার বিবরণ পাওয়া যাবে। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'ঠানদিদি' 'শুভা' 'বিপর্যয়' ও 'লুপ্তশিখা' উপন্যাসে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র ও অতৃপ্তযৌবনের দাবি প্রবল হয়েছে; ক্রমে যৌনচেতচনার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতারও মিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর 'পাপের ছাপ' উপন্যাসে শেষোক্ত বক্তব্যটির নিদর্শন আছে। নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মনোবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণকৌশল ও মনোরহস্য ব্যাখ্যানে পারদর্শিতা তাঁর সৃষ্টিকে অনেক পরিমাণে সার্থক করেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের মনস্তত্ত্বকে পিছনে রেখে যুবনাশ্ব (মনীশ ঘটক) বাস্তববাদী খোলামেলা দৃষ্টি নিয়ে ভগ্ন রুগ্ন ও পর্যুদস্ত জীবন যাদের, সমাজের 'তলানি' যারা—সেই কানা খোঁড়া ভিক্ষুক গুন্ডা চোর আর পকেটমার'দের আড্ডায় এসে দাঁড়ালেন। 'পটলডাঙার পাঁচালী'তে

তারা একেবারে তাদের 'বিকৃতজীবনের কারখানা'য় কলকাতা শহরের 'বুকের ওপর' এসে উপস্থিত হল। লেখক দেখালেন তাদের ক্ষত, নির্লজ্জ জীবনধারা—আর সবকিছুর পিছনে নির্মম নিষ্ঠুর দারিদ্র্য।

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন,"আসলে, নবীন সাহিত্যিকদের মনে সে সময়ে 'কল্লোল'-নিরপেক্ষভাবেই নতুন একধরনের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল।" এই 'নতুন একধরনের' প্রকাশ শৈলজানন্দের সাহিত্যে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কয়লাকুঠি' গল্পে এই অভিনবত্বের সূচনা। 'কয়লাকুঠি' শ্রেণীর গল্পগুলি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করল। তাঁর সাহিত্যে দেখা দিল আঞ্চলিকতা এবং স্থানীয় রঙ (Local Colour)। বর্ধমান বীরভূমের কয়লাখনি ও গ্রাম অঞ্চল থেকে সাঁওতাল বাউরী শ্রমিক মজুরদের জীবনের সর্ববিধ ভাব অনুভূতি ও চেতনা তাঁর সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে এলো। তাদের দৈনন্দিন জীবন, প্রেম নীতিবোধ ও নীতিহীনতা, ঈর্ষা আত্মত্যাগ আবেগ, বিষাদ ও রিক্ততা—আশ্চর্য অনাস্বাদিত জীবনরসে এবং বস্তুনিষ্ঠ শিল্পকৌশলের সূক্ষ্ম কারুকার্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিবৃত হল। 'সাঁওতালি' 'দিনমজুর' ও 'নারীর মন' প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর শিল্পসৃষ্টির দক্ষতা অনস্বীকার্য। শৈলজানন্দের লেখকসত্তা হৃদয়ানুভূতিপূর্ণ,মননাতিরেক তাঁর স্বভাবধর্ম নয়, তবু তিনি হৃদয়াবেগের ভাষায় স্বয়ং আবেগবিহ্বল হননি, বরং পাঠকচিত্তে প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ অনুভূতি সঞ্চারে সচেষ্ট হয়েছেন, নিজে দাঁড়িয়ে থেকেছেন নিরাসক্তভাবে। এখানেই তিনি সার্থক শিল্পী। কিন্তু তবু তাঁর সাহিত্যিক সৃষ্টিদক্ষতার সীমাবদ্ধতা উপেক্ষণীয় নয়; এ প্রসঙ্গেই মোহিতলাল বলেছেন—"শৈলজানন্দের 'রিয়ালিজ্‌ম্' সমাজ-জীবনকে অতিক্রম করিয়া আরও ভিতরে প্রবেশ করে নাই।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের সংকীর্ণতা ব্যর্থতা এবং দারিদ্র্যপিষ্ট নিরর্থকতার সংকট 'ভবিষ্যতের ভার' 'পুন্নাম' প্রভৃতি গল্পে প্রকাশ করেছেন। 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' 'সংসার সীমান্তে' প্রভৃতি গল্পে গ্লানিজর্জরিত বিষণ্ণ রিক্ত নারীদের জীবনযন্ত্রণা এবং আগামী তামসরাত্রির অনিশ্চয়তার কালিমা আশ্চর্য সহানুভূতি ও মর্মবেদনার রঙে আঁকা। 'পাঁক' উপন্যাসে তিনি হতশ্রী কুৎসিত মুচিপাড়ার পরিবেশকে এনেছেন এবং সমাজের একপ্রান্তের কদর্য পঙ্কিল রূপকে চিত্রিত করেছেন, কিন্তু এরই মধ্যে এই জীবন ও প্রতিবেশ থেকে পরিত্রাণের বাণীও শোনা গেছে । এই উপন্যাসেই অশান্ত কর্মকার শ্রেণীসংগ্রামের বাণী পৌঁছে দিয়েছে,—দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় অবহেলিত সমাজের কানে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বার্তা জানিয়ে দিয়েছে। এতেই রুশ সমাজতন্ত্রের বাণী ও মার্কসীয় চিন্তাধারা প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'হয়ত' 'শৃঙ্খল' 'স্টোভ' প্রভৃতি গল্পে দাম্পত্য জীবনের জটিলতা সহানুভূতিহীনতা ও সংশয় সন্দেহ বিষজ্বালাময় তিক্ততার চরম প্রকাশ ঘটেছে। বিকৃত রুগ্ন জীবনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও কখনো ভয়াবহ আকস্মিক বিপন্নতার চিত্রে লেখক অস্বস্তি-যন্ত্রণা-দুর্ভাগ্যের বাস্তব চিত্র রচনা করেছেন।'নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি, লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ কলহ সংশয়—' (যা রোমান্টিক কবিকল্পনায় নৈরাশ্য ও ব্যর্থতাবোধ সৃষ্টি করেছিল)



তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব রূপ বর্ণনা এবং বিকৃতি পাপ মলিনতা গ্লানি ও কদর্য জটিলতা নিষ্ঠুর উত্তেজনা বীভৎস দারিদ্র্য দিয়ে ঘেরা জীবনচিত্র নতুন সাহিত্যধারা সৃষ্টি করল। এরই প্রবাহ এগিয়ে চলেছে আজও। যৌবনে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন, "জীবনের চরম সার্থকতা....প্রেমের জাগরণে"। সেই অনুভূতি পরবর্তীকালে তাঁর রইল না। যুদ্ধোত্তরকালে বিকৃত অসুস্থ নরনারীর হৃদয়বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর সন্ধানী দৃষ্টিতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল তাকে তিনি প্রকাশ করলেন তিক্ত ভাষায় "অরণ্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু মনে হইল মানুষের মনের অরণ্য রহস্য বিভীষিকাটি তাহাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।" অনুসন্ধিৎসু পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করবেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পের বিকৃত জটিল মনস্তত্ত্ব সেযুগে আরও কোন কোনও লেখকের লেখায় উপজীব্য হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধোত্তর অবক্ষয় যে বিশেষ যুগচেতনা সৃষ্টি করেছিল সাহিত্যচেতনার যন্ত্রণাবোধ এনেছিল তার প্রকাশ নানাভাবে ঘটেছিল নানা স্রষ্টার সৃষ্টিতে।

জগদীশ গুপ্তের লেখায় যুগমানসের অবিশ্বাস, সংশয় ও মর্মজ্বালার তীব্র তীর্যক তীক্ষ্ম বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ জীবন পরিবেশ থেকেই তিনি অনাস্বাদিতপূর্ব জীবনরস সৃষ্টি করেছেন। তার পরিমন্ডল মানবমনের কূটৈষণা ও জটিলতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। জীবনের পরিণাম সম্পর্কে হতাশাজর্জর ক্লান্তি, সর্পিল গ্লানিময় অভিজ্ঞতালব্ধ তিক্ততা তাঁর সাহিত্যপাঠের ফলশ্রুতি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক বৈশিষ্ট্য—জীবনের শুভ পরিণাম সম্পর্কে অনাস্থা। মানবজীবনের ব্যর্থতার পিছনে রয়েছে নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম পরিহাস। কখনো অদৃষ্টের অঙ্গুলিনির্দেশে, কখনো বা জীবনপরিবেশের অনিবার্য বন্ধনের মধ্য দিয়ে এবং কখনো সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতায় এই নিয়তির অমোঘ বিধান কার্যকরী হয়েছে। এ অপ্রতিরোধ্য দুর্নিবার এবং সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় নেই পরিত্রাণের। 'লঘুগুরু' উপন্যাসে উত্তমের আশাভঙ্গ ও সামগ্রিক ব্যার্থতাবোধ ও 'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসে নটবরের নিয়তিনিয়ন্ত্রিত মানবিকবোধের মর্মান্তিক ব্যথাবেদনা লক্ষণীয়। 'দুলালের দোলা' উপন্যাসে কিশোরীর স্বামীর লালসাপঙ্কিল জীবন এবং তার পরিণামে সংঘাত ও তার অগ্নিতে আত্মাহুতি নারীজীবনের চূড়ান্ত বিনষ্টির পরিচয় বহন করে। 'দুলালের দোলা'য় সতীশ দাস যখন জানতে পারে তার পিতা তার মায়ের অবৈধ সন্তান—তখন সমগ্র নারীজাতির প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ তাকে চালিত করে অস্থিরতার অলাতচক্রে; এই অনিবার্য ঘটনা থেকে তার রেহাই নেই জেনেই সে অবশ্যম্ভাবী অনির্বাণ অশান্তির দাবদাহে দগ্ধ হয়। উপনিষদে আছে 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম' —কিন্তু জগদীশ গুপ্ত রুদ্রের দক্ষিণ মুখের পবিত্রতা ও পরিত্রাণের অভয় আশ্বাস কখনো মানবজীবনে দেখতে পাননি—তাই তাঁব সাহিত্যিক তামসতপস্যা গভীরতর অন্ধকারের দিকেই এগিয়ে গেছে। সাহিত্য সমালোচক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেছেন, 'নগ্নতম ক্ষুধা ও জঘন্যতম হিংস্রতাকে যেমন তিনি অকপট কলমে ফুটিয়েছেন, তেমনি ফুটিয়েছেন বর্বরতম অত্যাচার ও নির্মমতম শোষণকেও।' বলা বাহুল্য, সমসাময়িক এই বলিষ্ঠ লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-চেতনায় সঞ্চার করেছে বস্তুসচেতনতার নতুন ইঙ্গিত।

গোপাল হালদারের 'একদা' উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময়ে দেশে

যে বিভিন্ন রাজনৈতিক চেতনা প্রত্যক্ষ এবং কর্মধারার বিকাশ হয় তার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদ এবং মার্ক্সীয় চিন্তাধারা-অনুসারী সাম্যবাদী বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টা এ সময়ের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক তরঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দেব শেষ দিকে তাশখন্দেব ভারতের প্রবাসী বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কানপুরে বিভিন্ন স্থানের কমিউনিস্টদের একত্রিত করে গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটি। ১৯৩০-এর পর থেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে মার্ক্স্ ও লেনিনের চিন্তা ও কর্মধারা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। প্রখ্যাত চিন্তাশীল লেখক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন,"১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বাঙালীর সঙ্গে রাশিয়ার একটা যোগ হচ্ছিল।" এই যোগ সাহিত্যের মাধ্যমে। 'একদা' উপন্যাসকে এই পটভূমিকাতেই স্থাপন করে বিচার করতে হবে। 'একদা'র নায়ক অমিতের রাজনৈতিক অদর্শবাদী চিন্তাকে ছাপিয়ে তার সামগ্রিক জীবনবোধ এবং আত্মজিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠলেও, এ গ্রন্থে যে সে সাম্যবাদী চিন্তাধারার প্রতি সবচেয়ে আস্থা স্থাপন করেছে সেই সংবাদ আমাদের আলোচ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার উপরে প্রভাব ফেলেছে—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদও তাকে প্রণোদিত করেছে নতুন দিনের সমাজবোধ গঠনে ও সমাজজীবন পুনর্গঠনে। লেখক বলেছেল,"...ব্যক্তিবাদ আসলে মানুষের 'ছোট আমি'র পূজা..........যেখানে সত্তার সত্যকার প্রকাশ সেখানে সত্তার অনন্ত বিরাট রূপ। শ্রেণীবৈষম্য-পীড়িত এই ব্যবস্থা শেষ না হইতে মানবসত্তা সেই বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করিতেই পারে না—সমাজকে পঙ্গু করিয়া নিজেরও সেই সুস্থ সম্ভাবনাকেই সে অস্বীকার করে।" প্রত্যেক মানুষের রয়েছে দুটি দিক a man with social historyí ¤-+— 'a man with a personal history'- এই যে R Fox কথিত ব্যক্তির 'dual history"— যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক চেতনার অঙ্গাঙ্গী যোগের প্রসঙ্গ এসেছে তা বিশেষ বিচার্য। ব্যক্তি তার নিজস্ব দেহ মন ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠলেও তার পূর্ণাঙ্গ স্বরূপ গঠনে বহিঃপ্রেরণা ও অন্তঃপ্রেরণা সঞ্চার করে সমাজ। ব্যক্তি পদ্ম, সমাজ জলাশয়। পদ্মের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও জলাশয় ছাড়া তার সৃষ্টি অবস্থান ও প্রাথমিক অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আবার একটি ফুলকে যদি সমাজ হিসেবে ধরা যায়, পাপড়িগুলি যেন ব্যক্তি। পাপড়িগুলির মধ্যে এক একটিকে যদি বিচ্ছিন্ন করে নিই, তবে ফুল তার সমগ্রতা হারায়। একটি পাপড়ি একটি স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে বিবেচিত হলেও সে খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন—পরন্তু পুষ্পক্রোড়বিচ্যুত হওয়ায় সে সমগ্রতার সৌরভও হারায়। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিও তাই। গোপাল হালদারে এ ধরনের চেতনার সূচনা, পরিণতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে। মানিক তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির সূচনাপর্ব থেকেই ব্যক্তি ও সমাজের এই প্রকাশ্য স্বাতন্ত্র্য এবং প্রচ্ছন্ন অন্তর্মিলকে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন। কখনো কখনো বাক্তি ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও সেই দ্বন্দ্ব ও অন্তঃসংঘাত ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করতে সাহায্য করে অথবা তা সমাজপ্রগতির দিঙ্নির্ণয়ে সহায়তা করে। মার্ক্সীয় চিন্তাধারার যে উত্তরাধিকার বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মনে নতুন শ্রেণী ও সমাজগঠনে



প্রেরণা-সঞ্চার করেছিল তার প্রারম্ভিক পরিচয় আছে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'মোহানা' উপন্যাসে,—তারই ধারা চলেছে গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাসে এবং পরিশেষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে উত্তরকালে। এই সূত্রেই গোপাল হালদার ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য পরস্পর সন্নিবদ্ধ।

জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা ও সংঘাত

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মকাল এবং অনতিপরবর্তীকাল এবং তাঁর সৃষ্টির সূচনাকালে দেশের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ও সংঘাত তাঁকে কেমন ভাবিয়ে তুলেছিল—তা বিচার করে দেখতে হবে। কী ধরনের মানসিক পরিস্থিতি তাঁকে মার্ক্‌স্‌বাদে দীক্ষা গ্রহণে এগিয়ে দিয়েছিল তাও ভেবে দেখতে হবে। কী রকমের মানসিক প্রবণতা এবং সাহিত্যবোধ তাঁর ছিল এবং কোন্ বিশেষ ধরনের ঐক্যসূত্রে তাঁর সাহিত্যগ্রন্থাবলী পারম্পর্যপূর্ণভাবে সংগ্রথিত তাও এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"১৯২১ সালে এবং ১৯৩০ সালে বার বার দু'বার তখন গণ আন্দোলন ভেঙে পড়লো। অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনা ও লৌকিক সাধনার যে সমন্বয় চেষ্টা বা পরিকল্পনার মধ্যে আমরা কিছুদিনের জন্য মহা আশ্বাসে আশ্বাসিত হয়ে উঠেছিলাম, সে আশ্বাসভঙ্গের ফলে এবং বিগত মহাযুদ্ধের ফলস্বরূপ (প্রথম মহাযুদ্ধ) পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত অবস্থায় আমাদের জীবনও অনুরূপ ক্ষোভে ভরে উঠেছিল...রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অহিংসধর্মী আন্দোলনকে উপেক্ষা করে সন্ত্রাসবাদীর পুনরাবির্ভাব এই ক্ষোভের আর এক দিকের নিদর্শন।....সমন্বয় নয়, বিপ্লবের বাসনা সাহিত্যে সঞ্চারিত হোতে চাওয়াটাই এই সাহিত্যের বড় লক্ষণ। এই অধীর চিত্তের প্রতিফলন দিয়েই এই সাহিত্যের সুরু।"

এর থেকে দুটি জিনিস সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অহিংসাকে উপেক্ষা করে সহিংস পদ্ধতি প্রবল হয় এবং সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনার ব্যাপক সঞ্চার ঘটে। এছাড়া,প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের প্রতিক্রিয়াও সমাজমানসে দারুণ আঘাত হানে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে দেশের নানা অঞ্চলে দ্রুত শিল্পপ্রসার ঘটলেও মুদ্রাস্ফীতি প্রবল হয়ে ওঠে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারে পড়ে অর্থনৈতিক ভাঙনের মুখে। বাঙালি মধ্যবিত্তদের দুটি শাখা—১। জমির উপস্বত্বভোগী এবং ২। চাকুরে সম্প্রদায় ও বিভিন্ন বৃত্তিধারী ব্যক্তিগণ। জমির উপস্বত্বভোগীরা যুদ্ধের পূর্ব থেকেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। চাকুরে সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি সম্পর্কে একটি সমীক্ষা থেকে দেখা যায় শতকরা ২৯টি পরিবারে আয়ব্যয়ের সমতা ছিল, শতকরা ৬৬টি পরিবারে ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি এবং শতকরা ৫টি মাত্র পরিবারে আয় ব্যয়ের চেয়ে বেশি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচনায় যে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেছেন, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার বাস্তব পটভূমি (পূর্বোক্ত পরিসংখ্যান থেকে) বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

এ সময় ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমে জটিল ও বিক্ষোভপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঢেউ এসে পৌঁছায় এদেশে। সাম্যবাদী চেতনার প্রসার ঘটাতে থাকে। ইংরেজ সরকার এদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে। তারা অবিলম্বে তখনকার চারজন বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতার বিরুদ্ধে কানপুরে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে তাদের কারারুদ্ধ করে। কিন্তু তাতেও শ্রমিক আন্দোলনে বাধা পড়েনি। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষক মজদুর পার্টি গঠিত হয়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্ট-বিরোধী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার ফলে এই গোষ্ঠীর প্রভাব দেশে অতিশয় বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এ সময়েই প্রকাশিত হয় 'সংহতি'— শ্রমিকজীবনের মুখপত্ররূপে যার আত্মপ্রকাশ। 'সংহতি'র পৃষ্ঠাতেই বেরোয় এই ধরনের প্রথম গল্প 'দিনমজুর'-লেখক নারায়ণ ভট্টাচার্য। এর পর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় 'লাঙল','গণবাণী' ও 'গণশক্তি' ইত্যাদি পত্র পত্রিকা। ১৩২৪ সালে 'গৃহস্থ'পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'সোসিয়ালিজ্‌ম্' প্রবন্ধ।

এদেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পর্কেও নানা চিন্তাভাবনা বিস্তৃত হচ্ছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন—"'অর্থনৈতিক' কথার অর্থ ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও পুঁজি এবং তাহাদের প্রতিরূপ ভারতীয় পুঁজিপতি ও পুঁজি হইতে মুক্তি।....দেশের দরিদ্রতম মানুষও যেন নিজেকে উচচতমের সহিত সমান বলিয়া অনুভব করে। ধনিকেরা এবং পুঁজিপতিরা যদি তাঁহাদের ধন ও কর্মনৈপুণ্য দেশের দরিদ্রতম ও দীনতম ব্যক্তিদের সহিত ভাগ করিয়া নেন তবেই ইহা সম্ভব।"

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চীন ভ্রমণকালে জনসাধারণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্যে বলেন— "Unless the whole people is happy no individual can have true happiness. Unless all are wealthy no man, however rich, can have real wealth. ..... I want to give the people the responsibility for their own destiny, so that through their self respect they may help themselves."

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য স্বত্ত্বেও গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই তাঁদের বক্তব্যে দরিদ্র নিঃস্ব জনগণের আর্থিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দাবীকেই সমর্থন করছিলেন। এতে বোঝা যায়, শোষণ ও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অর্থনৈতিক মুক্তিচিন্তার প্রবল তরঙ্গ সেদিন চিন্তানায়কদের মনে আলোড়ন এনেছিল। কিন্তু আর এক ধারার চিন্তায় এই অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপক সংগ্রামের আহ্বান ধ্বনিত হল—বলা বাহুল্য তা মার্ক্সীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য করার আগে' প্রবন্ধে বলেছেন, "ভদ্রজীবনকে ভালবাসি, ভদ্র আপনজনদেরই আপন হাতে চাই, বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি, অথচ এই জীবনের সংকীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য মুখোস-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোটলোক চাষাভূষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার ওই ছোটোলোকদের অমার্জিত

রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।

বাড়তে বাড়তে এই সংঘাত প্রথম যৌবনে অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে, লিখতে আরম্ভ করার পর বাস্তবকে স্বীকৃতিদানের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে এই সংঘাতের তীব্রতা কমে আসে।

মার্কস্‌বাদ আজ আমার এ সংঘাতের স্বরূপ চিনেয়ে দিয়েছে। এ সংঘাত হলো ভাববাদ ও বস্তুবাদেরই সংঘাত, সমাজজীবনে আজ যা প্রকট হয়েছে ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।"

এই প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতালাভ ও সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাগুলি স্মরণ করা দরকার। ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্পর্কে বলা হয় যে, গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে স্বাধীনতা এসেছে। কিন্তু এর সঙ্গে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ফ্যাসিজমের পরাজয় ও সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক শক্তির জয়লাভ এবং দ্বিতীয়টি হল, আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজের সর্বাধিনায়করূপে নেতাজীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে দারুণ আঘাত প্রদান। কিন্তু স্বাধীনতার ফলে জাতীয় জীবনে নেমে এলো বিভীষিকার অন্ধকার—হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। যে রক্ত ও অশ্রু সেদিন ঝরে পড়েছিল—তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনকে করে তুলল অচল ও অসাড়। যে উদ্বাস্তু সমস্যা সেদিন জগদ্দল পাথরের মতো জাতির বুকের ওপর চেপে বসল—আজও তার অপসারণ সম্ভব হয়নি। অর্থনৈতিক দিক থেকেও জাতি রইল পিছিয়ে। অতীতের গ্রামজীবন কেন্দ্রিক কৃষিনির্ভর সামন্তযুগীয় অর্থনীতির কাল পার হয়ে দেশ আধুনিক শ্রমশিল্পনির্ভর অর্থনীতির যুগে প্রবেশ করেছে। শ্রমশিল্পায়নের ফলে প্রাপ্ত সুযোগসুবিধা পেয়েছে প্রধানতঃ সমাজের ওপরতলার লোকেরা। আর দীনদরিদ্র শ্রমিকেরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। একথা অনস্বীকার্য যে, সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় শিল্পনীতি রচিত ও প্রযুক্ত হয়নি। বিজ্ঞানসম্মত এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত অর্থনীতিও প্রবর্তিত হয়নি। এর ফলে ভারতের অবহেলিত সাধারণের বৈষয়িক উন্নতি ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতিই যথার্থভাবে লাভ করা সম্ভব হয়নি। যে অসম বৈষয়িক উন্নতি দেশে হয়েছে—তার ফলে ধনী আরও ধনী হয়েছে, গরীব শোচনীয় দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে। আর দুটি বিষময় ফল ফলেছে—অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি, চুরি জুয়াচুরী, জাল ভেজাল ও ঘুষের রাজত্ব। আর, বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল থেকে যে কালোবাজার সমাজদেহে বিষক্ষতের মতো স্থায়ী হয়েছে আজও তা সতেজ রয়েছে আড়ালে আবডালে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের পর শাসক শোষক ধনিক ও বণিক শ্রেণীর চক্রান্তে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও নৈতিক জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। তারপর দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার চাপে জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং বাস্তুচ্যুত দরিদ্র নিরন্ন গ্রামাঞ্চলের লোকের শহরে চলে আসা—নাগরিক জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে দুর্বিষহ। এই পটভূমিকাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এনেছে কঠিন বাস্তবতা। তবু তাঁর মার্কস্‌বাদে দীক্ষাগ্রহণের কার্যকারণপরম্পরা বিশ্লেষণে

আরও দু'একটি প্রসঙ্গের আলোচনা দরকার। সোভিয়েট বিপ্লবের পর পৃথিবীর এক বিরাট অংশ সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশ থেকে মুক্তি পায়। ভারতে সোভিয়েট বিপ্লব যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে, তার সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে—১। শ্রমিকশ্রেণীও তাদের সহযোগী কৃষকশ্রেণীর সংগঠন গড়ে ওঠে, ২। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়, ৩। ভারতে বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে চিন্তা শুরু হয়, ৪। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দও সোভিয়েট অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, ৫। ধীরে ধীরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী মার্ক্সবাদী দলগুলি সংগঠিত হতে থাকে, ৬। পেশোয়ার, কানপুর এবং বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সোভিয়েট বিপ্লব ও কমুনিজ্‌মের ভাবাদর্শ জনগণের মনে দৃঢ়ভবে অঙ্কিত হতে থাকে, ৭। রুশ বিপ্লব, ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগসুবিধা পেতে ভারতীয়দের সাহায্য করে এবং ৮। নানাবিধ পত্রপত্রিকা ও বাংলার সাহিত্যিক বিষয়বস্তুর মধ্যে রুশ বিপ্লবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিপ্রয়াস-চিন্তা প্রবল হয়ে ওঠে। এমনকি এ সময়ে গান্ধীজীও বলেন—

"দিল্লীর গগনচুম্বী অট্টালিকা আর দারিদ্র্যপিষ্ট শ্রমিকের জীর্ণ বস্তির মধ্যে যে পার্থক্য এখন চোখে পড়ে প্রকৃত স্বাধীন ভারতে তা বজায় রাখা চলবে না। জাতির সম্পদ ও ক্ষমতা যদি সকলে মিলে সমানভাবে ভোগ না করতে পারে—ধনী-নির্ধনের বিভেদ যদি নিঃশেষে বিলুপ্ত না হয়, তবে রক্তক্ষয়ী গণবিপ্লবের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে এবং তাকে রোধ করবার ক্ষমতা কারও সেদিন থাকবে না।"

বলা বাহুল্য, জাতির জীবনে এ সমস্ত ধরনের সমস্যা সংঘাত নবচেতনা ও চিন্তা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে মার্ক্সবাদে আত্মানুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত করেছিল। বিশেষভাবে তাঁর উত্তরপর্বের সাহিত্যে তাঁর পরিণত জীবনবোধের গভীরে মার্ক্সবাদ অতন্দ্র নির্মোহ সত্যসন্ধানে তাঁকে উদ্দীপিত করেছে।

মার্ক্সবাদী সাহিত্যবিচাররীতি ও মানিক-সাহিত্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "লেখক নিছক কলম-পেষা মজুর। কলম-পেষা যদি তার কাজে না লাগে তবে রাস্তার ধারে বসে যে মজুর খোয়া ভাঙে তার চেয়েও জীবন তার ব্যর্থ, বেঁচে থাকা নিরর্থক।" এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি লেখক - জীবনের মূল্যায়ন করেছেন দেখে স্বভাবতঃই উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি মার্ক্সীয় দৃষ্টির উত্তরাধিকারী। মার্ক্সবাদ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, সাহিত্যে মার্ক্সপন্থা অনুসরণ এবং পরিশেষে মার্ক্সবাদ প্রচারে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁক সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকমাত্রকেই একথা বুঝতে সাহায্য করে যে, তিনি ছিলেন মার্ক্সপন্থী সাহিত্যিকগণের প্রবল প্রেরণাস্বরূপ। তিনি মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সাহিত্যে কিভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বুঝেছেন তা তাঁর নিজের কথা থেকেই শোনা যাক—

প্রথমতঃ তিনি বলেছেন, "লিখতে আরম্ভ করার পর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আগেও ঘটেছে, মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে সে পরিবর্তন ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করি।"

দ্বিতীয়তঃ "মার্কস্‌বাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির সঠিক পথ বাতলাতে পারে, অতীত কি ছিল,বর্তমান কি হয়েছে এবং কিভাবে কোন্ ভবিষ্যৎ আসবে জানিয়ে দিতে পারে তখন মার্কস্‌বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে সাহিত্য করতে গেলে এলোমেলো উল্টোপাল্টা অনেক কিছু তো ঘটবেই।"

তৃতীয়তঃ "বাংলার সমাজজীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণীসম্পর্কের বর্তমান রূপ এবং ঐতিহাসিক গতিপ্রকৃতির বিচার বিশ্লেষণের মধ্যে প্রগতিসাহিত্যের বর্তমান রূপটাই অনিবার্য ছিল এবং এই প্রগতিসাহিত্য সম্পর্কে হতাশার কিছুমাত্র কারণ নেই।"

মানিক মনে করেন, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যেই তিনি যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি করবার দক্ষতা অর্জন করেছেন। মার্কস্‌বাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগতির নির্ভুল পথ দেখাতে পারে বলে তিনি স্থির বিশ্বাস করেছেন, তখন মার্কস্‌বাদই তার একান্ত গ্রহণযোগ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এজন্য তাঁর পরিণত সাহিত্যবোধ মার্কসীয় ভাবধারাকেই অনুসরণ করেছে।

মার্কস্ বলেছেন, "জড়জগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য 'উৎপাদন পদ্ধতি', সামাজিক রাজনীতিক এবং চিন্তাজগতের জীবনের সমগ্র গতিই নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের জ্ঞান তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে না, বরং তাহার সামাজিক অস্তিত্ব তাহার জ্ঞান নিরূপণ করে। এই ক্রমোন্নতির একটা অবস্থায় সমাজের উৎপাদনের বস্তুতান্ত্রিক শক্তিসমূহ, উৎপাদনের তৎকালীন অবস্থিত সম্বন্ধ সমূহের অর্থাৎ আইনের ভাষায় সেই সময়কার বৈষয়িক সম্বন্ধের সহিত সংঘর্ষ হয়। এই অবস্থা থেকেই সামাজিক বিপ্লব আরম্ভ হয়। সমাজের আর্থনীতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে উপরের সৌধ কমবেশী শীঘ্রই রূপান্তরিত হয়।"

প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের গোড়ার কথা, শ্রমকে এই সাহিত্য 'সৃষ্টি' বলে উপলব্ধি করবে। যখন শ্রমজীবী মানুষ বুঝতে পারবেন যে, তিনি নিজের জন্যই পরিশ্রম করছেন এবং তার বিনিময়ে সমাজ তাঁকে তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয় দিচ্ছে এবং শ্রমজীবী সমাজের একটি শোষণবিহীন অঙ্গ - তখন প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের বিকাশকাল সূচিত হবে। প্রলেতারিয়েত সাহিত্য সুস্থ সবল জাতির উন্নত ও মুক্তির আনন্দপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা বলবে। লেনিন বলেছিলেন, ëëLiterature must become part of the common cause of the proletariat ....' আরও বলেছিলেন, 'Literature must become a component of organised planned and integrated social-democratic party work' তিনি 'Party organisation and Party literature' প্রসঙ্গে অকপটে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়—

``All Social-democratic literature must become Party literature ....only then will 'social-democratic' literature really become worthy of that name, only then will it be able to fulfil its duty and, even within the frame work of bourgeois society, break out of bourgeois slavery and merge with the movement of the really advanced and thoroughly revolutionary class."

প্রলেতারিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থায় অন্যতম করণীয় কাজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোর্কি বলেছেন— "The proletarian state must educate thousands of first-rate "masters of culture" and "engineers of souls" This is needed so as to return to the whole mass of working people that right to develop their minds, talents, and abilities that they have been deprived of throughout the world. This practically attainable goal imposes on us, writers, a strict responsibility for our work and social behaviour."

মাও-ৎসে তুঙ বলেছিলেন — শিল্পী-সাহিত্যিকদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে—"এটা ঠিক যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের শিল্পকলা বিষয়ক রচনা পাঠ কার উচিত; কিন্তু প্রত্যেক বিপ্লবীরই অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে মার্কস্‌বাদী লেনিনবাদী বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা, শিল্পী সাহিত্যিকরা এর ব্যতিক্রম নয়। শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাজকে অধ্যয়ন করতে হবে; অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রত্যেক শ্রেণীর অবস্থা, তাদের চেহারা এবং তাদের মনস্তত্ত্ব শিল্পী-সাহিত্যিকদের পর্যালোচনা করতে হবে। এসব বিষয় সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারলে তবেই আমরা অন্তর্বস্তুতে সমৃদ্ধ শিল্পসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারব এবং শিল্প-সাহিত্যকে সঠিকভাবে নবরূপ দান করতে পারব।" সাহিত্যিকগণের কর্তব্য এবং আগামী যুগের সাহিত্যের গতি প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাও-ৎসে তুঙ বলেছেন—"বৈপ্লবিক শিল্পসাহিত্যের উচিত বাস্তব জীবন থেকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করা এবং ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে জনগণকে সাহায্য করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদিকে রয়েছে অনাহারে, শীতে ও অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ, আর অন্যদিকে রয়েছে এইসব লোক যারা তাদেরই সমাজের মানুষকে শোষণ ও নির্যাতন করে। এই রকম ঘটনা সব জায়গাতেই ঘটে এবং মানুষ এগুলোকে গতানুতিক দৃষ্টিতে দেখে; শিল্পী-সাহিত্যিকেরা এই প্রাত্যহিক ঘটনাগুলো কেন্দ্রীভূত করে থাকেন, এগুলোর ভিতরকার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে বৈশিষ্ট্যদান করেন এবং এমন সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি করেন যা জনগণকে জাগিয়ে তোলে, তাঁদের মধ্যে উদ্দীপনার আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং পরিবেশের পরিবর্তন সাধনে তাঁদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং সংগ্রাম করতে অনুপ্রাণিত করে। এ ধরনের সাহিত্য-শিল্প ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে না, কিংবা কার্যকরভাবেও দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে না।"

লেনিন, গোর্কি ও মাও-ৎসে তুঙ সাম্যবাদী সমাজগঠনের জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত নিপীড়িত মানব-মানবীর ভাবগত দিককে গড়ে তোলার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন শিল্পী সাহিত্যিকদের। এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন আমাদের দেশের শিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। মধ্যবিত্তদের সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল বহু পূর্বেই। তারপর ক্রমে তিনি মার্কস্‌বাদেব সংস্পর্শে এলেন। 'সহরতলী' উপন্যাসে সত্যপ্রিয় আর জ্যোতির্ময়ের কাহিনীর মধ্যে মধ্যবিত্তদের সম্বন্ধে উপলব্ধির সূত্রে ধনতন্ত্রের যথার্থ রূপ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছিলেন তিনি; 'প্রতিবিম্ব' উপন্যাসের সন্ধিলগ্ন পার হয়ে তাই তাঁর সাম্যবাদী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত গণ-আন্দোলনের অনাবাদী ভূমিতে পদসঞ্চার অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি যে মার্কসীয় সমালোচকের দৃষ্টিতে একজন সার্থক শিল্পী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যখন দেখা যায় তিনি পুরাতন ও অনতিপূর্বকালে

লব্ধ গণচেতনার অভিজ্ঞতাকে পিছনে রেখে বারংবার নূতন থেকে নূতনতর অভিজ্ঞতার সন্ধানে চলেছেন, থেমে নেই, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, তিনি যে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার রূপায়ণে তাঁর ক্লান্তিহীন মানস-সংগ্রাম ছিল অতন্দ্র। প্রখ্যাত রুশ সমালোচক এ লুনাচারস্কির বিচারে অভিনিবেশ করলে লক্ষ্য করা যায় তিনি লিখেছেন— "The writer who illustrates in his works points of our programme which have already been fully developed is a bad artist, A writer is valuable when he cultivates virgin soil, when he intuitively breaks into a sphere which logic and statistics would find hard to penetrate."

এই যে সাহিত্যে নতুন দিগন্ত সন্ধান, —অনাবিষ্কৃত প্রদেশে সাহিত্যসম্ভাবনাকে প্রসারিত করা —এইখানে মূল্যবান সাহিত্যিক দক্ষতার প্রকাশ। বলা বাহুল্য, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তরকালের গল্পগুলির মধ্যে এই ধরনের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন (বিশেষ স্মরণীয়ঃ 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' এবং 'হারানের নাতজামাই ')। এজন্যে আশা করা যায়, একজন প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সীয় সমালোচকের দৃষ্টিতেও তাঁর সাহিত্য মূল্যবান সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত হবে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানিক-সাহিত্য

বিজ্ঞানের ছাত্র এবং আজীবন বিজ্ঞান-মনস্ক ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অনুশীলনে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণও বিজ্ঞান-বুদ্ধির অন্তর্গত। -সে হিসেবে তাঁর পূর্বে জগদীশ গুপ্ত পূর্বসূরীর গুরুত্ব দাবী করতে পারেন এবং সাম্প্রতিক কোন কোন ঔপন্যাসিকও বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সার্থক পরিচয় রেখেছেন তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে, তথাপি কি প্রবল আগ্রহে এবং প্রয়োগ-সার্থকতায় বৈজ্ঞানিকবুদ্ধির একনিষ্ঠ অনুশীলনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এ যাবৎ দ্বিতীয়রহিত। বলা বাহুল্য, উপন্যাসের আধারে গ্রহণযোগ্য সর্ববিধ সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়কে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের নিকষে যাচাই করে নেওয়া তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার আধুনিকতা এবং বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়। বড়ো বিষয়ের সঙ্গে ছোট বিষয়ের তুলনা হলেও - একথা বলা যায় যে, উনিশ শতকের রোমান্টিক ইউরোপের মানস- সংস্পর্শে একদা ক্লাসিক আদর্শের প্রভাবমুক্ত এবং সুপরিণত ঐতিহ্যহীন রুশ সাহিত্য যেমন ব্যাপক সৃষ্টিতে উচ্ছ্বসিত ও উৎসারিত হয়েছিল, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভিঘাত এসে পৌঁছল [illegible]সাহিত্যে-তাতে পুরানো দিনের অনেক আবর্জনা গেল ভেসে, দেখা দিল বিজ্ঞানালোকিত বস্তুতান্ত্রিকতা-যা বাস্তবতার অতন্দ্রিত অন্বেষণের নব নব গবাক্ষকে করল উন্মোচিত ও উদ্ভাসিত। প্রখ্যাত রুশ সমালোচক এ. লুনাচারস্কির অভিমত এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন— 'To demand that science give itself up entirely to practical tasks is a profound error. It is a well-known fact that the most abstract of scientific problems can, when solved, sometimes turn out to be the most fruitful.' এখানে

"the most abstract of scientific problems" এর কথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন।

এখন দেখা যেতে পারে কথাসাহিত্যে-বিশেষতঃ উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মানিক কী বলতে চেয়েছেন।

মানিক বলেছেন-

প্রথমতঃ "সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন... কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।"

দ্বিতীয়তঃ "সরাসরি বিজ্ঞানের কিছু শিক্ষা পাওয়া নয়, উপন্যাস লেখার জন্য দরকার খানিকটা বৈজ্ঞানিক বিচারবোধ।"

তৃতীয়তঃ "সমাজ ও জীবনে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাব ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।"

চতুর্থতঃ "সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কহীন নয়।... উপন্যাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অনেক বেশি স্পষ্ট ও ঘনিষ্ট। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হলো সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অবদান।"

পঞ্চমতঃ "নিত্য নতুন আবিষ্কারে বিজ্ঞান বদলে দিয়ে চলে সমাজ ও জীবনকে, বদলে দিয়ে চলে মানুষের চেতনাকে।"

ষষ্ঠতঃ "বিজ্ঞানকে, মানুষের বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশকে, একেবারে আর উপেক্ষা করতে না পেরে সাহিত্যকে নতুন একটি বিভাগ খুলতে হলো; অধ্যাত্মবাদের জের এবং ভাববাদ আত্মরক্ষার খাতিরে যুক্তিবাদের সাহায্যে বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে শুরু করলো উপন্যাসের ধারা।"

মানিক তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতাকে উপস্থাপিত করেছেন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যায়। তিনি চান ঔপন্যাসিক হবেন, বৈজ্ঞানিক বিচারবোধসম্পন্ন। বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ দান, তাঁর মতে, বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশ। সর্বশেষে, তিনি চান অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের মোহ থেকে মুক্তি। বলা বাহুল্য, তিনি পরোক্ষভাবে তাঁর নিজ উপন্যাসের সমীক্ষার পথ এ সমস্ত মন্তব্যের দ্বারা সহজ করে দিয়েছেন।

অলডাস হাক্সলীর সাহিত্য গড়ে উঠেছিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইংল্যাণ্ডের নৈতিক অবক্ষয় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীলতা অবলম্বন করে। তাঁর Point Counter Point উপন্যাসে ফুটে উঠেছে কামনা ও বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্ব। তিনি দেখেছেন মানুষের বিকৃতি ভণ্ডামি লোভলালসা ও অনিবার্য দুঃখজনক ভীষণতা। ধর্মচেতনা দ্বিধাদ্বন্দ্বে অবলুপ্তপ্রায়। Ape and Essence-এ তাঁর মানবজীবন সম্পর্কে পূর্বলব্ধ তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতারই সম্প্রসারণ। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের সাহিত্যেও নেমে এসেছে এই নৈরাশ্যপীড়িত জীবনযন্ত্রণার অভিজ্ঞান। প্রচ্ছন্ন দুঃখ দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতি কোথাও তাঁর সাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে না উঠলেও, তাই তাঁর শাণিত লেখনীতে এনেছে মর্মবিদারী

তীক্ষ্ণতা—যা বিদ্যুতের মতো আলোকিত করেছে যুদ্ধোত্তর বাঙালি-জীবনের সমস্ত অবক্ষয় গ্লানি ও মলিনতাকে। এক বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানমনস্কতা উভয়ের সাহিত্যে ফুটে উঠেছে—যা অবক্ষয়িত জীবনের মর্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' 'চিকিৎসা' ও 'নমুনা' গল্পে মানিক যুগের সর্বাত্মক লোভ নৈতিক অধঃপতন ও শুভ মূল্যবোধের মহতী বিনষ্টিকে অকুণ্ঠিত নির্মম বিশ্লেষণে অভিব্যক্ত করেছেন। তাঁর সাহিত্য 'বস্তুবাদী চেতনার ক্রমবিকাশে'র দিকেই উত্তরকালে অভ্রান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে গিয়েছে।

জীবন- সংগ্রাম

'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬) এবং 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাস দুটিতে মানিক বন্দোপাধ্যায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র আত্ম-সমালোচনায় তিনি লিখেছেন, "সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় হাবুডুবু খেতে খেতেও এতগুলি মানুষ চেষ্টা করছে সে অবস্থাকে অতিক্রম করতে—কুড়ি বছর আগের বাংলা দেশে যখন সামন্ততন্ত্র প্রধান সমস্যা বলেই গণ্য হত না, তখন মানুষের সামন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ, কিছু মানুযের হাতে পুতুল হবার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ, স্লোগানের বদলে সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে রূপ নিয়েছে।"

কোন কোন সমালোচক মানিককে 'ভাগ্যবাদী' বলতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন মানুষকে তিনি 'ভাগ্যের দাস' বানিয়েছেন, কিন্তু আসলে তা নয়। তিনি নিজেই তার প্রতিবাদ করেছেন। বলতে গেলে তিনি তাঁর ঔপন্যাসিক জীবনের প্রথম থেকেই 'অধ্যত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ' থেকে নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ সরিয়ে এনেছেন।

শশী এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। সে গ্রামজীবনের স্রষ্টা ও নির্মোহ ব্যাখ্যাতা। তার কোন কোন চরিত্রের সঙ্গে গভীর ও নিবিড় যোগ ও পরে বিচ্ছেদ হলেও—মূলতঃ সে সর্বত্র দর্শকের এবং বিচারকের আসনে সমাসীন। কুসুমের সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপার বাস্তব জীবনরসপুষ্ট এবং পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম এমন নান্দনিক সৌন্দর্যে রূপময়। কুমুদ ও মতির প্রেম মৃত্তিকার বাস্তবে ও নীড়ছাড়া পাখীর পক্ষবিধূননধ্বনিতে আকাশে রোমান্টিক সৌন্দর্যচয়নে নব নব বিস্ময়সঞ্চারী। প্রেম যেন তার সব বাস্তব অবাস্তব খেয়ালীপনা নিয়ে এই দুটি জীবনের মিলনের রঙ্গমঞ্চে বিচিত্রবর্ণ আলোকে রঙ্গনৃত্যে তন্ময়।

পিতা গোপালের প্রতারকের মনোভাব ও নীতিবর্জিত বণিকসুলভ জীবনধারার সঙ্গে শশীর বারংবার সংঘাত হলেও সে সংঘাতে শশী নতি স্বীকার করেনি কোথাও। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীচরিত্রের যথার্থ বিত্তদর্পী ও স্বৈরাচারী প্রতিভূ গোপাল ও নন্দ। শশী, সেনদিদি ও বিন্দুর প্রতি ব্যবহারে গোপাল এবং নিজের স্ত্রী বিন্দুকে গণিকার ন্যায় দূরে রাখার মধ্য দিয়ে নন্দ যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে তাতেই পুতুল কারা এবং কারা সেই পুতুল নাচায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নারীচরিত্রের বেশির ভাগই পুতুল আর সবচেয়ে নির্যাতিত পুতুল সেনদিদি ও

বিন্দু। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যেটুকু ফাঁক বা অবসর আছে—তা দিয়েই মুক্তির আলোহাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছে কুমুদ ও মতি। ভূত এবং অদ্ভুত রহস্য কুসংস্কার ও অনাবশ্যক তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জীবন-প্রতিবেশে বিকৃতি ও মলিনতার সৃষ্টি করে। সে সমস্তকে লালন করতে গিয়ে তারই হাতে নিজেকে বলি দিয়েছেন যাদব।

অর্থলালসা ও দেহসম্ভোগলালসা সামন্ততান্ত্রিক জীবনপ্রতিবেশে শোষণ ও মনুষ্যত্বহীন আচরণের জন্ম দেয়। তারই নির্মম নির্মোহ বিশ্লেষণ পুতুলনাচের রূপকে ও রহস্যে। শশী নতুন যুগ আনতে পারবে কি? শশীর জীবন পুতুল থেকে মানুষ হওয়ার সার্থকতায় উত্তীর্ণ। সেও কি আর সবাইকে ডাক দেবে না মনুষ্যত্বের মুক্তি-ক্ষেত্রে?

'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বাস্তববাদের যথার্থরূপ প্রদর্শন করলেন। এই বাস্তবতা তাঁর উপন্যাসের অংশবিশেষে কেমন রূপ পেয়েছে তা উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে— "দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙনধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জলভেদ করিয়া জাগিয়া ওঠে চর, অর্ধ-শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার জলে আবার-বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোন দিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এ-দিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্রমানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্তায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।"

জীবনসংগ্রাম থেকে যে বিষ ও অমৃত ওঠে তা আমরা অর্ঘ্য দিই আমাদের প্রাণের প্রিয় দেবতাকে। জেলেপাড়ার দেবতা কে? বা কারা? "ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসি-কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা" এরা। মানিক বন্দোপাধ্যায় এই জীবনের ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে চমৎকার বলেছেন, "ধর্ম যতই পৃথক হোক দিন-যাপনের মধ্যে তাহাদের (অর্থাৎ হিন্দু মুসলমানের) বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাহারা সমভাবে ধর্মের চেয়ে এক অধর্ম পালন করে—দারিদ্র্য।" একদিকে প্রকৃতির অত্যাচার ও অপরদিকে দারিদ্র্য এই দুই নির্মম ও নিষ্ঠুর শত্রুর বিরুদ্ধে পদ্মানদীর জেলেদের জীবনসংগ্রাম। কিন্তু এই নিরানন্দ মলিন কর্কশ ও তিক্ত জীবনের ওপরে বা খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়েও অন্তর্লীন সংযোগে অবিচ্ছিন্ন হোসেন মিয়া। সে স্বতন্ত্র, প্রায় মুক্ত এবং আনন্দময় ব্যতিক্রম। এই একঘেয়ে জীবনে সে-ই প্রকৃতপক্ষে বিচিত্রের নর্মবাঁশি বাজিয়ে এক বন্ধনহীন নিরুদ্দেশ যাত্রার সংকেত দিয়েছে। গোর্কির "The Lower

Depths' নাটকে একটি চরিত্র আছে। তার বিষয়ে বলা হয়েছে যে, 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌' -এর অতি নিম্নমানের দুঃখপূর্ণ জীবনের— ëëTo this miserable scene comes a man who with soft words and persuasive talk, sometimes telling the truth, sometimes telling lies when it is easier and more effective, tries to bring some happiness and awareness into the lives of these people He leaves as mysteriously as he came . . . .His presence was enough to give them some hope, so that one of the most bitter and sardonic can say, "Everybody lives for something better to come."

হোসেন মিয়া ও তার রহস্যময় ময়না দ্বীপে বসতি স্থাপন পরিকল্পনার মধ্যে উপরোক্ত চরিত্র ও কার্যকলাপের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। হোসেন মিয়ার কথা লেখকের মুখ থেকেই শোনা যাক্—"একটু রহস্যময় লোক এই হোসেন মিয়া। বাড়ি তাহার নোয়াখালি অঞ্চলে। কয়েক বৎসর হইতে কেতুপুরে বাস করিতেছে। বয়স তাহার কত হইয়াছে চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না, পাকা চুলে সে কলপ দেয়, নুরে মেহেদি রঙ লাগায়, কানে আতরমাখানো তুলা গুঁজিয়া রাখে। .... বড় অমায়িক ব্যবহার হোসেনের। লালচে রঙের দাড়ির ফাঁকে সব সময়েই সে মিষ্টি করিয়া হাসে। যে শত্রু , যে তাহার ক্ষতি করে, শাস্তি সে তাহাকে নির্মমভাবেই দেয় কিন্তু তাহাকে কেহ কোনদিন রাগ করিতে দেখিয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারে না। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নাই, সকলের সঙ্গে তার সমান মৃদু ও মিঠা কথা। .....সকলে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলে তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই সব অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তাহার ভালবাসা আছে। উপরে উঠিয়া গিয়াও ইহাদের আকর্ষণে নিজেকে সে যেন টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে।.... গোপন, গভীর ও দুর্জ্ঞেয় মতলব হাঁসিলের আয়োজন আরম্ভ করিলেও জেলেপাড়ায় এমন কেহ নাই যে তাহাকে কিছু বলিতে পারে। .... হোসেন মিয়া যে ছেলে-বুড়ো-স্ত্রী-নির্বিশেষে এক-একটি সমগ্র পরিবারকে কোথায় রাখিয়া আসিত প্রথমে কেহ তাহা টের পায় নাই, পরে জানা গিয়াছিল নোয়াখালির ওদিকে সমুদ্রের মধ্যে ছোট একটি দ্বীপে প্রজা বসাইয়া সে জমিদারি পত্তন করিতেছে। সে দ্বীপ নাকি গভীর জঙ্গলে আবৃত, শহর নাই, গ্রাম নাই, মানুষের বসতি নাই, শুধু আছে বন্য পশু এবং অসংখ্য পাখি। কিছু কিছু জঙ্গল সাফ করিয়া এই দ্বীপে হোসেন মিয়া ঋণগ্রস্ত উপবাস-খিন্ন পরিবারদের উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে।" বিপ্লবের দীর্ঘকাল পরে রুশ দেশের সাহিত্যে সে দেশের সাধারণ মানুষের নতুন জীবনধারার আলোকোজ্জ্বল রূপ দেখানো সাহিত্যিকদের পক্ষে সহজ হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে অচিরে সে সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্যময় একটি দ্বীপের কল্পনা করেছেন (যা সুবিস্তৃত লোকসমাজ থেকে দূরে)—যেখানে তার শোষণহীন জীবন সম্পর্কে প্রত্যাশা সার্থক হয়ে উঠবে। বাস্তবিক পক্ষে, 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌'-এর সেই ëEverybody lives for something better to comeí এই জীবনবোধ এখানে এক অব্যর্থ অভীপ্সায় জ্বলে উঠেছে। হোসেন মিয়ার অপূর্ব অদ্ভুত ও সম্ভাবনাময় চরিত্র বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। কুবের ও কপিলার ময়নাদ্বীপে যাত্রার বর্ণনা দিয়ে এই উপন্যাসের সমাপ্তি—সেই অংশটি তাৎপর্যময়—

"কপিলা চুপি চুপি বলে, না গেলা মাঝি, জেল খাট। কুবের বলে, হোসেন মিয়া দ্বীপ আমারে নিবই কপিলা। একবার জেল খাইটা পার পামু না। ফিরা আবার জেল খাটাইব।

কপিলা আর কথা বলে না।

ছই-এর মধ্যে গিয়া সে বসিল। কুবেরকে ডাকিয়া বলিল, আমারে নিবা মাঝি লগে?

হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারব না।"

আদিম সমাজের প্রাণাবেগ, জেলে মাঝিদের জীবনের সহজ প্রত্যক্ষ বাস্তবতা এবং নব সম্ভাবনাময় সচ্ছল জীবনের•রহস্যস্বপ্নে 'পদ্মানদীর মাঝি' সার্থক।

'মাঝির ছেলে' (১৯৬০) উপন্যাসে মানিক জীবনসংগ্রামের ভিন্নতর চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'পদ্মানদীর মাঝি'র জীবনপ্রতিবেশ এখানে একই রকম—তবু তার মধ্য থেকে বলিষ্ঠ বিদ্রোহরূপে বেরিয়ে এসেছে মাঝির ছেলে নাগা। সে জীবনগঠনভঙ্গিতে এবং আত্মপ্রত্যয়বলিষ্ঠতায় স্বতন্ত্র ও অনন্য। একদিকে মুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণে সে অনিবার আনন্দে মশগুল অপরদিকে সে মানবসমাজে কর্তব্য ও সত্যনিষ্ঠায় অবিচল। মাটি থেকে উঠে আসা মানুষের এ ধরনের ব্যক্তিত্ব মানিকের নতুন আবিষ্কার। যাদববাবুর চরিত্রে আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বে তাঁর অনিবার্য পরাভব—এযুগের বাস্তবসত্যের আলোকে প্রদীপ্ত।

মধ্যবিত্তের জীবনসংকট ও ক্ষয়িষ্ণু চেতনা

যুগের অপ্রতিহত সংঘাতে হতবল ও অবদমিত মধ্যবিত্তদের জীবনযুদ্ধে নৈরাশ্য ও অবিরলভাবে নীচে নেমে আসা লক্ষ্য করেছেন মানিক অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি দিয়ে। একটি বিশেষ যুগপর্বের কালসীমায় মধ্যবিত্তদের অবক্ষয়ের তিনি সার্থকতম রূপকার। 'জননী' (১৯৩৫) উপন্যাসে অবশ্য মানিক তত নৈরাশ্যবাদী নন। বরং নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে জননীর গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সাবলীল ভাষায় ও ভঙ্গিতে চিত্রিত করেছেন এখানে। বাংলা উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্র অধিক ক্রিয়াশীল দুঃখসহনশীল ও সংসারযাত্রার সহায়—এ রকম একটি অভিমত প্রচলিত আছে। জননী শ্যামার চরিত্রে মানিক এরকম এক নারীর পরিচয়ই উপস্থিত করেছেন। সমস্যাগ্রস্ত দুঃখপীড়িত নিঃসম্বল শ্যামা কেমনভাবে তার সন্তানদের মানুষ করে তুলল তা যেমন লেখক বর্ণনা করেছেন নিপুণভাবে তেমনই পার্শ্বচরিত্রগুলির চিত্রণে এনেছেন ব্যঙ্গ ও পরিহাসের অন্তর্নিহিত শ্লেষ। সর্বোপরি এ উপন্যাসে মানিক যে বাস্তবতা আনলেন বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব।

'জীবনের জটিলতা' (১৯৩৬) উপন্যাসে লেখকের মধ্যবিত্ত জীবনসমীক্ষা পরিণতির দিকে ঝুঁকেছে। সংকীর্ণ জীবনবৃত্তের মধ্যে লেখক মধ্যবিত্ত পুরুষ ও নারীর জীবনে প্রেমের জটিলতা, দারিদ্র্য ও বেকারত্বকে চিত্রিত করেছেন। বিমল প্রমীলা অধর শান্তা তাদের চাওয়া ও পাওয়ার

মধ্যে যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে তাই তাদের জীবনসংস্যার জটিলতার কারণ। শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছে, মধ্যবিত্ত জীবনে নীচুতলার মানুষদের তুলনায় কল্পনা ও ভাবুকতার যে অবসর আছে তা বোধ হয় ফাঁকা ও ফাঁকিতে ভরা অবাস্তব।

বহু বিতর্কিত উপন্যাস 'প্রতিবিম্ব'তে (১৯৪৩) মানিক, তারক নামক যুবকের চরিত্রের মধ্যে যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা তা লক্ষ্য করেছেন। পার্টির কাজে সেই ভাবধারা কেমনভাবে আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে সহজ সহনশীল পরিমার্জিত আবেগে পরিণত হচ্ছে তা রূপায়িত করতে চেয়েছেন। মনোজিনীর প্রতি সীতানাথের অস্বাভাবিক রোমান্টিক বিকার ও তারকের ক্ষোভ—পরে মনোজিনীর বাস্তববুদ্ধি ও বিদ্বেষহীন বিশ্লেষণে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে নতুন রূপ লাভ করে। যুবক-যুবতীর মহৎ কার্যপ্রণালীর মধ্যে একত্র অবস্থান যে অস্বাভাবিক নয়, তারকের ক্রমে এ উপলব্ধি হয়। তারকের মনে ভাবপ্রবণতা ও বাস্তবতার দ্বন্দ্ব এবং ক্রমে তা থেকে উত্তীর্ণ হবার সম্ভাবনা সংকেতিত হয়েছে এ উপন্যাসে।

'ধরাবাঁধা জীবনে' (১৯৪১) জীবনকে সামগ্রিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে দেখার অভাবেই ভূপেন অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত। স্ত্রী সরমা ছেলে নন্তুর মৃত্যুর পর যে জীবন তার তিক্ত মনে হয়েছিল তার মধ্যেই সে শান্তিসুখ আবিষ্কার করল। সে ভাবল, যে লেডী ডাক্তার প্রভাব জন্য সে এত প্রেম অনুভব করেছে সে আজ তাকে ধরা দিতে চায় না ....'সংসারে .... সুখ-শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই ভালবাসার।" প্রভার সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার নয় ভূপেন এবং এখানেই তার সংকীর্ণতা। প্রেমকে অস্বাভাবিকভাবে বড়ো করে তুলে সে নিজের জীবনে এবং পরে প্রভার জীবনেও ব্যর্থতা আনতে চেয়েছে। কিন্তু তার ভুল ভেঙে সে অবশেষে মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পেরেছে। সমবেদনা নয়, পরন্তু যে ব্যর্থতার ঘূর্ণিপাকে মধ্যবিত্ত জীবন অকারণে ব্যর্থ হয় তার নির্মোহ বিশ্লেষণ এই উপন্যাসে লক্ষণীয়।

'আদায়ের ইতিহাস' (১৯৪৭) উপন্যাসে মানিক চঞ্চলমতি লক্ষ্যভ্রষ্ট বিকারগ্রস্ত যুবক ত্রিষ্টুপের কথা বলেছেন। বলেছেন তার আদর্শহীনতা থেকে আদর্শজীবনে উত্তীর্ণ হবার ইতিহাস। জীবনে সে বড়ো কিছু কাজ করবে বলে বাবার অফিসে পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরানিগিরিতে যোগ দেয় নি। পরে তার ভুল ভেঙেছে। পাড়ার মণীশদার বোন রমলা ও তার ত্রিশটাকা মাইনের কেরানি স্বামী ধীরেনের সুখী সংসার দেখে সে বিস্মিত। রমলার দৃষ্টিতে "ব্যর্থতা ও সার্থকতার চেয়ে মানুষ অনেক বড়, যে অবস্থায় জীবনযাপন করুক, মানুষ চিরদিনই মানুষ।" অনেক ঐশ্বর্য নিয়ে সুখী হতে চেয়ে ত্রিষ্টুপ যে ভুল করেছিল, সে ভুল তার ভেঙেছে। সে মণীশের বোন কুন্তলাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। মণীশ ও কুন্তলা রাজী হয়নি। কুন্তলা বলেছে টাকা নয়, স্বাধীনতা তাদের কাম্য। টাকা যারা চায় তারা এক জাত, স্বাধীনকর্মীদের জাত আলাদা। কুন্তলার জামাইবাবু স্বাধীনতার জন্য জীবন—এ আদর্শে বিশ্বাসী। সে দিক দিয়ে তিনি সংগ্রামী। ক্রমে এই সুস্থ জীবনাদর্শে আস্থা স্থাপন করে ত্রিষ্টুপ কুন্তলাকে পাবার অধিকার অর্জন করেছে।

'পেশা' (১৯৫১) উপন্যাসে চিকিৎসক জীবনের নতুন দিগ্‌দর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন লেখক। ডাক্তার পালের সাহায্যে কেদার ডাক্তারি পাশ করেছে। ডাক্তারের মেয়ে গীতাকে সে বিয়ে করবে, তারপরে ডাক্তার পাল তাকে বিলেতে পাঠাবেন। ইতিমধ্যে তার মা শুভময়ীর মৃত্যু হয় ব্লাড প্রেসারে। যে নিজেকে পরিবার সম্পর্কে এত অচেতন—তার কি ডাক্তার হওয়া সাজে?

বহু রোগীকে সে মরে যেতে দেখে। ওষুধে ভেজাল। শুধু বেশি ফি নিয়ে ব্যবসা করার জন্য সে বিলেত ফেরত ডাক্তার হতে চায় না। ধনী ব্যবসায়ী ও স্বদেশী বলে খ্যাত অথচ জুয়াচুরিতে পটু ত্রৈলোক্য মজুমদার তাকে পেটেন্ট ব্যবসায়ে অংশীদার হতে বলে। কিন্তু জুয়াচুরির ব্যবসাতে সে অংশ নেয় না।

ক্রমে কেদার বোঝে বিলেতফেরত ডাক্তারেরা এদেশের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের কোন উপকার করে না। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রেরা হাতুড়ে টোটকা চিকিৎসা আর মাদুলি কবচ ঝাড়-ফুঁকে অর্থনৈতিক হীনতার কারণেই একান্ত নির্ভরশীল।

পরিশেষে সে নানা দেশে গিয়ে সর্বোত্তম চিকিৎসা শাস্ত্র শিখে দেশে নিজের প্রভাবে বিত্তহীনদের ব্যাপক চিকিৎসার উন্নয়নের কথা ভাবে। কেদার চরিত্রের অভিজ্ঞতা, জীবন ও পেশা সম্পর্কে তার চিন্তাধারার বিবর্তনে এ উপন্যাসের কাহিনী সার্থক।

'পাশাপাশি' (১৯৫২) উপন্যাসও আদর্শবাদী সুনীলের কাহিনী। নানা ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়ে সুনীল দশের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মেলাতে পেরেছে।

'ছন্দপতন' (১৯৫০) উপন্যাসে একজন কবির আত্মসমীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কবি নবকুমার কেবল কবিতাতেই নয়, জীবনেও বস্তুবাদী। কিন্তু কেবল পুঁথিগত জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎকর্ষে সত্যিকারের কবিতা হয় না। মানুষের কবিতা লিখতে হলে মানুষকে জানতে হবে ভালবাসতে হবে শ্রদ্ধা করতে হবে। কবি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ঐকতান' কবিতার কথা মনে আসে— "জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।" মানিক বন্দোপাধ্যায় বলেছিলেন, যাতে তাঁর নিজের এবং বোধ হয় উপন্যাসের ঐ কবির মর্মকথা স্বীকৃত হয়েছে—"জীবনকে জানা আর জীবনকে মায়া করা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। একটাকে বড় করে অন্যটাকে তুচ্ছ করা জীবনদর্শীর পক্ষে বীভৎস অপরাধ।"

মানিক বন্দোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত জীবনের যে ধরনের সমস্যার কথাই বলুন না কেন, তার থেকে নিষ্কৃতির কথাও বলেছেন। বস্তুতঃ তিনি মধ্যবিত্ত জীবনের বিকার ক্ষত গ্লানি লোভ ও স্বার্থপরতা ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই তা থেকে উত্তরণের সংকেতও দিতে পেরেছেন প্রায় নির্ভুলভাবেই।



ধর্ম ও মনোবিজ্ঞান

ধর্মেব মধ্যে কোন বিশেষ শক্তি নয় বরং ধর্মাচরণের অন্তরালে যে স্বার্থপরতা ও ফাঁকি, জাল ও জুয়াচুরি আছে মানিক তার রহস্য উদঘাটন করেছেন। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে মানবমনের নানা কামনা বাসনার সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করে মানসিক ইচ্ছাগুলির স্বরূপ ধরিয়ে দিয়েছেন। মার্ক্সীয় চিন্তাধারাদ্বারা প্রভাবিত এবং ফ্রয়েডের মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রণোদিত তাঁর সাহিত্যিক সন্ধানী দৃষ্টিতে বিজ্ঞানজিজ্ঞাসুর কৌতূহল এসে মিলেছে এবং তিনি বহু উপন্যাসে সার্থকভাবে মনোরহস্যসন্ধান করেছেন। এঙ্গেল্স্ তাঁর 'এ্যান্টি ডুরিং' গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে বলেছেন—"যে সমস্ত বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মনে তার যে অতি-কাল্পনিক প্রতিফলন পড়ে, ধর্মচিন্তা তা ছাড়া আর কিছু নয়। ... বিবর্তনের আরও পরবর্তীকালে অসংখ্য দেবতার নৈসর্গিক গুণাবলী একটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে গিয়ে বর্তায়, এই সর্বশক্তিমান হচ্ছেন আবার কাল্পনিক মহামানবের প্রতিমূর্তি।... এই সুবিধাজনক, কার্যকরী ও সহজবোধ্যরূপেই ধর্ম ... মানুষের চিন্তায় বেঁচে থাকতে পারে, ততদিনই পারে যতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত শক্তি মানুষের উপর প্রভাব বজায় রাখতে পারে।" কিন্তু এই ধর্মচিন্তার অবসান হবে কোন্ সময়ে?—"যে সময়ে এইভাবে মানুষ যা চাইবে সেই অনুযায়ী তা পাওয়ার বাবস্থাও করতে পারে, সেইদিনই মাত্র শেষ যে বাহ্যশক্তি, যা রূপ গ্রহণ করেছে ধর্মের মধ্যে, তার অবসান হবে—তার সাথে সাথে মানব-চেতনার ধর্মীয় প্রতিরূপেরও অবসান হবে, তার সহজ কারণ হচ্ছে সেদিন প্রতিফলিত হওয়ার মতো আর কিছু থাকবে না।" এই দৃষ্টিভঙ্গি মার্ক্স্পন্থী সাহিত্যিক মানিকের মধ্যে কার্যকরী হয়েছে। তাঁর উপন্যাসের আলোচনাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে যে, বুর্জোয়া সমাজের বিশেষ সুবিধাজনক কাজেই ধর্মের ব্যবহার হয়েছে, কৌশলীর কূটকৌশলের বিশেষ সহায়ক হয়েছে এই ধর্ম নামক ব্যাপার নিয়ে ব্যবসা। তিনি তাই মনোবিজ্ঞানের আলোয় ধর্মের কুয়াশায় রহস্যভেদ করতে চেয়েছেন। 'অহিংসা' (১৯৪১) মানিকের একটি ধর্মব্যবসায় সম্পর্কিত উপন্যাস। ধর্মের ছদ্ম আবরণে স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলালসা এবং যৌনজীবনের ক্ষুধা ও বিকার কেমনভাবে স্থান গ্রহণ করে তথাকথিত আশ্রমে—তারই বিবরণ দিয়েছেন লেখক। আশ্রমের মালিক বিপিন, সদানন্দ তার বন্ধু। সদানন্দ লোকচক্ষে গুরু, বিপিন তার শিষ্য। সাধারণের ভক্তি বিশ্বাসকে এরা অর্থাগমের কাজে লাগায়। এখানে স্ত্রীলোকদের যে আবাস আছে তাতে এসে উঠেছে মাধবী। এই মাধবীকে কেন্দ্র করে আশ্রমে দাঙ্গা বাধে। ক্রমে এর ভিতরে যে অনাচার লোভ হিংসা ও ভণ্ডামি আছে তার স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এ উপন্যাসের সব চরিত্রই বিকারগ্রস্ত। হয়ত উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র মহেশ চৌধুরীর কথাই ঠিক "পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অনেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছে।"

'আরোগ্য' (১৯৫৩) উপন্যাসে কেশব ড্রাইভার মধ্যবিত্ত যুবক হয়েও এই পেশা নিতে বাধ্য হয়েছে। সে চোরাকারবারীর অংশীদার অনিমেষের গাড়ী চালায়। তার মেয়ে ললনার প্রতি সে আকর্ষণ অনুভব করে, আবার গরীব বিধবা মায়াকে ভালবাসে। দ্বিধাবিভক্ত মন নিয়ে কেশব মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বক্রজটিল কামনা থেকে তার হিষ্টিরিয়া হয়। অসম্ভবকে

চাওয়া ও বাস্তবকে স্বীকার করতে না পারায় যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিল তাই হল তার বিপর্যয়ের কারণ। কেশব বোঝে সংসারে চারিদিকে যে অনিয়ম, তাতেই তার রোগ সৃষ্ট হয়েছে। সংসারকে পালটাতে হবে। উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে এইভাবে—

"কেশব হেসে বলে ... আমার অসুখ কেন জানিস? সংসারটা বদখত হয়ে আছে বলে। সংসারটা পাল্টে দেবার লড়াই করব ঠিক করেছি।

কানু বলে, বটে! ... সংসারটা যদ্দিন না পাল্টাচ্ছে তদ্দিন তোর রোগ সারবে না?

কেশব বলে.... সবার জীবন শুধরে দেবার লড়াই করব ঠিক করতে রোগ যেন অর্ধেক কমে গেছে। লড়াই আরম্ভ করলে নিশ্চই আরোগ্য।"

ফ্রয়েড থেকে মার্ক্সে এসে পৌঁচেছেন লেখক। ব্যক্তির কল্যাণের চিন্তা যখন সমষ্টির কল্যাণে এসে মিশেছে, তখনই প্রতিকারের রাস্তা খুলে গেছে। মনোবিজ্ঞানের পথেই লেখক সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন।

প্রেম ও তার বিশেষ তাৎপর্য

আদি মধ্য ও অন্ত সকল পর্বেই মানিক প্রেমের উপন্যাস রচনা করেছেন। প্রথমতঃ ফ্রয়েড লরেন্স ও জয়েস এবং দ্বিতীয়তঃ মার্ক্সীয় জীবনপদ্ধতির প্রতি তাঁর ক্রমবিকাশশীল আস্থা তাঁর প্রেমসম্পর্কিত প্রত্যয়কে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। মনোবিজ্ঞানের সন্ধানী আলোকরশ্মি তাঁর পক্ষে জীবনরহস্যের মধ্যবর্তী প্রেম নামক অপূর্ব বিষয়ের মর্মসত্য ও রসস্বরূপ উন্মোচনের সহায়ক হয়েছে।

'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) মানিকের মতে 'গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ।' আর এখানকার চরিত্রগুলি মানুষের projection—মানুষের এক টুক্‌রো মানসিক অংশ।' হেরম্ব এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। অস্তিত্ববাদী সাহিত্যিকেরা মানুষের জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, মানিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা সেই দেখার রীতিকে অনুসরণ করেছে হেরম্ব চরিত্রসৃষ্টিতে। অস্তিত্বের সমস্যা, আত্মবিশ্লেষণ প্রবণতা, পাপচেতনা এবং অস্থায়ী ভাবাকুলতা জীবনসমস্যাকে দুরূহ করে তোলে। এই সঙ্গে দেখা দেয় উদ্বেগ, চিন্তা সংশয় এবং নিঃসঙ্গতার সংকট। হেরম্ব চরিত্রে এই সব অস্তিত্ববাদী সাহিত্যনির্দেশিত লক্ষণ সবিশেষ বর্তমান। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং মানবজীবনের তত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধানী হেরম্ব নানা মানুষের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। "সে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়।" বার বছর বয়সে সে ষোল বছরের মেয়ে মালতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সুপ্রিয়া তাকে ভালবাসলেও, সে সুপ্রিয়ার ভালবাসাকে ছেলেমানুষী মনে করে প্রত্যাখ্যান করে। পরে সুপ্রিয়ার সঙ্গে অশোকের বিয়ে হয়। তবু সে হেরম্বকে আগের মতোই ভালোবাসে। তার নিজের স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, তার শিশুকন্যা সম্পর্কেও সে উদাসীন। কুড়ি বছর পরে অনাথের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া মালতীর সঙ্গে তার দেখা হয়। মালতীর মেয়ে আনন্দের প্রতি

তার প্রেমাকর্ষণ দেখা দেয়। আনন্দের প্রেমে সে নতুন করে জীবন ফিরে পেতে চায়। কিন্তু পিতামাতার কলহজর্জর জীবন থেকে যে বিষ উঠেছে আনন্দ তা আকণ্ঠ পান করেছে। স্থায়ী প্রেমের শান্তিপূর্ণ জীবনে সে বিশ্বাস হারিয়েছে। কিন্তু ক্ষণিক প্রেমের আনন্দে সে মশগুল। এই প্রেমের স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে আগুনে আত্মাহুতি দেয় পরীনৃত্যের ছলে। সুপ্রিয়ার ঈর্ষা, অশোকের মানসিক উদ্‌ভ্রান্তি, অনাথ ও মালতীর বিষাক্ত জীবন এবং আনন্দের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাসহীন উৎকণ্ঠিত জীবনছন্দ-সবই হেরম্বকে চিন্তিত ব্যথিত বিহ্বল এবং নৈরাশ্যপীড়িত করেছে। আত্মপীড়ন ও আত্মহননের শ্বাসরোধকারী পরিমণ্ডলে এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত।

'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮) উপন্যাসে মানিক জীবনের স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত এবং বাস্তববোধবিমুখ প্রেমের বিকারগ্রস্ত রূপ বর্ণনা করেছেন। ফ্রয়েডীয় চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তিনি প্রেমের মূলে যে অন্ধ যৌনক্ষুধা তার তীব্রতা অনুসন্ধান করেছেন। অস্বাভাবিক কামনার প্রকাশ অকুণ্ঠ বলিষ্ঠতার নিদর্শন হয়নি, বরং তা উৎকট বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার সন্ধানী আলোয় জৈবজীবনের যৌনস্পৃহার চঞ্চলরূপকে বিকশিত করেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজকুমার প্রেমকে জানার আগে জানতে চেয়েছে প্রেমের ভিত্তি দেহকে। সে উচ্চশিক্ষিত, বুদ্ধিমান কিন্তু আবেগশূন্য রিণি, মালতী ও সরসী তিনজনই তাকে আন্তরিকভাবে কামনা করে। কিন্তু সে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রেমের রসস্বরূপ ও রহস্যসৌন্দর্য অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়েছে। দেহকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে দেহের নিয়ম ও বিধি সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, বিকৃতির সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে তার, কিন্তু সচল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে দেহ ও মনের সমন্বয়ে এবং দেহমনের অতিরিক্ত জীবনরসের আনন্দসঞ্চয়ে যে প্রেমের সৃষ্টি তা তার অপ্রাপণীয় থেকে গেছে। মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেমকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা দেখা দিয়েছে এ উপন্যাসে।

'তেইশ বছর আগেপরে' (১৯৫৩) উপন্যাসও মনোবিশ্লেষণের পথ ধরে এগিয়েছে। প্রথমে এতে আছে রোমান্টিক প্রেমের কথা, পরে সামাজিক জীবনের পুনর্বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ট্রাজিক প্রেমে ব্যর্থ জীবন থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থা।

'পরাধীন প্রেম' (১৯৫৫) উপন্যাসে প্রেমের রোমান্টিক পারিপার্শ্বিকের মূল্যহীনতা প্রমাণিত হয়েছে। বিনয়-বকুল, অনিল-কান্তা, অজিত-উমা ও সমীর-সুমতি—এদের যুগল জীবনের প্রেম সংস্কার ও পরিবেশ ইত্যাদিকে উপেক্ষা করতে না পারায় সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত। অর্থনৈতিক গণ্ডিতে ঘিরে রাখা জীবনধারা এবং তার মধ্যেই বিকশিত প্রেমের পরাধীনতা এখানে বর্ণিত।

রোমান্টিক রহস্যময়তা, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, ট্রাজিক প্রেমে ব্যর্থজীবন থেকে সামাজিক শ্রেয়োবোধে ফিরে আসা এবং অর্থনৈতিক চক্রাবর্তনে বাঁধা প্রণয়ের রীতি—প্রধানতঃ এইসব ধারা মানিকের উপন্যাসে প্রেমের পরিমণ্ডলে বিস্তৃত। পরিশেষে, 'শুভাশুভ' (১৯৫৪) উপন্যাসে শ্রেণীসংগ্রামের পরিবেশে প্রেমের বাস্তবজীবনভিত্তিক বহুজনের সুখসন্ধানপ্রয়াসী জীবনানুশীলনের পারিপার্শ্বিকে তাঁর প্রেমের স্বরূপ নির্ণয়প্রচেষ্টা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'হরফ' (১৯৫৪) উপন্যাসও স্মরণীয়।

রাজনৈতিক সংঘাত ও স্বাধীনতা আন্দোলন

রাজনৈতিক সমস্যা ও জনজীবন তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে মানিক বিশেষভাবে ভেবেছেন। মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি ঘটনাপ্রবাহের ক্রমবিন্যাস ও পরিণতির গতিপথ বিশ্লেষণ করেছেন। 'জীয়ন্ত' (১৯৫০) উপন্যাসে ব্যর্থ একুশের অসহযোগ আন্দোলনের উত্তরকালের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। নেতা কালীনাথ এই নব আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে, "ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের একটা চাকরকে মারলে, গভর্নমেন্টটা তো মরল না! .... এটা বিপ্লবের আহ্বান, প্রস্তুতি, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা লাভের আয়োজন চলছে...।" পাকা বা প্রকাশ রায় এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ নানা দুর্বলতা থাকলেও এবং পরে কালীনাথের দল থেকে তার নাম কাটা গেলেও সে কালীনাথের দলের প্রতি সমর্থক জানিয়েছে। তার ব্যক্তিগত জীবনে যে যৌনকামনাজনিত দুর্বলতা ও বিকার—তাতে ডি. এইচ. লরেন্সের 'Sons and Lovers' উপন্যাসের একটি বালক চরিত্রের প্রভাব আছে। ঐ উপন্যাসে যেমন কয়লাখনির শ্রমিকদের বেদনার্ত জীবনকথা আছে তারই সাদৃশ্য দেখতে পাই 'জীয়ন্ত' উপন্যাসে চামড়ার কারখানায় মুচিদের জীবনপ্রতিবেশে। এই মুচিদের জীবনে পাকা এক অপূর্ব মুক্তির স্বাদ পায়। অকৃত্রিম জীবন মানিককে চিরকাল আকর্ষণ করেছে, এখানে পাকার বিবৃতিতে তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই উপন্যাসে মানিক দেখিয়েছেন দেশের মানুষকে স্বাধীনতার লড়াই লড়তে হবে কেবল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী জমিদার এবং দুর্নীতিগ্রস্ত অত্যাচারী পুলিশের বিরুদ্ধেও। এই সমাজচেতনাপূর্ণ, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ধর্মধারাবিন্যস্ত ও ঘটনাপ্রবাহবিস্তৃত উপন্যাসে মানিক সংগ্রামী গণমানসের বিশ্লেষণে দক্ষতা দেখিয়েছেন।

'স্বাধীনতার স্বাদ' (১৯৫১) উপন্যাসে মানিক তীব্রভাবে রাজনীতি-সচেতন। বিচিত্র ঘটনার বিন্যাসে বহুবিচিত্র জটিল সংঘাতের বর্ণনায় এবং বহুবিধ চরিত্রের রাজনীতি অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এ উপন্যাস যুগসন্ধির বাস্তবচিত্র।স্বাধীনতা লাভের আগে কলকাতাসহ বাংলার সর্বত্র এবং বিহারে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা দেয়। ব্রিটিশ স্বাধীনতা দেওয়ার আগে শেষ চাল চেলে দেশের সর্বনাশ করেছে। কংগ্রেস ও লীগ নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে তৎপর আর ব্রিটিশ সেই ফাঁকে নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। এ সময় বিশেষভাবে কলকাতার হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক জীবনে কিরকম আঘাত নেমে এসেছে মানিক তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কলকাতায় চলেছে প্রচণ্ড দাঙ্গা। ভদ্র পাড়ায় ও বস্তিতে—সর্বত্র আতঙ্ক শোকের ছায়া ও ভয়াবহ সংকট। মানুষের বিবেক রাহুগ্রস্ত। সর্বত্র জাল-জুয়াচুরি। চোরাকারবারীদের আধিপত্য। গুণ্ডাদের রাজত্ব। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র গোকুল বলেছে, "উপরতলার একদল লোক নামে দেশ-শাসনের এক ধরনের কিছুটা ক্ষমতা পাবার লোভে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে ভেজাল স্বাধীনতা কিনছেন।" এই স্বাধীনতার দিনেই মণি ও সুশীলের জীবনে নেমে এসেছে বিপর্যয়। সুশীলের 'চুরি-চামারির পয়সা'র প্রতি লোভই তার কারণ। কবি মনসুর বেপাড়ার দাঙ্গাবাজদের হাতে পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়। ওপরতলার গুণ্ডাদের জীবনে মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত—একপাড়ার গুণ্ডা-নবাব ইয়াসীনের সঙ্গে অপরপাড়ার গুণ্ডারাজ সুবোধ সিংহের খানাপিনা চলে চৌরঙ্গীর বড় হোটেলে। চতুর্দিকে অনিয়ম অশান্তি আর অত্যাচার।

উপন্যাসের নামেই মানিকের চাপা ঠোঁটের বাঁকা হাসি ধরা পড়ে—এই কি তবে 'স্বাধীনতার স্বাদ'?

'সার্বজনীন' (১৯৫২) উপন্যাসের 'লেখকের কথা'য় মানিক বলেছেন—"এই কাহিনীর মূলভিত্তি হল সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্কীর্ণ সীমা ভেঙে গিয়ে সার্বজনীন ব্যাপকতার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার যে নতুন গতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমাজের কোন শ্রেণীতে ভাঙ্গন ধরার অর্থ অনেকে মনে করেন মানুষগুলিরও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে শেষ হয়ে যাওয়া—আসলে মানুষগুলির জীবনও নতুন দিকে গতি পায়, নতুন রূপ গ্রহণ করতে থাকে।" যত রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ই আসুক না কেন—মানুষের জীবনীশক্তি অবিনশ্বর—মানিক এই জীবনবোধে উদ্দীপ্ত। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের জীবনসমস্যা এবং তার সুষ্ঠু সমাধান নিয়ে লেখা এই উপন্যাসে মানিক এক বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন,—ঐ সমস্যা নিয়ে লেখা অন্যান্য লেখকের লেখায় এ ধরনের আত্মপ্রত্যয়শীল জীবনচেতনা বিরল। সমাজের তথাকথিত নীচুতলার মানুষ, শ্রমনির্ভর মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতার পথ পরিত্যাগ করে সার্বজনীনতার পথে অগ্রসর হলে সমস্যার সমাধান হবে। বাস্তবঘনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টি এবং মার্ক্সবাদী জীবনাদর্শে আস্থাশীল চিত্তবৃত্তি নিয়ে মানিক বলতে পেরেছেন—'সমাজজীবনে ভাঙ্গন ধরার সঙ্গে গড়ন চলাও থাকবেই।" উপন্যাস থেকে গৃহীত একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে—"সাধন আর সবিতা ভাটিয়ালি সুরে গান গাইছে—দেশের দুঃখ-দুর্দশার গান—সবাই মিলে তার প্রতিকার করার গান।"

শ্রেণীসংগ্রাম

'সহরতলী' (প্রথম পর্ব—১৯৪০, দ্বিতীয় পর্ব—১৯৪১) উপন্যাস থেকে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীচেতনার উদ্বোধন ও উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে এই চেতনা পরিণত হয়েছে শ্রেণীসংগ্রামে। এই উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, একদিকে ধনী ব্যবসায়ী মিল মালিক সত্যপ্রিয় আর অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর হিতৈষী যশোদা আর তার স্নেহচ্ছায়াপুষ্ট শ্রমিকের দল। প্রকৃতপক্ষে এই যশোদাই শ্রমিকশ্রেণীর নেত্রীরূপে দীর্ঘকাল স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। কিভাবে কূটকৌশলে সত্যপ্রিয় যশোদাকে শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল এবং কিভাবে তাকে তার কুঁড়ে ঘর থেকে উচ্ছেদ করে দিল তারই কাহিনী বিবৃত হয়েছে এখানে। ক্রমে শ্রমিকনেতা বিধুবাবুর শ্রমিকসমিতির সভায় বক্তৃতা থেকে যশোদা বুঝতে পারে ধনিক সম্প্রদায়ের চক্রান্ত থেকে শ্রমিক সম্প্রদায়ের মুক্তি আসবে বৈজ্ঞানিক চেতনার সাহায্যে শ্রমিক সমস্যা উপলব্ধি ও যথোপযুক্ত সংগঠন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। শ্রমিক সমস্যাকে ভাবাবেগবর্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে সাহিত্যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় মানিকের এই প্রথম পদক্ষেপ।

'দর্পণ' (১৯৪৫) উপন্যাস শ্রেণীবিভক্ত সমাজের দর্পণ। এই উপন্যাসে মানিক নতুন পথের দিশারী। ১৯৪৪-এ মানিক কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। পরিণত ব্যক্তিত্ব ও

মার্ক্সীয় জীবনদর্শনে প্রাজ্ঞ মানিকের এই নতুন সৃষ্টিতে এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্ট হল। এই উপন্যাস একদিকে কৃষ্ণেন্দু, রম্ভা ও বীরেশ্বর, অন্যদিকে লোকনাথ, উমাপদ, হেরম্ব ও হীরেন ইত্যাদির দর্পণ। অত্যাচারী হেরম্ব প্রমুখ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত ঝুমুরিয়া গ্রামবাসীর বিক্ষোভ ও সংঘাতের দর্পণ। পুনশ্চ, এ দর্পণ ঘুষখোর দারোগার, বস্তীজীবনের ও অশিক্ষিত অমার্জিত মানুষের জীবনধারার। এ উপন্যাস শোষিত ও নিগৃহীত মানুষের জীবন মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণের বাস্তব ও পরিচ্ছন্ন দর্পণ।

'ইতিকথার পরের কথা' (১৩৫৯) উপন্যাসে বৈজ্ঞানিক শুভময় জমিদার জগদীশের ছেলে। যুদ্ধের পর বিলেত থেকে সে নিজেদের গ্রাম বারতলায় ফিরে দেখেছে গ্রামের জনজীবনে বিপুল পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তন এসেছে কৃষকদের মধ্যে। তারা জোতদারের ধান লুঠ করার জন্য একত্র হয়েছে। তাদের নেত্রী কৃষককন্যা লক্ষ্মী, কৈলাশ তার সহযোগী। যদিও শুভময় বুঝতে পেরেছে এই সমস্ত মেহনতী মানুষের মুক্তি ও আর্থিক উন্নতি ছাড়া দেশের অগ্রগতি ও স্বাধীনতা নিরর্থক, তবু তার বাবা জগদীশের অত্যাচারী ও শোষকের মনোভাবের জন্য সে কৃষক সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করতে পারে নি। একদিকে জগদীশ ও অন্যদিকে লক্ষ্মী ও তার দল, মধ্যে শুভময়। শুভময় গ্রামের মানুষদের জীবনের শরিক হয়ে চায়, গড়তে চায় নতুন শিল্প, কিন্তু সে তা নানা বাধার জন্য পারে নি। কালের পরিবর্তন হচ্ছে—কৃষককন্যা লক্ষ্মীর সংগ্রামী চেতনা তাকে তা উপলব্ধি করায়।

'হলুদ নদী সবুজ বন' (১৯৫৬) উপন্যাসে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিচিত্র চিত্র আছে, সংঘাতও স্পষ্ট, তবু শিথিল গ্রন্থনার জন্য উপন্যাসরূপবন্ধ সুসংগতিহীন। ঈশ্বর শ্রমিকদের একজন হয়েও যেন বিচ্ছিন্ন ও একক। বন্যাতাড়িত হয়ে সে যেন ভাগ্যবিপর্যয়ে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। লোকশিল্পী কথকতায় দক্ষ লখার মা চরিত্র জীবন্ত।

অসমাপ্ত উপন্যাস 'মাটি ঘেঁষা মানুষ' (১৯৫৭) -এ তিনি 'চাষীর মেয়ে'র জীবন-সংগ্রামকে 'কুলির বৌ'য়ের জীবন সংগ্রামে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রেবতী বুঝতে শিখেছে চাষীর লড়াইয়ে মেয়েদের অংশ নিতে হয় কিভাবে ; এবারে সে বুঝতে চলেছে শ্রমিকদের শ্রেণীসংগ্রামে মেয়েরা অংশ নেবে কেমনভাবে। ১৭.১.১৯৪৮ তারিখে মানিক যে দিনলিপি লেখেন, তাতে লেনিনের একটি উক্তি উদ্ধৃত আছে 'Carefully study the practical experience of the struggle of the masses." বলা বাহুল্য, এ ধরনের উক্তি মানিকের প্রেরণাস্বরূপ ছিল।

আদিম প্রবৃত্তির লীলা : মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ

জানোয়ারকে জানোয়ার হিসেবে আঁকবার ক্ষমতা ছিল মানিকের স্বভাবসিদ্ধ। ঐ জানোয়ারের চরিত্রে একটুও মনুষ্যত্বের খাদ মেশানো থাকত না। বাস্তব বলিষ্ঠ চরিত্রের পশুকে যেমন দেখতে হয় তেমনভাবে তাকে দেখতে পাওয়া, তার জীবনের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতিবোধ অথচ সমগ্র চিত্রাঙ্কনে শিল্পিজনোচিত নিরাসক্ত দূরত্ব—এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করেই মানিক



সৃষ্টি করেছেন 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু ও পাঁচীকে। সভ্যতার চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতার নীচে বর্বর যুগের অরণ্য-অন্ধকারের হিংসা লোভ কামনা ও নিষ্ঠুরতা এখনও কেমন বাসা বেঁধে আছে মানুষ নামক প্রাণীর মধ্যে তার হঠাৎ পরিচয় পেয়ে চমকে উঠতে হয়। সব শিল্পী শয়তানের মনকে ধরতে পারেন না, কিন্তু মানিক সেই বিরল সাহিত্যিকদের একজন যিনি শয়তানের মনের মধ্যে গিয়ে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তার গোপন কথা জেনে আসতে পারেন। তাঁর শিল্পিমন ছিল বক্রজটিল কুটিল অন্তর্ভেদী ও মর্মবিদারক। এই মনই মনস্তত্ত্বের সুগভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছে মানুষের কামনা বাসনার আলো আঁধারিতে ঘেরা মনোগহনের তামসলোকের গতিপ্রকৃতিকে প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভকে। 'চোর' গল্পে চোর মধুর পাপকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে লালসায় অন্ধ পান্নাবাবুর মধুর স্ত্রী কাদুকে অপহরণ। মানিক প্রশ্ন করেছেন "জগতে চোর নয় কে?" বিকৃত মনের গল্প হিসেবে 'শৈলজশিলা' উল্লেখযোগ্য। মানব মনের সর্বনাশা বিষাক্ত কুটিলতা এবং স্বার্থপর স্বভাবের বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চমৎকার টানাপোড়েনে গাঁথা 'সরীসৃপ' গল্প। বনমালীকে কেন্দ্র করে দুই বোন চারু ও পরীর পারস্পরিক নিষ্ঠুর ঈর্ষা, তাকে আয়ত্ত করবার জন্যে দুজনের কদর্য ঘৃণ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বনমালীর শয়তানী, স্বার্থপরতা ও মতলববাজী—সব ঐকতান রচনা করেছে নরকের একাঙ্ক অভিনয়ে। 'সিঁড়ি' গল্পে মানবের স্বার্থপরতা ও শয়তানী আর এক রূপে প্রকাশিত,—লেখক এখানে আরও নির্বিকার। 'মহাকালের জটার জট' গল্পে যাবতীয় ফ্রয়েডীয় কমপ্লেক্স ইঙ্গিতপূর্ণ চমৎকার ঘটনাজালে বিন্যস্ত। যে মনস্তত্ত্বসমীক্ষার সূচনা 'সর্পিল' গল্পে তার ক্রমপরিণতির চিহ্ন 'মহাকালের জটার জটে'।

প্রেম

প্রেমের গল্প দিয়েই মানিকের সাহিত্য রচনা শুরু। তাঁর প্রথম দিকের রচনা 'অতসী মামী', 'নেকী', 'বৃহত্তর ও মহত্তর' ও 'শিপ্রার অপমৃত্যু' প্রভৃতি গল্পে নর-নারীর প্রেমের বর্ণনায় পাশ্চাত্ত্য লেখকগণ এবং শরৎচন্দ্রের প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গল্প ও কবিতার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। অতসী মামী ও যতীন মামার কাহিনী রোমান্টিক ও ট্রাজিক। 'নেকী' বিষাদ ও প্রেম অবলম্বনে সেন্টিমেন্টাল গল্প। 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পে ইবসেনের 'দি ডল্স্ হাউস' ও রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্প ও 'মুক্তি' কবিতার প্রভাব আছে। মমতাদি স্বামী পুত্র ত্যাগ করে নারী সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। এগারো বছর ধরে স্বামীর অবিচার অত্যাচার সহ্য করে সে সংসার ছেড়েছে, কিন্তু পরিজনদের প্রতি মমতা ত্যাগ করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টি রহস্যই হয়ে থাকে এবং 'আজ ঠিক করতে পারি না তার স্বামিপ্রেম ছিল কি ছিল না।' নারীমনের দ্বৈত রূপও লক্ষণীয় ঃ যে একদা "স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী .... ছিল" সে আবার "স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।" এই গল্পেই চমৎকার একটি উক্তি পাই—'স্নেহ, প্রেম, মমতা মানুষের নাগপাশ'। মানিকের উত্তরকালের প্রেমের প্রসঙ্গপূর্ণ গল্পে এই নাগপাশের জটিলতা—মনস্তত্ত্বর গহনপথে যার পরিক্রমা।

প্রতিকারহীন দুঃখ ও নৈরাশ্য

এক সময়ে মানিকের গল্পে সীমাহীন দুঃখ নিয়ন্ত্রণহীন নিয়তির অভিশাপের মতো ছায়া ফেলে গেছে। এটি তাঁর গল্পের একটি প্রধান সুর। তিনি একদিন 'মানুষের আসল কবিতা' লিখতে চেয়েছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন, 'দিনে দিনে বাড়ে ক্ষোভ, বাড়ে জ্বালা, বাড়ে ব্যাকুলতা।' তাঁর মনে হয়েছে তিনি একা যুদ্ধ করে চলেছেন 'বহুরূপী অত্যাচারী জগতের সাথে।' প্রকৃতির অত্যাচাব, মানুষের সীমাহীন লোভ ও অসহায় দুর্বলের প্রতি অবজ্ঞা, তাদের নিপীড়ন বঞ্চনা ও প্রতারণা আত্মহত্যার দিকে প্ররোচিত করেছে দরিদ্র মানুষকে। এক তীব্র দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে তাঁর "আত্মহত্যার অধিকার' গল্প। এই গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘটনা পর্যায়ের অনিবার্যতা। অসাধারণ গভীর সহানুভূতি এবং মর্মান্তিক দুঃখের দাবদাহের শেযে পরিকীর্ণ বিষাদ এ গল্পের মূল আবহ রচনা করেছে। নির্জীব কুকুরের বেঁচে থাকার ঘৃণ্য ও অসহায় প্রচেষ্টার মধ্যে গল্পের নায়ক নীলমণির আত্মপ্রতিফলন গল্পের মর্মকথাকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়েছে ঃ "ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথি ঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তার ঘৃণা হয়, গা জ্বলা করে।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলমণি বোঝে জীবনে দুঃখের কোন শেষ নেই। 'সমুদ্রের স্বাদ' ও 'আততায়ী' প্রভৃতি গল্পে মানিকের এই দুঃখচেতনার বিচিত্র পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মধ্যবিত্ত ঃ অবক্ষয় ও বিনষ্টি

'সমুদ্রের স্বাদ' গল্পগ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় মানিক লিখেছিলেন ঃ "প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। .... জানা ছিল না যে স্বাভাবিক নিয়মেই এ সমাজের মরণ আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী এবং তাতেই মঙ্গল—সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙ্গে বিরাট জীবন্ত সমাজে আত্মবিলোপ ঘটার মধ্যেই আগামী দিনের অফুরন্ত সম্ভাবনা।" ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানে এবং শ্রেণীসংগ্রামের অমোঘ নিয়মে ইতিহাসের গতিপথ দিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজ যে অবক্ষয় ও বিনষ্টির দিকে অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে—একথা গভীবভাবে উপলব্ধি এবং উপন্যাসে ও গল্পে তার ব্যাপক প্রকাশ মানিক-সাহিত্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বলা যেতে পারে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা সাহিত্যে ধ্বংসশীল মধ্যবিত্ত জীবন এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামের চিত্রাঙ্কণে তিনি সার্থকতম শিল্পী। তাঁর 'সমুদ্রের স্বাদ' ও দুর্ভিক্ষ এবং মন্বন্তরের (১৯৪৩ ॥ ১৩৫০) সমকালে লেখা 'আজকাল পরশুর গল্প' নামে দুটি গল্পগ্রন্থে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের অর্থনৈতিক নৈতিক এবং সামাজিক দুর্দশা ও ক্রমবর্ধমান দুঃখজনক পরিণামের চিত্র আছে। 'সমুদ্রের স্বাদ' -এর 'ভিক্ষুক' 'বিবেক' এবং 'মালী' প্রভৃতি গল্প উল্লেখ্য। 'আজকাল পরশুর গল্প'-এর 'আজকাল পরশুর গল্প', 'নমুনা', 'রাঘব মালাকার' ও 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' ইত্যাদি গল্পে মানিকের গভীর সমাজচেতনার পরিচয় বিধৃত। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, নারী ব্যবসায় এবং তার পৈশাচিক ভয়াবহতা আর মধ্যবিত্তের অর্থলোভে পারিবারিক নৈতিক



জীবনের চরম বিপর্যয়—সব মিলে সামাজিক বিপর্যয় এ সমস্ত গল্পে রূপায়িত হয়েছে।

যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার পরিণাম ঃ বিকৃতি পাপ গ্লানি অবক্ষয়

মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পর গ্রামের গরীব কৃষকরা সর্বস্বান্ত হল। বহু লোকের মৃত্যু হল। যুদ্ধের সময়ে শহরে বোমা পড়ার ফলে বহু লোক গ্রামে পালিয়ে গেল। চারিদিকে নানা আতঙ্ক। ১৯৪৬-এর দাঙ্গাও শহর-জীবনকে করল দারুণভাবে বিপর্যস্ত। 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬), 'খতিয়ান' (১৯৪৭) এবং 'ছোট বড়' (১৯৪৮) গল্পগ্রন্থগুলিতে এই সময়ের বাঙালির জীবনসমস্যার রূপ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এ সময়ের নানা সংকটজনক পরিস্থিতি গল্পগুলিতে লক্ষিত হয়, তবু তাদের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তদের নৈতিক অবনতি এবং দীনদরিদ্র মানুষের সংগ্রামী চেতনা ও সর্বনাশের মধ্যে দাঁড়িয়েও দৃঢ় মনোভাব নিয়ে সত্যনিষ্ঠা এবং সুস্থ ঐতিহ্যানুসরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'পরিস্থিতি'র 'প্যানিক' ও 'মাসি পিসী' গল্পে দুর্নীতির চিত্র স্পষ্ট। দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষেব মানবিক মূল্যবোধ বিবেক এবং শ্রেণী সংহতি-চেতনার পরিচয় পাই 'পরিস্থিতি'র 'শিল্পী' ও 'কংক্রিট' গল্পে ; 'খতিয়ানে'র 'একান্নবর্তী', 'চক্রান্ত' ও 'চালক' গল্পে। দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা 'খতিয়ান' গল্পে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে দিয়ে সাহেব সমাজের উল্লাস, কারখানার মালিকদের শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সুযোগ লাভ ও পুলিশ দিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করানোর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরা তাদের ভুল বোঝে আর তারা স্বীকার করে তারা চক্রান্তের শিকার হলেও আসলে তারা 'গরীবের জাত।' 'ছোট বড়' গল্পগ্রন্থের 'ভালবাসা' 'ছেলে-মানুষি' 'স্থানে ও স্তানে' ও 'ব্রিজ' গল্পে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার নিষ্ফলতা বর্ণিত হয়েছে। 'ছোট বড়' গল্পসংগ্রহের অন্যান্য গল্পের মধ্য দিয়ে মানিক শ্রেণীসংগ্রামের দিকে কৃষক সম্প্রদায়ের অগ্রগতির পরিচয় অল্পে অল্পে তুলে ধরেছেন। 'পেরানটা' 'ধান' ও 'দীঘি' গল্পে এ পরিচয় আছে। 'হারানের নাতজামাই' এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ও অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। 'গায়েন' গল্পে পাওয়া যায় নবযুগের সাহিত্যচেতনা।

শ্রেণীসংগ্রাম ও বাঁচার লড়াই

ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'প্রোলেটারীয় সাহিত্যের স্বরূপ,' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "ইহার (প্রোলেটারীয় রাষ্ট্রের সাহিত্যের) ভিত্তি হইতেছে বাস্তবিকতা (Realism)। ইহাতে নিরাশা, অতীন্দ্রিয়বাদ, হাহুতাশ নাই, আছে শ্রমের কথা, আছে সংগঠনের কথা, আছে আশার কথা, আছে জীবনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির আস্বাদনের কথা, আছে আনন্দের কথা।" ঐ প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেছিলেন, "যে সাহিত্য গণকে তাহার যথার্থ মূল্য প্রদান করিবে, সেই অনাগত সাহিত্যের অপেক্ষায় আমরা বসিয়া আছি। কিন্তু, ইতিহাসের দ্বন্দ্বজনিত গতি সেই অনাগতকে একদিন লোকচক্ষে সমূর্ত করিবে।" তাঁর এই প্রত্যাশা ব্যর্থ হয় নি। এইসব কথা তিনি বলেছিলেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ ১৯৪৫-এর ৩-৮ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের নাম হয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ'। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এর যুগ্ম-সম্পাদক। ১৯৪৯-এর এপ্রিলে সংঘের পরবর্তী সম্মেলনে তিনি হন সভাপতি। এ সময়ে

তিনি যে বিবৃতি দেন পরে তার শিরোনাম হয়েছিল 'প্রগতি সাহিত্য'। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন—'বর্তমান যুগে শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের বিপ্লবী চেতনা যখন যতদূর অগ্রসর হয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধারার ততখানি শক্তিশালী হবাব সম্ভাবনাও সেই সঙ্গে সৃষ্টি হয়ে যায়। বাংলার শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নূতন সংস্কৃতির দুর্বার জোয়ার আনার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়ে আছে বহুমুখী বিক্ষিপ্ত প্রগতিশীল ধারাগুলির মধ্যে।" মনস্বী লেখক ডঃ দত্ত তাঁর লেখায় যে সাহিত্যলক্ষণগুলির উল্লেখ করেছেন মানিকের শেষ পর্যায়ের গল্পসমূহে তার স্বাক্ষর রয়েছে। মানিকের প্রগতি সাহিত্য চিন্তার মধ্যে ঐ সময়ের নতুন সংস্কৃতি চিন্তা যে শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের জীবনের দুরন্ত গতিবেগ অনুভব ও প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিল তার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। তাঁর 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮), 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী' (১৯৪৯), 'ফেরিওয়ালা' (১৯৫৩), ও 'লাজুকলতা' (১৯৫৪) গল্প সংগ্রহগুলিতে এই চিন্তার প্রতিফলন সুবিস্তৃত হয়েছে। এই গল্পগুলিতে স্বাধীনতা-উত্তর সমাজজীবনে নানা ব্যর্থতা গ্লানি জ্বালা, অভাব অনটন ও তজ্জনিত তিক্ততা, চোরাকারবারের ফলে দারিদ্র্য ও আর্থিক অবস্থার বিপর্যয়, জলো দেশপ্রেম ও সস্তা সিনেমার আধিক্যের কথা আছে (মাটির মাশুল, পারিবারিক, আপদ, পথান্তর)। মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিভাবে অর্থনৈতিক সংকটের দিনে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতার ঐক্য উপলব্ধি করতে শিখেছে তার ইতিহাস আছে (সখী, ফেরিওয়ালা, মরব না সস্তায়)। উদ্বাস্তু নরনারীর জীবনযন্ত্রণা নিয়ে হাহুতাশ নেই, বরং সার্বজনীন ঐক্য ও পারস্পরিক সহানুভূতি তাদের জীবনে আগামী দিনের বাঁচার লড়াইয়ে শক্তি ও প্রেরণা দেবে—এ-রকম আশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে। এতে লেখকের বলিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির পরিচয় বিবৃত হয়েছে ('সার্বজনীন' উপন্যাস থেকে গৃহীত বিভিন্ন গল্প)। নতুন যুগের বাস্তবতা খুঁজে পেয়েছেন মানিক সংগ্রামী শ্রমিকদের "সমাজভাঙা বোমায়" পরিণত হতে দেখে যে দুলে বাগ্‌দী অবদমন ও শোষণের সাহায্যকারী সে নিহত হয়েছে আর মুক্তির আস্বাদ পেয়েছে বাগ্‌দীপাড়ার জনসমাজ (বাগ্‌দীপাড়া দিয়ে)। 'মেজাজ' গল্পে ভাগচাষী ভৈরব তার অনমনীয় মনোভাব ও প্রবল প্রতিরোধশক্তি প্রয়োগ করেছে শোষণ চোরাইচালান ও গুণ্ডামির অপশক্তির বিরুদ্ধে। তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামকে ভেঙে দিতে অত্যাচার চলল, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হল। এই পরিস্থিতিকে স্মরণ রেখেই মানিক তাঁর বিখ্যাত গল্প 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' লিখেছেন। সংস্কৃতি কেবল মুষ্টিমেয় সুবেশধারী ভদ্রলোকের অধিকারে এমন কথা ভুলবার দিন এসেছে। 'উপদলীয়' গল্পে প্রশান্ত উপলব্ধি করেছে শ্রমিকদের জীবনকে বাদ দিয়ে বা অস্বীকার করে কোন সুস্থ সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার সম্ভব নয়। আলোচ্য পর্যায়ের গল্পে মানিক শ্রেণীসংগ্রামে চলমান অজেয় প্রবলপ্রাণ শ্রমিক ও কৃষক সমাজের পদধ্বনি শুনেছেন।

অন্যান্য রচনা

মানিক প্রধানতঃ উপন্যাস ও গল্প লেখক হিসেবেই বিখ্যাত। যথার্থভাবে, উপন্যাস ও গল্পই তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের মাধ্যম হয়েছে। তাঁর কোন কোন কবিতা ('প্রথম কবিতার কাহিনী', 'সুকান্ত ভট্টাচার্য', 'শব্দ ও মদ বেচা শুঁড়িগুলো') বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তাঁর



সাহিত্যিক ভাবাদর্শের বাণী বহন করেছে। অবশ্য তিনি খুব অল্পসংখ্যর কবিতা লিখেছেন। কিশোর সাহিত্য রচনায়ও তাঁর দক্ষতা ছিল। 'মাটির কাছের কিশোর কবি' তাঁর উল্লেখযোগ্য কিশোর-উপন্যাস। মানিকের ব্যক্তিত্ব সাহিত্যিকসত্তা এবং সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে জানতে অবশ্য প্রয়োজন তাঁর 'লেখকের কথা' প্রবন্ধসংগ্রহ এবং 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' (ডায়েরি ও চিঠিপত্রের সংগ্রহ)।

উত্তরকালের সাহিত্যে তাঁর প্রভাব

উত্তরকালে, মানিকের পরবর্তীযুগে, বহু সাহিত্যিক মানিকের সাহিত্য থেকে প্রবল প্রেরণা ও প্রভূত সাহিত্যিক উপাদান গ্রহণ করে তাঁদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানে একটি সত্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। মানিক সাহিত্যে রাজনীতি এনেছেন, রাজনৈতিক প্রচারও তাঁর সাহিত্যে কম নেই; কিন্তু সাহিত্যের শিল্পধর্মকে তিনি কোথাও ক্ষুন্ন করতে চাননি। যাঁরা কমিউনিজ্‌মের বিরুদ্ধে তাঁরাও তাঁর সাহিত্যকে যদি শিল্পাদর্শের নিরিখে বিচার করেন তবে তাঁরা হতাশ হবেন না। এছাড়া গল্পে ও উপন্যাসে তিনি চরিত্রসৃষ্টিতে যে দক্ষতা দেখিয়েছেন তাও বিশেষভাবে বিচার্য। কাহিনীতে তিনি চরিত্রের কেবল 'টাইপ' বা 'বর্গরূপ'ই দেখান নি, ব্যক্তিরূপও দেখিয়েছেন সমান গুরুত্বের সঙ্গে। জমিদার পুঁজিপতি ও মহাজনকে তিনি চতুর লোভী ও খল করে দেখিয়েছেন, কিন্তু তারা প্রত্যেকে নিজস্ব স্বতন্ত্র ধরনে চতুর বা খল বা লোভী অথবা হয়ত শয়তান, কিন্তু সবাই একই ধরনের ব্যক্তি নয়। তারা একই ধনিক সম্প্রদায়েরলোক হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পৃথক সত্তা। মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি ঐ একই শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সর্বহারার কিছু হারাবার নেই' এইরকম বহুপ্রচলিত কথা স্মরণে রেখে সাহিত্যিক হয়ত কিছু চরিত্র সৃষ্টি করলেন—যারা সবাই সর্বহারা এবং সবাই একরকমভাবে হাত পা নাড়ে কথা বলে ও চলাফেরা করে। কিন্তু এ যথার্থ সৃষ্টি নয়। সাহিত্যের চরিত্র শ্রেণীসংগ্রামের কাজে ব্যবহৃত বুলেটিন নয়। প্রত্যেক চরিত্রই তার নিজের সম্বন্ধে তার বন্ধু পরিবার স্ত্রী ও সন্তান সম্পর্কে হয়ত নিজস্ব ধরনে পৃথক পৃথক রকমে ভাবে ও আচরণ করে। এই স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চিন্তা ও আচরণই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের শিল্পরূপসৃষ্টির তুলিকলমের নানা বর্ণ। এই তুলিকলমের সার্থক প্রয়োগে চাই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, জীবনকে দেখা ও জানার জন্য অতন্দ্র সাধনা। মানিক এই সাধনায় সিদ্ধ এবং উত্তরকালের কথাসাহিত্যিকগণের অমূল্য উৎস।

নিম্ন মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকটের তীব্র চাপ এবং সামাজিক অবক্ষয় যাঁর লেখায় বিশেষ রূপ পেয়েছে সেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী('বারো ঘর এক উঠোন'), কলকাতার গলির বদ্ধ আলোবাতাসহীন পরিবেশে নানা অসুস্থ ও অস্বাভাবিক ব্যবহারে অভ্যস্ত নরনারীর জীবনযাপনের কাহিনীর লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ ('কিনু গোয়ালার গলি'), মধ্যবিত্তের জীবনসমস্যা এবং আধুনিক নারীর যৌন মানসিকতার বিশ্লেষণে যিনি নতুনত্ব দেখিয়েছেন সেই নরেন্দ্রনাথ মিত্র ('দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন') উপন্যাসরচনার একটি পর্বে মানিক-সাহিত্যের অন্তঃপ্রেরণাকে গ্রহণ করেছেন। জীবনের নির্মোহ নির্মম ও কঠিন অভিজ্ঞতায় মানিকের সাহিত্য সমৃদ্ধ— এই অভিজ্ঞতা

কঠোরতার অন্তরালে তীব্র আবেগপ্রবাহে সমরেশ বসুর গল্পে ও উপন্যাসে নবতর আঙ্গিকে রূপয়িত (আদাব, প্রতিরোধ, পসারিণী, আলোর বৃত্তে ও পাড়ি)। সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' জেলেদের বাস্তবঘনিষ্ঠ জীবন-কাহিনী এবং 'পদ্মানদীর মাঝির' জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে পূর্বোক্ত লেখকের উপন্যাসবিধৃত কোন কোন অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য আছে। শ্রমিক আন্দোলন, বিক্ষুব্ধ শ্রমিকের জীবনযাত্রার দ্বন্দ্বসংঘাত ও ভাগ্যবিপর্যয় যাঁদের উপন্যাসের প্রধান বিষয় সেই গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (ইস্পাতের স্বাক্ষর') ও শক্তিপদ রাজগুরু ('কেউ ফেরে নাই') মানিকের সার্থক উত্তরসূরী।

রাজনৈতির উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে একজন প্রখ্যাত লেখক বলছেন, "মানুষের মধ্য দিয়ে এই রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ করা—কিন্তু তাকে প্রত্যক্ষ করা জীবনের গতি-সাক্ষ্য হিসাবে,—এই হল রাজনৈতিক উপন্যাসের দুশ্চর ধর্ম।" ('বাংলা সাহিত্য ও মানবস্বীকৃতি'—গোপাল হালদার।) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ে যার সূচনা, স্বতন্ত্রধারায় হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দর্পণ' উপন্যাস থেকে তার পরিণতির রূপ লক্ষ্য করা যায়; সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে তারাশঙ্কর ও মানিক প্রবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গিই অনেকাংশে অনুবর্তিত হয়েছে। জীবনের গতি-সাক্ষ্য হিসেবে রাজনৈতিক ক্রিয়া ও পরিণামকে মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা—এই শিল্পকৌশলই সার্থক এবং উত্তরসূরীদের গল্পে ও উপন্যাসে তার রীতিনীতি সম্প্রসারিত।

মানিক সাহিত্যে একটি নতুন বিশেষত্ব সংযোজন করলেন,—সেটি তাঁর নিজস্ব। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবে এটি হয় নি,—জীবনের অনুসন্ধানে তা মানিকের বিরল শিল্প-বৈশিষ্ট্য -চিহ্ন বহন করছে। একজন সমালোচক বলেছেন,"প্রত্যক্ষের আড়ালে জীবনের যে জটিলতা, যে রহস্যময়তা, তাকে তিনি জানতে চেয়েছিলেন। লেখক হিসেবে তিনি ছিলেন চরিত্রের প্রতি নিরাসক্ত, পক্ষপাতশূন্য, আবেগবিষয়ে নির্বিকার। তাৎক্ষণিক থেকে চিরায়ত সমস্ত বিষয়ে প্রত্যক্ষের অন্তরালে জটিলতাকে আবিষ্কার করতে ও তার স্বরূপ সন্ধানে ব্যগ্র হয়েছিলেন।" ('সাহিত্য-সন্ধান'—অরুণকুমার মুখোপ্যাধ্যায়।) এই 'প্রত্যক্ষের অন্তরালে জটিলতাকে আবিষ্কার ও তার স্বরূপ সন্ধানে' মানিকের নিজস্ব দক্ষতা তাকে অনন্যসাধারণের কোঠায় পৌঁছে দিয়েছে। এই রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টি বর্তমানে বিরল।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম,—একটি বিশেষ যুগ। উত্তরকালে তাঁকে অনেকে অনুসরণ ও অনুকরণ করলেও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকুশলতা দিয়ে তিনি যে নতুন ধারা প্রবর্তন করলেন, তাকে দূরবিস্তৃত করতে আগামী যুগে আরও জীবানানুসন্ধান-প্রয়াস এবং জনমানসের সঙ্গে নিবিড় আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ সংযোগের প্রয়োজন আছে।



মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জী

উপন্যাস

১। জননী (১৯৩৫)
২। দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫)
৩। পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬)
৪। পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)
৫। জীবনের জটিলতা (১৯৩৬)
৬। অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮)
৭। শহরতলী—প্রথম পর্ব(১৯৪০)
শহরতলী—দ্বিতীয় পর্ব(১৯৪১)
৮। অহিংসা (১৯৪১)
৯। ধরা-বাঁধা জীবন। (১৩৪৮)
১০। প্রতিবিম্ব (১৯৪৩)
১১। দর্পণ (১৯৪৫)
১২। শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৬)
১৩। চিন্তামণি (১৯৪৬)
১৪। চিহ্ন (১৯৪৭)
১৫। আদায়ের ইতিহাস (১৯৪৭)
১৬। চতুষ্কোণ (১৯৪৮)
১৭। জীয়ন্ত (১৯৫০)
১৮। পেশা (১৯৫১)
১৯। স্বাধীনতার স্বাদ (১৯৫১)
২০। সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)
২১। ছন্দপতন (১৯৫১)
২২। ইতিকথার পরের কথা (১৩৫৯)
২৩। পাশাপাশি (১৯৫২)
২৪। সার্বজনীন (১৯৫২)
২৫। আরোগ্য (১৩৬৯)
২৬। তেইশ বছ্ব আগে পরে(১৯৫৩)
২৭। নাগপাশ (১৯৫৩)
২৮। চলচলন (১৯৫৩)
২৯। শুভাশুভ (১৯৫৪)
৩০। হ্রফ (১৯৫৪)
৩১। পবাধীন প্রেম(১৯৫৫)
৩২। হলুদ নদী সবুজ বন (১৯৫৬)
৩৩। মাশুল (১৯৫৬)
৩৪। প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান (১৯৫৬)
৩৫। মাটি-ঘেঁষা মানুষ (১৯৫৭)
৩৬। শান্তিলতা (১৯৬০)
৩৭। মাঝির ছেলে (১৯৬০)
৩৮। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ও সমাপ্ত
ক) মাটির কাছে কিশোর কবি
খ) মশাল
গ) বিষ (সম্ভাব্য নাম)
ঘ) অন্য একটি রচনা

গল্পসংগ্রহ

১। অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫)
২। প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)
৩। মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)
৪। সরীসৃপ (১৯৩৯)
৫। বৌ (১৯৪৩)
৬। সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩)
৭। ভেজাল (১৯৪৪)
৮। হলুদপোড়া (১৯৪৫)
৯। আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬)
১০। পরিস্থিতি (১৯৪৬)
১১। খাতিয়ান (১৯৪৭)
১২। ছোটবড় (১৯৪৮)

১৩। মাটির মাশুল (১৯৪৮)
১৪। ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)
১৫। ফেরিওয়ালা (১৯৫৩)
১৬। লাজুকলতা (১৯৫৪)
১৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ গল্প (১৯৫০)
১৮। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বনির্বাচিত গল্প (১৯৫৬)
১৯। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পসংগ্রহ
২০। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ
২১। গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত আরও ১৬ টি গল্প মোট ২২৩ টি গল্প

প্রবন্ধ সংগ্রহ ও বিবিধ

১। লেখকের কথা
২। প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (ডায়েরি ও চিঠিপত্র) ১৯৭৬
৩। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিকীর্ণ রচনা
৪। ভিটেমাটি (নাটক)
৫। ইংরেজি, চেক, রুশ ও চীনা ভাষায় অনূদিত 'পদ্মানদীর মাঝি'

ছোটদের গল্প

১। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
২। কিশোর বিচিত্রা
৩। গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত ৯ টি গল্প

কবিতা

উত্তর দক্ষিণ, শ্রমবঞ্চিতা, শিকারিণী, ছড়া, সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রথম কবিতার কাহিনী, চা. পরিচয়, রাজা ও প্রজা, ভীষ্ম, দুর্ভিক্ষ এবং আমি ধাত্রী। 'দিবারাত্রির কাব্য', 'স্বাধীনতার স্বাদ' এবং 'ছন্দপতন' উপন্যাসের কবিতাগুলি।

টমাস মান্

এই শতাব্দীর মহত্তম জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে সারা বিশ্বে। জার্মান ঐতিহ্যের যথার্থ ধারক, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিলব্ধ পাশ্চাত্ত্য মানবচেতনার সার্থক রূপকার এবং উপন্যাসে মনস্তত্ত্বভিত্তিক বাস্তবতার সক্ষম প্রবর্তক মান্ এক বিস্ময়কর ও বিরাট শিল্পিব্যক্তিত্ব। অধ্যবসায়ী এবং যথার্থ প্রযত্নশীল হতে হয় এই উত্তুঙ্গ প্রতিভার গৌরব সমুন্নতি উপলব্ধি করতে। ক্লান্তিজয়ী পথপরিক্রমা অব্যাহত রাখতে, মানুষ হওয়ার প্রতিকূলতা ও মানুষ হওয়ার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে তিনি এযুগে আমাদেব এমন করে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁর শিল্পিসত্তার সামনে উপস্থিত হতে।

টমাস মান্ (১৮৭৫-১৯৫৫) জন্মগ্রহণ করেন সাতশো বছরের প্রাচীন জার্মান শহরের ল্যুবেক-এ। একশো বছরের পুরানো শস্য ব্যবসায়ীর সন্তান। প্রথম যৌবনে ভাবুক, অলস ও কল্পনাপ্রিয় এবং পরবর্তী জীবনে জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্পন্দনের নির্ভুল পরিমাপক ও সজাগ সতর্ক বিশ্লেষণকারী। অবশিষ্ট জীবনে হয়ে ওঠেন সারা বিশ্বের লেখক সম্প্রদায়, মানব কল্যাণকামী এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির যথার্থ সত্যসন্ধানী বিশ্বহিতৈষীদের নির্ভরযোগ্য মহৎ বন্ধু।

মানুষকে টমাস মান্ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—সুস্থ গৃহী ও অসুস্থ শিল্পী। শিল্পীদেরও দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে- কেউ দেবতা, কেউ বা শিল্পে উৎসর্গীকৃত জীবন শহীদ। দেবতাদের দলে—গ্যেটে, টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ। এঁরা জীবনের বহু অভিজ্ঞতায়, জ্ঞানে প্রেমে নির্লিপ্ত বিশ্ববোধ এবং মানবিক সহানুভূতিতে প্রচ্ছন্নভাবে ও কখন কখন প্রবলভাবে প্রকাশ্যে কাতর হয়েও ঊর্দ্ধলোকচারী। আর, শহীদের দলে—ডস্টয়েভ্স্কি বোদলেয়ার, রিল্‌কে ও লরেন্স—রুগ্ন দারিদ্র্যপীড়িত মহাপ্রাণ অথচ সমবেদনায় ভারাক্রান্ত। মান্ প্রথম শ্রেণীতে পড়েন। কারণ, প্রথম ও দ্বিতীয় উভয়শ্রেণীর বহুবিধ গুণ ও সমস্যাজড়িত হয়েও তিনি ধ্রুব নক্ষত্রের মতো আলোকবর্তিকা নিয়ে মানবভাগ্যের বহু যোজন উন্নত আকাশে অসামান্যভাবে দীপ্ত ও ভাসমান।

মানুষের যাবতীয় সূক্ষ্ম সুকুমার শিল্পকলা—কবিতা সংগীত চিত্রকলা, স্থাপত্য ভাস্কর্য, মহাকাব্য পুরাণ ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতি, ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান এবং আইন্সটাইনের বিস্ময়াবহ আবিষ্কৃত তত্ত্ব সবই স্থান পেয়েছে তাঁর সাহিত্যে। আদিম জীবনের আরণ্যক গন্ধময় সৌন্দর্যের সঙ্গে ভয়াবহ ধ্বংসের সহ-অবস্থান ও সম্মিলন, প্রেমচেতনা ও পরিশীলিত জীবন-সংরাগের সঙ্গে ব্যাধি ও মৃত্যুর নিরাবরণ অলজ্জ তীব্র বেদনাময় অথচ অনিবার্য ব্যাকুলতামণ্ডিত ধ্বংসোন্মুখ আকাঙ্ক্ষার নিবিড় সুসম্পৃক্ত চিত্রময় রূপাবয়ব—মানের গল্পে ও উপন্যাসে আশ্চর্য শিল্পকুশলতায় সমাহৃত ও প্রদর্শিত হয়েছে। মানবিক বোধ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভকে—একাধারে

দূষিত ও মহৎরূপে তিনি দেখিয়েছেন। ভালো আর মন্দ, প্রকৃতি আর চিত্ত, শিল্প ও জীবন-ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের দ্বন্দ্ব তাঁর গ্রন্থের উপজীব্য। সৃষ্টিতত্ত্বের দুর্বোধ্য রহস্য—বহির্জীবনে ঈশ্বর ও শয়তানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অন্তর্জীবনে তাদেরই পারস্পরিক সহযোগিতা প্রচণ্ড সুন্দর মহিমায় মানের সাহিত্যকে উদ্ভাসিত করেছে। বিচিত্র বিষয়ের দ্বন্দ্ব ও সহযোগ, সংঘাত জটিলতা ও সমন্বয় পাশ্চাত্ত্য সংগীতের এক বিপুল, বৈচিত্রের মধ্যেও সুসংহতির সপ্রাণ প্রচেষ্টার সার্থকতামণ্ডিত হয়ে, ঐকতানে মানের কথাশিল্পে সুসংস্থিত।

॥ ২ ॥

মানের প্রথম রচনা "বুডেনব্রুক্‌স্‌" (১৯০১) এর অপর নাম 'একটি পরিবারের ক্ষয়'। এই গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অবক্ষয়ের মধ্য দিয়েই শিল্পের উন্মেষ অথবা বুর্জোয়া সমাজের ধ্বংসের অন্যতম ফলশ্রুতি শিল্পের বিকাশ—এরকম ধারণার দার্শনিক তাৎপর্য অনুসন্ধানে আত্মজীবনের মর্মরহস্য উন্মোচন—এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য। ব্যবসায়ী পরিবার বুডেনব্রুকেরা। টমাস এর সর্বশেষ ধারক ও বাহক। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন একমাত্র পুত্র হ্যানোকে এই ঐতিহ্যধারার উপযুক্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে গড়ে তুলতে। কিন্তু হ্যানো ছিল অতিরিক্ত কোমল অনুভূতিপ্রবণ এবং কঠিন কর্মের অযোগ্য। কিন্তু সংগীতে তার আশ্চর্য প্রতিভার বিকাশ হয়েছে! এই উপন্যাসে পরিবার জীবনের মহত্ত্ব ও পবিত্রতার কথা চূড়ান্ত পরিণাম লাভ করেছে জার্মান জাতির মহত্ত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার লক্ষ্যে। মান্‌ জার্মান জাতীয় ঐতিহ্যেরই যুগসচেতন শিল্পী, 'স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি' তিনি জার্মানের যাবতীয় কিছুর ওপর অসাধারণ মমতাশীল ও প্রত্যয়শীল। চিরবহমান জাতীয়তার বাণীবহ তাঁর এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থ।

মানের পরবর্তী গ্রন্থ "টোনিওক্রাগ্যার" এ (১৯০৩) ক্রাগ্যার হচ্ছেন একজন সাহিত্যিক। শিল্প ও জীবন, জীবনে নানাভাবে লব্ধ নানা অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিল্পের সৌন্দর্য ও সত্যদৃষ্টি লাভ সম্পর্কে নানা কথা এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। টোনিও প্রথম জীবনে ছাত্রাবস্থায় বিশেষ সাহচর্য কামনা করত ক্লাসের সেরাছাত্র হান্‌সের। হান্‌সের ছিল সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রবণতা। অথচ টোনিও ছিল ব্যর্থ ছাত্র ও সার্থক ভাবুক। সফল পিতার কর্মদক্ষতায় সে ছিল বিস্মিত, অপরদিকে মাতার অসামান্য সৌন্দর্য সংগীত-প্রীতি ও ঔদাসীন্যের প্রতি ছিল তার প্রবল আকর্ষণ। ক্রমে সে ইংগে নাম্নী এক কিশোরীর প্রেমে পড়ল। কিন্তু সে প্রেম সার্থক রূপ পেল না তার জীবনে। ইতিমধ্যে টোনিওর সাহিত্য প্রতিভা স্বীকৃত হয়েছে। তারপরে তার পিতৃবিয়োগ, মায়ের অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ, সম্পত্তি-বঞ্চিত হওয়া এবং দেশত্যাগ - সবই ঘটল একে একে। এরপর তার ব্যক্তিগত জীবন যেমন রিক্ততায় ভরে গেল, তেমনই মননশীলতার ফসলে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হল সাহিত্যিক জীবন। মানুষের আকাঙ্ক্ষার রহস্য তার কাছে হল উদ্‌ঘাটিত। মনন, চিন্তন, জ্ঞান আর উপলব্ধির অন্তর্দৃষ্টি তাকে দিল নিঃসঙ্গতা, নিভৃতচারীর বিষাদ আর তিক্ত ভ্রষ্ট জীবনাস্বাদের যন্ত্রণা। জীবনের ট্রাজেডি আর কমেডি—

কখনও স্বতন্ত্র, কখনো বা মিলিতভাবে তাকে করল অব্যবস্থিত ও ভারাক্রান্ত। কিন্তু কেবল জীবনের শিল্পরূপায়ণেই তার প্রকাশের আনন্দ আর এই আনন্দেই সে পেত মুক্তির গণ্ডিহীন অসীমের স্পর্শ। মধ্যে মধ্যে তীব্র ইন্দ্রিয়সম্ভোগ আবার তা থেকে পবিত্রতার সন্ধানে যাত্রা এই দোলাচলচিত্ততায় বাঁধা হচ্ছিল তার শিল্পিজীবনের সুরসপ্তক। একদা টোনিও ফিরে গেল তার জন্মভূমিতে, কিন্তু লাভ করল অপরিচিতের মতো সন্দেহ ও প্রত্যাখ্যান। সেখান থেকে গেল ডেনমার্কে। সেখানে সেদেখতে পেল হান্‌স্ ও ইংগেকে। তারা স্বামী-স্ত্রী। ওদের আনন্দ-উচ্ছলতাপূর্ণ বুদ্ধিদীপ্তিহীন প্রাণবন্ত মামুলী জীবন সে লক্ষ্য করল গভীর আগ্রহে। বাহিরে তাচ্ছিল্য ও অন্তরে গভীর আসক্তি নিয়ে এই জীবনের সে সমালোচনা করলেও, নিবিড় সুখের টানে একেই সে ভালবাসে—এই আত্মোপলব্ধি তাকে দার্শনিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। মানের উপন্যাসে ঘটনা প্রবাহ নয়, সংঘাত-জটিলতার তীব্রতা ও নাট্যিক দ্বন্দ্বও নয়, মনোবিশ্লেষণ আত্মসমীক্ষা ও দার্শনিক তাৎপর্যের অনাবিল উদ্ভাসনই প্রাধান্য পেয়েছে।

"ডেথ ইন ভেনিস" (১৯১১) উপন্যাসে মান্ এক নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের বিবরণ দিয়েছেন। এখানেও রয়েছে শিল্পী ও মধ্যবিত্তসমাজের পার্থক্য। গুস্তাভ আশেনবাখ্ একজন মহৎ লেখক। তিনি দু রকম জীবন-যাপন প্রণালীতেই অভ্যস্ত। তিনি আত্মসংযমী, জীবন-যাপন রীতির মধ্যে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলায় সুনিয়ন্ত্রিত উচ্চমর্যাদাশীল এক পরিমণ্ডলে তাঁর বাস। এত পরিশ্রম অনুশীলন ও ক্লেশের দ্বারা লব্ধ তাঁর জীবনচ্ছন্দের তাল কেটে গেল একটি সৌন্দর্যের আবির্ভাবে। এই সৌন্দর্য তার সামনে উপস্থিত হল টাডৎসিও নামক একটি বালকের রূপ ধরে। একটি দুর্নিবার গতিশীল আবেগে যন্ত্রচালিতের মতো বালকটিকে তিনি অনুসরণ করতে লাগলেন। ক্রমেক্রমে সৌন্দর্য পিপাসার এই অনিবার্য তাড়নায় মৃত্যুর দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। স্ট্রবেরি খেয়ে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হলেন, এই ব্যাধিতে ও জ্বরে কাতর হয়ে সমুদ্রতটে মারা গেলেন। সৌন্দর্যের হাতছানি তাকে মৃত্যুর জীবনাতীত বিশাল প্রত্যাশার দ্বার উন্মোচনে সাহায্য করল।

ইতিহাস ও ধ্বংসোন্মুখদের বিবরণ লেখক, ব্যাধি ও মৃত্যুর প্রতি অনুরক্ত এবং জীবনের অতলস্পর্শ গভীরতায় আগ্রহী এই মহৎ শিল্পী এখানেও তাঁর অম্লান শিল্পকীর্তিতে ভাস্বর।

"দি ম্যাজিক মাউন্টেন" (১৯২৪) হচ্ছে "A novel as an architecture of ideas." এই প্রসঙ্গে মান্-এর শিল্পদৃষ্টি প্রসঙ্গে একটি কথা উত্থাপিত করা চলে। গ্যেটে বলেছেন, 'One must be something in order to do something.' যাঁরা মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে চান তাঁদের নিজস্ব মানসসংস্কৃতিকে এমন উচ্চগ্রামে তুলতে হবে, যাতে তাঁরা সাধারণভাবে সাংবাদিকের রীতিতেও যে বর্ণনা দেবেন, তাও রূপান্তরিত হয়ে উঠবে মহৎ ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণায় অনুরঞ্জিত ও অলৌকিক সংবেদনরসে আপ্লুত কল্পনা জগতের বাস্তব। বলা বাহুল্য, মানের রচনাশৈলীর মধ্যে আমরা এই অসাধারণত্ব প্রত্যক্ষ করি। 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন' —এ এই বর্ণনা-কৌশলের সম্মোহন দিয়ে বিবৃত হয়েছে পাশ্চাত্যের মন ও সংস্কৃতির স্বরূপ। এই উপন্যাসের 'নায়ক' জার্মান যুবক Hans Castorp এবং উপন্যাসের মৌলিক জীবন-জিজ্ঞাসার অভিনবত্ব সম্পর্কে

বলতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ "The Magic Mountain is a great 'developmental' novel, and some Critics have seen in Hans a symbol of Man himself, as a developing and growing creature, capable of self betterment and civilization and self-conquest, capable above all of love .... Thus the book that set out to be a study of decay ends as a picture of human capacity for development." (The Reader's Companion to World Literature . P. 265.)

এই উপন্যাসের পরিবেশ চিত্রণ বিস্ময়কর অস্বাভাবিকতায় সমাকীর্ণ। সময়হীনতার বিপুল অন্ধকার আকাশের নীচে মানব-অভিজ্ঞতার সমুন্নত পর্বতশীর্ষে বিচিত্রবর্ণ আলোকময় তুলিকা দিয়ে এই মহাশিল্পী ধীর অকম্পিত সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিহীন জীবনচিত্র রচনা করে চলেছেন। এখানে ব্যাধির শিয়রে সৌন্দর্য অতন্দ্র হয়ে পাখা মেলে ধরে। স্বপ্নের অপ্সরীর মত হাতছানি নয়, ক্ষীয়মাণ জীবনেরই প্রতিস্পন্দন এখানে সভ্যতার বন্ধুর পথ বেয়ে সংস্কৃতির অসমান ও বৈচিত্র্যময় পরিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে আপন সংবেদনের আশ্চর্য প্রতিক্রিয়ায় নতুন জীবনমন্ত্র উচ্চারণ করে চলে। এই স্বপ্নহীন অথচ স্থির স্তব্ধ রহস্যমন্ত্রগুঞ্জনক্ষান্ত পরিবেশে পৌঁছতে মহানভাবে দীর্ঘ, অসামান্যভাবে ক্লান্তিকর, সাহসিকভাবে বিরক্তিকর পরন্তু আশ্চর্যভাবে চিত্তাকর্ষক মান্-এর সাহিত্যবীক্ষণের সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়।

যুবক জার্মান এঞ্জিনিয়ার হান্স কাস্টর্প তিন সপ্তাহের জন্য স্যানাটোরিয়ামে এসেছে যক্ষাক্রান্ত ভাই জোয়াখিমকে দেখতে। কিন্তু সে নিজেই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় সাত বছর তাকে এখানে কাটাতে হয়। গ্রন্থের শেষে দেখা যায়, সে যখন সুস্থ হয়েছে, ইউরোপের আকাশে তখন মহাযুদ্ধের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। হান্স্ও এসে পড়ে এই ধ্বংসের মধ্যে। আইরনিক্যাল দৃষ্টি এ গ্রন্থে তীব্র হয়েছে—যা মানের প্রধান শিল্পবৈশিষ্ট্য - চিহ্ন বহন করে। যক্ষ্মা—শরীর ধ্বংসের প্রতীক। ইউরোপের যুদ্ধোন্মাদনা ও অন্ধ জাতীয়তাবাদের বিধ্বংসী পরাক্রম এখানে যক্ষ্মার রূপকে বিধৃত হয়েছে। এক বিচিত্র রোমান্টিক পরিমণ্ডলে যুদ্ধপূর্বকালীন ইউরোপের মানসদ্বন্দ্ব এক বিকাশোন্মুখ তরুণের ভাবদৃষ্টির মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে এখানে। জীবন সম্পর্কে হান্স্ "Amid the tensions of this novel, Castorp takes stock of whole of life and the process of living." পুনশ্চ নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনার রূপান্তর সম্পর্কে বিবৃত করতে গিয়ে মান্ যা বলেছেন, তার সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এ গ্রন্থ এক মহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হয়েছে।

'Reflections of an Unpolitical Man' গ্রন্থে সমাপ্ত হয়েছিল মান্-সাহিত্যের জার্মান কালপর্ব (German period)। অতঃপর ইউরোপীয় মানব মান্-এর পথপরিক্রমা শুরু, যার সূচনা হয়েছে 'The Magic Mountains' গ্রন্থে। আরও উত্তরকালে শুরু হয় মান্-এর বিশ্বমানবিক সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা।

"জোশেফ অ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স" গ্রন্থাবলী চারখণ্ডে বিভক্ত—(১) 'জোসেফ অ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স' (১৯৩৩), (২) 'দি ইয়ং জোসেফ' (১৯৩৫), (৩) 'জোসেফ ইন ইজিপ্ট' (১৯৩৬),



(৪) 'জোসেফ দি এভাইডার' (১৯৪৪)। বাইবেলের জোসেফ কাহিনীর পুনর্বিন্যস্ত রূপ রচনা করে এবং তাতে আধুনিক যুগসমস্যার প্রতিবিম্ব চিত্রিত করে তিনি প্রাচীন মহাকাব্যিক কাহিনীর মধ্যে ফ্যাসিস্ট শক্তির পদতলে পিষ্ট এবং মহাযুদ্ধের সন্ত্রাসে ধ্বংসে অবদমিত মানবসমাজের ভ্রাতৃবিরোধ সমস্যা এবং তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। জোসেফের পিতা জাকবের ছিল জোসেফের প্রতি অত্যধিক স্নেহ। এতে ঈর্ষান্বিত অন্যান্য ভাইয়েরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং তাকে অন্যত্র বিক্রয় করে দেয়। ঘটনাচক্রের আবর্তনে জোসেফের ক্রমে ক্রমে ভাগ্য পরিবর্তন হয় এবং রাজ্য শাসক জোসেফের নিকট দুর্ভিক্ষপীড়িত হয়ে তার ভাইয়েরাই এসে উপস্থিত হয়। তাদের বিরুদ্ধে জোসেফ মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রথমে ভয় দেখান কিন্তু পরে তাদের খাদ্য আশ্রয় ও অর্থ দান করেন। মান্ বাইবেলের কাহিনীর মূল কাঠামো বদল করেননি, তবে আংশিক পরিবর্তন করেছেনএবং জোসেফ চরিত্রে নব ভাব ও তাৎপর্য আরোপ করেছেন। জোসেফের প্রতিহিংসাস্পৃহা বর্জন এবং ক্ষমাশীলতার ঔদার্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নারকীয় বিরোধ থেকে সৌভ্রাত্রের আদর্শে উদ্দীপিত হওয়া—এ সমস্ত মানের সৃষ্টি। মান্ এভাবেই সংকেতিত করে দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক মানুষের মধ্যে জাতিতে জাতিতে বিরোধ এবং বিভিন্ন অন্তর্বিরোধের মূল সমস্যা সমাধানের সূত্রগুলিকে। বর্তমান মানবসমাজে ব্যক্তিক সামাজিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আত্মিক সংকট, অস্তিত্বের মধ্যে প্রবৃত্তি ও বিবেকের সংঘাত—পরন্তু সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যে সমস্যা—তার দুঃখজনক পরিণাম থেকে পরিত্রাণের বার্তা শোনা যায় তাঁর এই মহৎ উপন্যাস।

"জোসেফ এ্যাণ্ড হিজ ব্রাদার্স" সিরিজে মান্ মানুষের 'origin, his essence, his goal'এর সন্ধান করেছেন । আর "ডক্টর ফাউস্টাস"(১৯৪৭) উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে ফাউস্ট গল্পের পুর্ণবর্ণন, শিল্পী ও জগতে তাঁর ভূমিকার প্রশ্ন এবং জার্মানীর আধ্যাত্মিক শক্তি ও অবক্ষয় প্রসঙ্গ। এই উপন্যাসে যে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রথমতঃ তিনি গ্যেটের ফাউস্ট গল্প নতুন করে লিখেছেন, দ্বিতীয়তঃ শিল্প প্রতিভা সম্পর্কে গবেষণালব্ধ বিবৃতি দিয়েছেন এবং তৃতীয়তঃ, নাৎসি জার্মানীর ভীষণ ইতিহাসকে মূর্ত করেছেন।

" দি হোলি সিনার' (১৯৫১) উপন্যাসও আধুনিক মানুষের সমস্যা ও তার সমাধানের পরিচয় বহন করছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে মানুষের পাপাচার ও তা থেকে পরিত্রাণ, যথার্থ আত্মোপলব্ধি এবং ঈশ্বরের কল্যাণ আশিস্ লাভের পথ কী তার সন্ধানে যাত্রা করেছেন মান্।

মানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে—"দি ট্রানাস্পোজড্ হেড্স্" (১৯৪০) ভারতীয় বেতালপঞ্চবিংশতির একটি কাহিনীর মনোবিজ্ঞানের আলোকে বর্ণনা। এ ছাড়া "দি ব্ল্যাক সোয়ান" (১৯৫৩) মানব অস্তিস্ব ও তার সমস্যার কথায় পূর্ণ। কৌতুকপ্রদ ব্যঙ্গাত্মক অথচ আত্মসচেতনতা ও মৌলিক মানব-অস্তিত্বের দুঃখচেতনার উপলব্ধিতে গভীর "কনফেশান্স্ অফ এ কনফিডেন্স্ ম্যান (ফেলিক্সক্রুল)" (১৯৫৪), মানের মহৎ সৃষ্টিদক্ষতার অভিনব পরিচয়

বহন করে।

মান্ প্রচলিত শিল্পরীতিসম্মত উপন্যাসে সিদ্ধহস্ত হতে পারতেন, কিন্তু ব্যস্তবিকপক্ষে তাঁর ক্ষমতা ছিল অনেক বিরাট ও গভীর। তাই ট্রাজেডি, কমেডি বা ট্রাজিকমেডি ইত্যাদি রূপরীতিকে তিনি অস্বীকার করেছেন। তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য মানুষ—আবহমান ইতিহাসসম্মত, প্রথার চাপে পিষ্ট অথচ প্রথার বাইরে চলে আসার প্রবণতায় ব্যথিত ক্লান্ত অথচ নতুন দীপ্তিতে উজ্জ্বল ; তার জীবন ও মৃত্যু জরা ব্যাধি ক্ষয় পাপ পতন একই দার্শনিক দৃষ্টিধারা নিবদ্ধ হয়ে বহুদূর থেকে শ্রুত হয়ে আসা ঘটনা প্রবাহের নির্লিপ্ততায় শান্ত ও দীপ্তিশালী। দুটি মহাযুদ্ধের বিভীষিকায় উৎকেন্দ্রিক মানুষ, ভীত সন্ত্রস্ত ও মূল্যভ্রান্তির অপপ্রভাবে দীর্ণ জীর্ণ মানুষ তাঁর সাহিত্যে নতুন মূল্যবোধ সন্ধান প্রয়াসী। পাপ পতন অবক্ষয় এবং তা থেকে উত্তরণই মনোবিজ্ঞান দর্শন রাষ্ট্রনীতি ও ইতিহাসের আলোয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আশ্বাস অভয়বাণীতে তাঁর সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছে।

'ডক্টর ফাউস্টাস'এ সংগীতকার বন্ধু প্রশ্ন করেছে 'Do you know of any stronger emotion than love ?' সঙ্গে সঙ্গে এর উত্তর দিয়েছে সংগীত রচয়িতা আদ্রিয়ান লেভের কুন 'yes, Interest.'-শুধু মাত্র এই নয়, মান্ তাঁর নানা উপন্যাসে আমাদের আরও অনেক নির্মম তীব্র অথচ বিস্ময়াবহ প্রশ্নচিহ্নিত জীবন-সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করান। বিশেষভাবে 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন', 'ডেথ ইন ভেনিস' ও 'টোনিও ক্রগার' -এ প্রচ্ছন্ন অথচ নদীর বুকে জোয়ার ভাটার অপ্রতিহত টানের মতো, মাধ্যাকর্ষণের সব কটি অদৃশ্য বন্ধনের মতো প্রেম তার বিষাদ মধুর গহন গভীর বিমিশ্র জীবন- অভিজ্ঞানের সব ঐশ্বর্য ও সাংকেতিক অন্তর্দ্যোতনাকে বিমূর্তভাবে উদ্ভাসিত করেছে।

জেম্স্ জয়েস এবং প্রুস্ত-এর সঙ্গে উচচারিত হয়ে থাকে তাঁর নাম। ইতিহাস ও সভ্যতার গভীরতম অনুধ্যান এবং মানুষ সম্পর্কে নিবিড়তম দার্শনিক অনুভূতি দিয়ে তিনি তাঁর মহাকাব্যোপম উপন্যাসগুলিতে মানুষকেই নায়ক করে তুলেছেন। আধুনিক ইউরোপের জীবনবেদ রচনায় তাঁর পূর্ববর্তী দুজনমাত্র মহাশিল্পী তাঁর সমকক্ষ—গ্যেটে ও টল্স্টয়।

॥ ৩ ॥

টমাস মান্ নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'The roots of my culture are the same as those indicated by Goethe in his autobiographical works : romantic aspirations and a sense of civic responsibility'। ১৯৫৫তে তাঁর মৃত্যুর বৎসরে শিলারের সার্ধ শতবার্ষিকী স্মরণে টমাস মান্ স্টার্টগার্টে ও ভেইমারে ভাষণ দেন। এতে শিলার সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে তাঁর আত্মকথাও উদঘাটন করেন, যা একই কালে বর্তমান মানব সমাজ ও চিরন্তন পথনির্দেশক। দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরও মানুষের বোধ জাগ্রত হয়নি বলে তিনি মানবজাতির কাছে বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন ও সতর্ক করে দিয়েছেন। বিশ্বমানবিক বোধের জাগরণ আমাদের কালে একান্ত প্রয়োজন এবং এর দ্বারাই আত্মঘাত থেকে মানবজাতির মুক্তির দিন নিকটতর হতে পারে।

ভাষাতত্ত্বাচার্য ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

॥ ১ ॥

বাঙালি বহু ভাষাবিদ্ ও ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হরিনাথ দে, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ সুকুমার সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে যে একজন বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষাতত্ত্ব ও বহু ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য চিরস্মরণীয়, তিনি ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই চব্বিশ পবগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার পেয়ারা গ্রামে শহীদুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মফিজুদ্দীন আহমদ, মাতার নাম হরুন্নেসা। তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অতন্দ্র অধ্যবসায়ে ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেন। স্কুলে মৌলবী সাহেব দারুণ মারতেন। সেই ভয়ে তিনি ফারসী না নিয়ে সংস্কৃত নিয়ে পড়া আরম্ভ করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি তাঁর ভাষা শিক্ষার প্রথম পর্যায় সম্পর্কে নিজেই বলেছেন, 'স্কুলে ইংরাজী বাংলা সংস্কৃত আমার পাঠ্য ছিল। কিন্তু আমি ঘরে ব'সে ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম। এই স্কুল জীবনেই ভাষাশিক্ষা আমাব একটা বাতিক হয়ে দাঁড়ায়।' পরবর্তীকালে শহীদুল্লাহ্ বাংলা ও ইংরেজী ছাড়া আরও কুড়িটি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। বহু ভাষাবিদ্ হিসেবে হরিনাথ দে-র পরে তাঁর স্থান।

তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পাস ক'রে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৬-এ সংস্কৃত সহ এফ.এ. পাস করে হুগলী কলেজে ইংরেজী ও সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি,এ, ক্লাসে ভর্তি হন। পরে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি,এ, পাস করেন। এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে এ ব্যাপারে তিনিই প্রথম। এর পর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে সংস্কৃতে এম, এ ও 'ল' পড়ার জন্যে ভর্তি হন। মাস দুই পড়শোনা চলবার পর তাঁর শিক্ষাব্যাপারে বিপর্যয় দেখা দেয়। এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়ে আসেন সত্যব্রত সামশ্রমী। এম, এ, ক্লাসে বেদ অবশ্য পাঠ্য। সামশ্রমী শহীদুল্লাহ্ মুসলমান ছাত্র বলে তাঁকে বেদ পড়াতে অস্বীকার করলেন। কেবলমাত্র তাই নয়, তিনি শহীদুল্লাহকে সংস্কৃত পড়া ছেড়ে দিতে আদেশ করলেন। এ ব্যাপারে স্যার আশুতোষের অনুরোধেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। অতঃপর শহীদুল্লাহের ব্যাপারে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। 'সঞ্জীবনী' ও 'হিতবাণী' প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় এ ব্যাপার নিয়ে নানা সমালোচনা শুরু হল। মৌলানা মহম্মদ আলী 'Comrade' পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষানীতিকে আক্রমণ করে প্রবন্ধ লিখলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'The Bengali' পত্রিকায় লিখলেন 'The pandits should be thrown into the holy water of the Ganges.' শহীদুল্লাহের সহপাঠী রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'আমিও তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ, ক্লাসের ছাত্র সুতরাং ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন হয় এবং এই উপলক্ষে শহীদুল্লাহ্

ছাত্র সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আমরা তখন তর্ক করিতাম যে খ্রীষ্টান সাহেবদের সম্পাদিত ঋগ্বেদ পাঠ্য করিলে যদি দোষ না হয়, তবে ভারতীয় একজন মুসলমান বেদ পাঠ করিলে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে।'

বহু পূর্বে অধ্যাপক রবি দত্তের তত্ত্বাবধানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু ছাত্রের অভাবে তা কার্যকর হয় নি। স্যার আশুতোষ ও হরিনাথ দে-র নির্দেশে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পড়বেন বলে ঠিক করলেন। তিনিই প্রথম এই বিভাগ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাস করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ ঘোষিত হয়। আশুতোষের সার্টিফিকেটের জোরে শহীদুল্লাহ্ স্কলারশিপ পেলেন। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট বিদেশ যাত্রার অনুকূল না হওয়ায় তাঁর আর জার্মানীতে যাওয়া হল না। এর পর তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ল' পাস করেন। মধ্যে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে এক বছর প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯১৫ থেকে তিনি বসিরহাট কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু শিক্ষকতা ছেড়ে ওকালতিতে তিনি মন বসাতে পারছিলেন না। এমন সময় একদিন স্যার আশুতোষের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আশুতোষ ওকালতিতে তাঁর অনিচ্ছা দেখে তাঁকে বলেন, Sahidullah, the bar is not your place your place, is in the University." অতঃপর আশুতোষ তাঁকে ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের অধীনে মাসিক দুশ টাকা বেতনে শরৎকুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে নিযুক্ত করেন। দু'বছর পর ঐ পদে ইস্তফা দিয়ে ১৯২১-এ তিনি যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে লেকচারার পদে।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় তিনি অধ্যাপনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করবার সময়েই তিনি প্যারিসে যান। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সোরবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে বৈদিক ভাষা পারসী, তিব্বতী এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেন। এছাড়া, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট্ উপাধি লাভ করেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অধ্যাপনা কার্য থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তাঁর জ্ঞান-সাধনা অব্যাহত থাকে। ১৯৬৭ থেকে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরিটাস অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন। এর জন্য তাঁকে মাসে পাঁচশ টাকা করে সম্মান-দক্ষিণা দেওয়া হত। তাঁর বিদ্যার্জন-স্পৃহা, দুর্নিবার জ্ঞান-পিপাসা এবং অর্জিত জ্ঞানকে সাধারণের মধ্যে বিতরণের মধ্য দিয়ে আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাবিদের যে মূর্তিটি আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তার মাহাত্ম্য ও গৌরব অবিস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ, হরিনাথ দে, দীনেশচন্দ্র সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদগণের সান্নিধ্যে এসে শহীদুল্লাহের সাহিত্যবোধ ও সাহিত্যপ্রীতি উত্তরোত্তর বেড়ে যায়। মূলতঃ তিনি একজন ভাষাতত্ত্ববিদ হলেও সাহিত্যের নানা দিকে ছিল তাঁর

 

তীব্র আকর্ষণ ও অবাধ বিচরণ। শহীদুল্লাহের সাহিত্য-গবেষণার কয়েকটি উজ্জ্বল নিদর্শনঃ

১। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Doctuer de l'University de Paris ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত ফরাসীভাষার রচিত গবেষণাগুচ্ছ তিব্বতীয় অনুবাদের সাহায্যে কাহ্নপাদ ও সরহপাদের দোহাকাষের মূল পাঠ নির্ণয় এবং অপভ্রংশ ভাষা ও সহজযান সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা।

২। Les Sovs du Bengalie. Paris 1928. —প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Diplo-Phono উপাধির জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় গবেষণা নিবন্ধ। বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনা।

৩। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষা নিয়ে তাঁর গবেষণা বিস্ময়কর। এমনকি, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণারও অসম্পূর্ণতা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। ১৯২৬-এ সুনীতিকুমারে 'অরিজিন অ্যানড্ ডেভলপমেণ্ট অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রকাশিত হয়। এর আট বছর পরে শহীদুল্লাহের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায়। এই প্রবন্ধে তিনি একটি নতুন তথ্য প্রকাশ করলেন। বাংলা ভাষার গঠন-বিষয়ে এটি সুনীতিবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও এড়িয়ে গিয়েছিল। করোঁ, করী—অর্থাৎ আমি করি এবং আমরা করি। এ-দুটির ব্যবহার বিষয়ে সুনীতিবাবু কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করতে পারেন নি। ডঃ শহীদুল্লাহ্ বললেন, এ দুটি পৃথক পদ। —একটি একবচনের, অপরটি বহুবচনের। 'যেমন—'মো করোঁ' মানে আমি করি, আর 'আম্মে করী' মানে আমরা করি। সুনীতিবাবু শহীদুল্লাহের এই আবিষ্কার সানন্দে স্বীকার করে নিলেন।

৪। শহীদুল্লাহ্ সাহেব দীনেশ চন্দ্রের প্রেরণায় লোকসাহিত্যের উৎস ও বিকাশের সন্ধানেও সাগ্রহে অগ্রসর হয়েছেন। পরিণত বয়সে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য-সংগ্রহ সমিতি গঠন করেন।

শহীদুল্লাহ্ ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থাদি ছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। এ-ছাড়া তিনি বেশ কিছু কবিতা ও ছোট গল্প রচনা করেছেন। গ্রন্থ রচনা ছাড়া তিনি কয়েকটি সাময়িক পত্র পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। 'গ্রন্থপঞ্জী'তে এ-বিষয়ে উল্লেখ করা হবে। শহীদুল্লাহ্ নিজেকে বলতেন 'জ্ঞানানন্দ স্বামী'। কথাটি হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিরলস অনুসন্ধানের অস্বাভাবিক রকমের বিরাট কর্মযজ্ঞে যিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর পক্ষে স্বেচ্ছাবৃত এই উপাধি অতীব সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

॥ ২ ॥

নানা মনীষীর সান্নিধ্যে শহীদুল্লাহ্ তাঁর চিন্তা চেতনার বিকাশ ও সমৃদ্ধি সাধন করেন।

বহুভাষাবিদ্ হরিনাথ দে-র পরামর্শে "বাংলা ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মৈথিলী, মারাঠী, সিন্ধী, লাহিন্দা, কাশ্মীরী, নেপালী, পশতু, উর্দু, আরবী, ফারসী, আবেস্তান, তিব্বতী, হিব্রু, প্রাচীন সিংহলী, জার্মান, ফরাসী, গ্রীক ভাষা" তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ই তাঁর জীবনের গতিপথ বিদ্যার অভিমুখে চালিত করেছিলেন। আশুতোষ তাঁর তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। শহীদুল্লাহের বিনা দরখাস্তে তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে গবেষণা-সহায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ডঃ শহীদুল্লাহ্ সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া একটি বিশেষ শিক্ষিত ও মার্জিত মনের পরিচয় পাইলাম, এবং তিনিও আমাকে অনুজের মতন দেখিতে লাগিলেন।" সুনীতিকুমার বহুবার শহীদুল্লাহের সঙ্গে কলকাতায় এবং স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ঢাকায় ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য, ইতিহাস সংস্কৃতি, ধর্ম ও সুফীদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সুনীতি কুমার যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই যে, "আমি বরাবরই ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্থাৎ যুক্তি, তর্কানুমোদিত বিচারশৈলী দেখিয়া, নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমাদের উভয়ের সাধারণ আলোচ্যবিদ্যা বাক্তত্ত্ব বা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে নূতন অনেক জিনিষ দিয়াছেন.....। তিনি যাহাই লেখেন তাহা অধিকারী পণ্ডিতদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত পাঠের যোগ্য।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শহীদুল্লাহের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। ১৯৩৮ সনে শহীদুল্লাহের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শান্তিনিকেতনে আসেন। এই সময়ে কবি তাঁকে একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ, স্বাক্ষরিত ফটো ও কয়েকটি গ্রন্থ উপহার দেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে তাঁর অন্যতম প্রিয় আলোচ্য গ্রন্থ ছিল 'গীতাঞ্জলি'। ভাষাতত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় সুন্দরভাবে উন্মোচিত হ'য়েছে শহীদুল্লাহের 'বাংলা ভাষাতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলা উচ্চারণতত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করেন। ....রবীন্দ্রনাথের গবেষণার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা বাংলা ভাষাতে স্বর-সাম্যের নিয়ম আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছি।.................. তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির গঠন ও ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন।" শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গভীর প্রীতির সম্পর্ক ছিল। শহীদুল্লাহ্ দীনেশচন্দ্রের কৃতিত্ব সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিশোরগঞ্জে অনুষ্ঠিত পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনীর একাদশ অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, 'শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের সংকলিত 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রকাশের পূর্বে কে জানিত যে বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব মধুর ভাণ্ডার এ অঞ্চলে ভাষাজননী সাদরে নিজ অঞ্চলে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। .... এই 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও "পূর্ববঙ্গ গীতিকা" প্রকাশে .... বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিতে হইয়াছে।' দীনেশচন্দ্র শহীদুল্লাহের ভাষণে মুগ্ধ হয়ে পত্রদ্বারা তাঁকে জানিয়েছিলেন, 'আপনি এত লেখাপড়া শিখিয়াও বাংলার পল্লীমায়ের স্নিগ্ধ আহ্বান শুনিয়া

মুগ্ধ হইয়াছেন। আপনিই প্রকৃত দেশভক্ত ও শিক্ষিত।' শহীদুল্লাহ্ লোকসাহিত্য সংগ্রহ করার কাজে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে তিনি 'লোকসাহিত্য-সংগ্রহ সমিতি' (Eastern Bengal Folklore Society) গঠন করেন ১৯৩৯ সনে। বাংলাদেশের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে যে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা এখন দেখা যাচ্ছে তার প্রধান কৃতিত্ব ডঃ শহীদুল্লাহের। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর ছাত্র ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্য সংগ্রহে তাঁর অধ্যাপকের পথ অনুসরণ করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা, 'পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' (১৯৬৫) তাঁর ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনা-কৃতিত্বের অসামান্য নিদর্শন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন ডঃ শহীদুল্লাহ্। ১৯২০ সনে শাস্ত্রী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলনে তিনি 'বাংলা সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ' নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধে বাংলা লোকসাহিত্য সংরক্ষণে ছাত্রসমাজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য যেমন আবেগময় ভাষায় তিনি বিবৃত করেন তা অভূতপূর্ব। শাস্ত্রী মহাশয় ঐ বক্তৃতার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের স্নেহপূর্ণ সান্নিধ্য শহীদুল্লাহের সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশে এবং গবেষণা-কার্যের উপযোগী মননশীলতা প্রস্তুতিতে সহায়তা দান করেছিল। এজন্য তাঁর রচনারীতি সহজ সরলতা-রীতির দ্বারা প্রাণবন্ত এবং গবেষণা-কার্য বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয়েছে। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিরাটত্ব উপলব্ধি করে বলেছেন যে, তিনি 'Full Man' —পূর্ণ মানব অথবা 'ইনসান্-অন্-কামিল' পদবীতে পহুঁছিবার পথে জয়যাত্রা করিবার যোগ্য।'

॥ ৩ ॥

ডঃ শহীদুল্লাহের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ ও কর্মজীবন বিরাট। তার পূর্ণাঙ্গ বৃত্তান্ত দেওয়া কোন ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। ঢাকায় ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' ও তৎপূর্বে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বাংলা একাডেমী' ১৭ মে, ১৯৭২ তারিখে সংযুক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত শহীদুল্লাহ্ ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য ছিলেন। অধ্যাপনা জীবনে ডঃশহীদুল্লাহ্ বিপুল প্রতিষ্ঠা ও সম্মানলাভ করেন। তথ্য :—

১৯২১-২৬ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক
১৯৩৭-৪৪ : অধ্যক্ষ ও রীডার, বাংলা বিভাগ
১৯৫২-৫৪ : অধ্যক্ষ ও প্রফেসার, বাংলা বিভাগ
১৯৬৭ : এমিরিটাস অধ্যাপক (আজীবন)

১৯৫৯ সনের ১৬ই এপ্রিল তিনি এক বৎসরের জন্য করাচীতে উর্দু উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে উর্দু অভিধান সংকলনের সম্পাদক নিযুক্ত হন।

ডঃ শহীদুল্লাহ্ বহু সভা সমিতি, সম্মেলন ও অধিবেশনে উদ্বোধক, প্রধান অতিথি

ও সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। সংক্ষিপ্ত তথ্য ঃ—

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ২০শ অধিবেশন, বানান সংস্কার শাখা—

চন্দননগর ২১—২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫

নিখিল-ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন, ভাষাতত্ত্ব শাখা—

হায়দ্রাবাদ ডিসেম্বর, ১৯৪১

Asiatic Society of Pakistan, 12th & 13th Annual Session

ঢাকা ১৯৬৩, ১৯৬৪

মুসলিম জাগরণে শহীদুল্লাহের উৎসাহ উদ্দীপনার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার এবং সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা-বর্জিত। তিনি মুসলমান সাহিত্যিককে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ—

'হে মুসলমান সাহিত্তিক, তোমাকে তোমার অতীত গৌরবগাথা গাহিতে হইবে, শুধু গর্ব করিবার জন্য নয়, আত্মসম্মান জাগাইবার জন্য। তোমাকে তোমার ইসলামের মাহাত্ম্য, ঔদার্য, সৌন্দর্য ঘোষণা করিতে হইবে, হিন্দুকে ঘৃণা করিবার জন্য নয়, হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য।'

একথা স্মরণযোগ্য যে, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের মুসলমানের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণে তাঁর অবদান ঐতিহাসিক ও সর্বতোভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ্' কর্তৃক প্রদত্ত মানপত্রে ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠেছিল যাদের সংকল্পে এবং অনুপ্রেরণায়, তাদের তুমি আশীর্বাদ করেছিলে অকুতোভয়ে আত্মিক সমর্থন দিয়ে। তোমার সে ভূমিকা আমাদের এক মূল্যবান ঐতিহ্য।'

সাহিত্যচর্চা এবং সাহিত্য-বিষয়ক গবেষণা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব-আলোচনার জন্য তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি বাংলা সাহিত্যে চর্চার জন্য 'Pride of performance' পদক ও দশ হাজার টাকা সরকারী পুরস্কার পান। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই জুলাই এসিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় একটি অভিনন্দন গ্রন্থ 'Muhammad shahidullah Felicitation Volume' প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সনের ১৪ জুলাই ফরাসী জাতীয় দিবসে ঢাকায় অবস্থিত ফরাসী কনসাল এক সভায় তাঁকে ফরাসী পদকসহ 'Chevalier en ordre des Arts et des Lettres' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সম্মানলাভের বিবরণের এ এক সংক্ষিপ্ত তথ্য মাত্র।



শহীদুল্লাহ্ ছিলেন পঠন-পাঠন এবং জ্ঞান-সাধনার প্রতীক। তাঁর ব্যক্তি জীবন ছিল সহৃদয়তা, করুণা ও দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল মহৎভাবে শান্ত তপস্যার দীপ্তিতে উজ্জ্বল। ছাত্রদের তিনি উপদেশ দিতেন ঃ

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিকে ভালবাসবে।

সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে জীবনের সব সমস্যার সমাধান করবে।

সত্যের উপাসক হবে।

তাঁর সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বে অসাধারণ অবদানের চেয়ে তাঁর কালোত্তীর্ণ প্রতিভার দীপ্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাস্বর রূপকে চিনে নিতে সাহায্য করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৩১ এ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন— 'এই অঞ্চল যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানের স্মারকলিপি হয়ে আছে, প্রার্থনা করি তেমনই এ যেন নূতন রাষ্ট্রের জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের মিলনভূমি হয়।

আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশী সত্য আমরা বাঙালী।.......... পূর্ব বাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙ্গাল থেকে সমস্ত দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা।'

এই ভাষণটি ভাষা-আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দিক্ নির্দেশ বলে স্বীকার করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রথাসম্মত ভাবে গ্রন্থপঞ্জী রচনা করা এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভব নয়। তাই আমরা সংক্ষেপে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও রচনাগুলির বিবরণ দিচ্ছি ঃ— ১৯২৮-এ এশিয়াবাসীদের মধ্যে তিনি প্রথম প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ধ্বনির ওপর গবেষণা-পত্র লিখে 'দপ্লোমেদ ফোনেটিক এক্‌সপেরিমেঁতাল' লাভ করেন। সুনীতিকুমারের ODBL -এর আগেই তাঁর গবেষণাপত্র 'আউটলাইন্স অব অ্যান হিস্টরিক্যাল গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' পত্রিকায় মুদ্রিত হয় (১৯২৫)।

রামশর্মনের অপভ্রংশ স্তবকের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য (১৯২৪), অশোক অনুশাসনগুলির কয়েকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি (১৯২৫), মাগধী প্রাকৃত ও বাংলার সম্বন্ধ (১৯২৫), নকল তালুর সাহায্যে বাংলা ধ্বনির চরিত্র নির্ণয় (১৯২৮), মুণ্ডারি ও বাংলা ভাষার সম্পর্ক (১৯৩২), সিংহলে আর্য সভ্যতার আদি প্রসার (১৯৩২), সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষায় ইন্দো-ইয়োরোপীয় 'খ' ধ্বনি (১৯৩৩), ভারতীয় ভাষায় শব্দার্থ পরিবর্তন (১৯৫৬) ,বাংলা ভাষার উৎপত্তি (১৯৫৯), সিংহলী ভাষার উৎপত্তি (১৯৬২), পশ্‌তো ভাষা (১৯৫৭), বাংলা ভাষায় হিন্দি-উর্দুর প্রভাব (১৯৬২), সুমেরীয় জনগোষ্ঠী ও উর্দুভাষা (১৯৫৯), —এই সমস্ত গ্রন্থ

ও নিবন্ধ দেশ-বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জন করেছে।

তাঁর অতিশয় মৌলিক কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ—

১। "জেলা চব্বিশ পরগণার উপভাষা"—এ বিষয়ে এইটি সর্বপ্রথম ও সার্থক অনুসন্ধান।
২। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত" (১৯৬৫-তে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত) গ্রন্থে 'বাঙ্গালা ভাষায় মুণ্ডা প্রভাব' আলোচনাটি নব্য ভারতীয় আর্য ভাষাতত্ত্বে তাঁর মৌলিক অবদান সমূহের অন্যতম।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাসমূহ ঃ—

(১) আজহারউদ্দীন খান্—'মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ —সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা- ১১৫

(২) ডঃ সুকুমার সেন —'শব্দশাস্ত্রবিদ্ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' প্রবন্ধ-দ্রষ্টব্য, চতুরঙ্গ' পত্রিকা—৪৫ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

(৩) পবিত্র সরকার (ডঃ)— 'ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' প্রবন্ধ —ঐ।

(৪) সুনীল দাস —'বঙ্গসংস্কৃতির জ্যোতিষ্ক ডঃ শহীদুল্লাহ্' প্রবন্ধ—দ্রষ্টব্য, 'দেশ' পত্রিকা—৫২বর্ষ ৩৬ সংখ্যা।

(৫) অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী ও নীলরতন সেনের লেখা দুটি পত্র—দ্রষ্টব্য 'দেশ' পত্রিকা—৫২ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা।

(৬) আজহারউদ্দীন খান—'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্' প্রবন্ধ—দ্রষ্টব্য, 'অমৃত' পত্রিকা—৬ষ্ঠ বর্ষ ৪৮শ সংখ্যা।

(৭) Daud Haider— 'The first Bengali Muslim renaissance man' — 'The Telegraph'— 14 July, 1985.

(৮) মেধাবী নীলিমা - আজহারউদ্দীন খান - সাহিত্যশ্রী

অনুবাদের রীতি ও শিল্প কৌশল

সূচনা

অনুবাদের দুটি প্রচলিত অর্থেই 'অনুবাদ' শব্দটির ব্যবহার কবা প্রয়োজন। একটি অর্থ—ভাষান্তরকরণ, অপরটি অনুকরণ। অনুবাদ—একটি ভাষা থেকে অপরটিতে রূপান্তর। আবার, কবি বা সাহিত্যিকের মনোভাবের অনুকরণও দরকার। এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় আসাই অনুবাদকের একমাত্র কাজ নয়, ঐ ভাষার কবি বা সাহিত্যিকের মানসিকতার যথার্থ অনুসারীও হতে হবে তাকে। এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় আসা দায়িত্বপূর্ণ কাজ হলেও তা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু কঠিন হচ্ছে, কোন ভাষায় লেখা কবিতা বা সাহিত্যরচনার মধ্যে বিধৃত ভাবকল্পনা উপলব্ধি, শব্দের অভিধা লক্ষণা ব্যঞ্জনা ইত্যাদি বৃত্তির যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন, ছন্দ ও অলঙ্কারের রূপবৈশিষ্ট্য অনুসরণ। এখানে যে ভাষায় মূল রচনাটি থাকে সেই ভাষাকে Source Language (SL) বলা হচ্ছে। আর, যে ভাষায় রূপান্তর করা হয় সেই ভাষাকে Target language (TL) বলা হচ্ছে। SL থেকে TL এ আসতে অনুবাদককে সবচেয়ে যে প্রবল সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়, সে প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে। কবিও প্রাবন্ধিক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, 'ক্রীসমাসের পরিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহার' অনাবশ্যক। বস্তুতঃ একদেশের সামাজির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য, পৌরাণিক ঐতিহ্য ধর্মীয় বিশ্বাস, দার্শনিক প্রত্যয় ও ইতিহাস অনুচিন্তন—এই সমস্ত মিলেমিশে যে জাতীয় ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তা থেকেই প্রাণবায়ু সঞ্চয় করে সে দেশের সাহিত্য। অপর দেশের জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার সাহিত্যের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এক ভারত উপমহাদেশেই এতগুলি যে প্রদেশ, তাদের একটির জনজীবনের সঙ্গে অপর জনজীবনের আচার আচরণ ও সংস্কৃতির মিল আছে গভীর, পার্থক্যও কিন্তু কম ব্যাপক নয়। সুতরাং, উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে, ফরাসী জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালী জাতীয় ঐতিহ্যের অমিল হবেই—এতে সন্দেহ করা চলে না। সামগ্রিক বিচারে, বিভিন্ন জাতির জাতীয় সংস্কৃতির পার্থক্যই অনুবাদের মূল সমস্যা। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'জাতির পাঁতি' কবিতায় আশা প্রকাশ করেছিলেন—আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন/চারি মহাদেশ মিলিবে যবে, /সেই দিন মহা-মানব ধর্ম্মে/মনুর ধর্ম বিলীন হবে'। একথা আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের আদর্শে খুবই শ্রুতিসুখকর। কিন্তু তাহলেও সব দেশের সব মানুষের সব ভাষা এক হয়ে যাবে না জেনেই তিনি অনুবাদ কর্মে এত অধ্যবসায়ী হয়েছিলেন।

সাহিত্য-অনুবাদ মূলের 'অনুরূপ' হতে পারে না। তা হতে পারে মূলের 'প্রতিরূপ'। সংবাদ, বাণিজ্যিক সংবাদ ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ইত্যাদির 'অনুরূপ' অনুবাদ হওয়া উচিত; কাব্য নাটক কিংবা উপন্যাসের অনুবাদ হবে 'প্রতিরূপ' ধরনের। এখানে 'অনুরূপ' শব্দটির 'সদৃশ' অর্থটির উপর জোর দিতে হবে; আর 'প্রতিরূপ' শব্দটির যে অর্থটির উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে—'প্রতিবিম্ব'। সংবাদের 'সদৃশ' অনুবাদ হওয়া উচিত ও সম্ভব, সাহিত্যের

অনুবাদের আদর্শ হওয়া উচিত 'প্রতিবিম্ব' ধরনের। আয়নার আমাদের মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাতে আমাদের মুখকেই দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ডানদিক হয় বাঁদিক, বাঁদিক হয় ডানদিক। এই সত্য স্বীকার করেই আমরা আয়নায় প্রতিবিম্বিত আমাদের মুখচ্ছবিকে যেমন যথার্থ বলে বিশ্বাস করি (অর্থাৎ তা যে ধরনে যে অনুপাতে যতখানি নির্ভরযোগ্য) সাহিত্যের অনুবাদও ততখানিই নির্ভরযোগ্য বলে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। অনুবাদের এই একাধারের বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততা নিয়েই যুগে যুগে যত বিতর্ক ও বিরোধ দেখা দিয়েছে। এছাড়া আরও দুর্ভেদ্যও জটিল হচ্ছে সেই সমস্যা যা কবিতার অনুবাদের প্রসঙ্গে একান্তভাবে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। কোন Source language-এর কবি তাঁর কবিতায় যে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনার অভীপ্সাকে মূর্ত করেন, কোন Target Language-এর অনুবাদক পূর্বোক্ত কবির সেই অভীপ্সাকে কি যথার্থভাবে মূর্ত করে তুলতে পারেন? হাঁ বা না কোনটিই এর যথোচিত উত্তর নয়। অনুবাদক যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এ চেষ্টায় তিনি যতখানি সফল হতে পারবেন, ততখানিই সার্থক হবে তার অনুবাদ।

রীতিপদ্ধতি

অনুবাদকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করার প্রস্তাব করা যেতে পারে। (১) মূলানুগ, (২) স্বচ্ছন্দ। কীটসের 'La Belle dame Sans Merci' কবিতার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী' মূলানুগ। এতে মূলের ভাব ভাষা ছন্দ ও অলঙ্কারের যথাসাধ্য সমতা রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' (মানসী) কবিতাকেও অনুবাদ বলা চলে বিশেষ 'স্বচ্ছন্দ' অর্থে। অর্থাৎ এতে কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের ছন্দ অলঙ্কার বজায় নেই, কালিদাসের ভাষারও ক্বচিৎ প্রতিধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু ভাবের গভীর ঐক্যসূত্রে মূল কাব্য ও রবীন্দ্রকবিতার হরপার্বতী মিলন ঘটেছে। অনুসন্ধান করলে উপলব্ধি করা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' কবিতা কালিদাসের 'মেঘদূতম্' কাব্যের মর্মবাণী উপলব্ধির সর্বাধিক সহায়ক। সুন্দর স্বচ্ছন্দ অনুবাদে মূলের কাব্যরস আস্বাদন যে কত আকর্ষণীয় হতে পারে, 'মেঘদূত' কবিতা তার বিরল সার্থক উদাহরণ। 'স্বচ্ছন্দ' অনুবাদ সম্পর্কে আর একটি কথা প্রয়োজন। মূলানুগ অনুবাদে ভাব ভাষা ছন্দ অলঙ্কারের বাঁধনকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, এতে অন্তর্বস্তু অনেক সময় যথার্থভাবে অনুবাদে ধরা পড়তে না পারে। কিন্তু 'স্বচ্ছন্দ' অনুবাদের লক্ষ্য অর্ন্তবস্তুকে অর্থাৎ অন্তর্নির্হিত রসবস্তুকে যথাসম্ভব অক্ষত অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রাখা। এতে অনুবাদের মাধ্যমে মৌলিক যে ভাবসম্পদে অনুবাদ্য রচনা সমৃদ্ধ তার বিনিময়ে অনুবাদক তাঁর নিজভাষায় অন্ততঃ আর একটি স্বতন্ত্র কবিতা পেতে পারেন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে

'প্রতিধ্বনি'র ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন, "আমার মতে কাব্য যেহেতু উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত, তাই আমি এও মানতে বাধ্য যে তার রূপান্তর অসম্ভব; এবং

ইংরেজীর ব্যাকরণ-স্বাচ্ছন্দ্য, গুণবাচক শব্দের প্রতি ফরাসীর মোহ, অথবা জার্মানের অন্বয়, তথা সমাসবাহুল্য, যদিচ বাংলাতে একেবারে দুর্লভ নয়, তবু ওই ভাষাত্রয় আর বঙ্গবাণীর মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ বিদ্যমান।"

এখানে মনে রাখতে হবে 'আকাশ-পাতাল প্রভেদ'কথাটি। নানা দেশের ভাষা বিভিন্নধর্মী। তাদের কোনটির ব্যাকরণ-স্বাচ্ছন্দ্য, কোনটির বিশেষণের প্রতি মোহ, কোনটির বা অন্বয় অথবা সমাসবাহুল্যের দিকে ঝোঁক অন্যভাষায় সহজে সঞ্চারিত করে অনুবাদে সাফল্য লাভ করতে চাওয়া দুঃসাধ্য প্রযত্ন ব্যতীত আর কিছুই নয়। একথা মনে রাখতে হবে। একথা মনে রেখেই সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কবিতার সংগ্রহ 'তীর্থসলিল' পড়ে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মূলের রস কোনোমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না।' বিষ্ণু দে তাঁর 'হে বিদেশী ফুল' গ্রন্থে তাঁর অনুবাদে চেষ্টা করেছিলেন 'মুল কবিতার বিন্যাস, ছন্দ বা নিদেনপক্ষে মেজাজ অনুবাদের আভাষে বহন করতে।' কখনো কখনো একথা মনে হয়, অনুবাদ কর্মটিই অ-স্বাভাবিক অ-সহজ, তার কারণ আর কিছুই নয়, মেজাজের পার্থক্য। অথচ কোন কোন ভাষাতাত্ত্বিক যে কথা বলছেন, তাতে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, ভাষাগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত সাম্য কোথাও না কোথাও রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি যাকে abstract syntax বা deep syntax বলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সব ভাষাতেই বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি ভাগ আছে, এমনকি উদ্দেশ্য বিধেয় ভাগও প্রায় সব ভাষাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। অর্থ উপলব্ধির ব্যাপারেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোথাও অন্তর্নিহিত ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা ব্যর্থ হবার নয়। কিন্তু তবু বিশেষ একটি ভাষার কিছু কিছু শব্দ আছে যা অন্যভাষায় অনূদিত হতে পারেই না। এ ছাড়া বিশেষ ভাষার বিশেষ বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে সমস্ত ভাবনা বেদনা আশা আকাঙ্ক্ষা, সংস্কার আবেগ বর্ণময় সংবেদনা অথবা গভীরতম অনুভূতি—তাকে অন্যভাষায় সহজে সঞ্চালিত করা দুরূহ। তবু অনুবাদেই বিশ্ব নিকটতর হতে পারে এবং তা হয়েছেও। একজাতির সহমর্মী হয়ে উঠেছে অন্যজাতি। এভাবেই প্রশস্ত হচ্ছে মানবসংহতির উজ্জ্বল দিন।

অনুবাদের নানারীতি

অনুবাদকের অনুবাদে প্রসাদগুণ (মনোহর প্রাঞ্জলতা-গুণ) সঞ্চার করবার শক্তির উপরে নির্ভর করে অনুবাদকের সাফল্য। অনুবাদ যদি হয় আড়ষ্ট কঠিন জটিল অন্বয়যুক্ত তবে তা পাঠকের মনোহরণ করতে পারবে না। প্রসাদগুণের সঙ্গে যদি মাধুর্যগুণের সমাবেশ ঘটে তবে তা আরও ভলো। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। মেঘদূতের উত্তরমেঘের ৩য় শ্লোকটির অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী—

মূল শ্লোক : যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃপাদপা নিত্যপুষ্পা

হংসশ্রেণীরচিতরশনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।

কেকোৎকণ্ঠা ভবন শিখিনো নিত্যভাস্বৎকলাপা

নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহত তমোবৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

অনুবাদ : 'যে অলকার বৃক্ষগুলি 'নিত্যপুষ্পা'—অর্থাৎ কখনও পুষ্পহীন হয় না, মধুলোভী উন্মত্ত ভ্রমরকুল সেই বৃক্ষের চারিদিকে গুঞ্জন করিতে থাকে; যেখানে সরসীতে নিত্য পদ্মফুল হয় বিকশিত হংসশ্রেণী তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকে—মনে হয় যেন সরসী সুন্দর মেখলা পরিধান করিয়াছে; যেখানে গৃহময়ূরগুলির পুচ্ছ সর্বদাই দীপ্তিময় এবং তাহাদের কেকাধ্বনিতে চারিদিক মুখর হইয়া থাকে; যেখানে সন্ধ্যা অত্যন্ত সুন্দর—সর্বদাই জ্যোৎস্নায় আলোকিত, অন্ধকারের লেশমাত্রও থাকে না।'

এই একই শ্লোকের অনুবাদ করেছেন রাজশেখর বসু :

'যেখানে পাদপ সকল নিত্যপুষ্পিত এবং মত্তভ্রমরে মুখর, নলিনীসকল নিত্যপদ্মযুক্ত এবং মেখলার ন্যায় হংস শ্রেণীদ্বারা বেষ্টিত, ভবন শিখিগণের কলাপ নিত্য উজ্জ্বল এবং তাদের কণ্ঠ কেকারবের জন্য উন্নত, সায়ংকাল নিত্যজ্যোৎস্নাময় এবং অন্ধকার নিবৃত্তির জন্য রম্য।'

অধ্যাপক শ্রীচক্রবর্তী পণ্ডিত, তাঁর অনুবাদ বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রসাদগুণে পূর্ণ। কিন্তু রাজশেখর বসু পণ্ডিত ও মর্মগ্রাহী, তাঁর অনুবাদে এসে মিলেছে প্রসাদগুণের সঙ্গে মাধুর্যগুণের সঙ্গ।

আর একটি শ্লোকের তাৎপর্য ব্যখ্যা প্রসঙ্গে আসা যাক। শ্লোকটি হচ্ছে—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।

লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥

অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত এর ব্যখ্যা দিয়েছেন—'এই বাক্যের বাচ্য অর্থ সহজভাবে গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা হইতে অপর একটি অর্থ আক্ষিপ্ত হইতেছে—তাহা হইল বিবাহের প্রসঙ্গে বালিকার সলজ্জ পুলক।' অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বলছেন—'এ কবিতার শব্দার্থ, লীলাকমলের পত্রগণনা—তার বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে অর্থান্তরের পূর্বরাগের লজ্জাকে ব্যাঞ্জনা করছে।' 'বিবাহের প্রসঙ্গে বালিকার সলজ্জপুলক' এবং 'পূর্বরাগের লজ্জা—সাধারণভাবে অর্থের বিচারে একই কথা। কিন্তু 'পূর্বরাগের লজ্জা' নিহিতার্থ দ্যোতনার উৎকর্ষে অধিকতর মর্মস্পর্শী। অনুবাদে রয়েছে মেজাজ ও রুচির প্রশ্ন। কোন অনুবাদক কোন্ temperament-এর লোক, তার উপরে নির্ভর করে অনুবাদের ভাষায় উৎকর্ষ,

অপকর্ষ, কাঠিন্য ও সারল্য ইত্যাদি নানা প্রকাশভঙ্গি বৈচিত্র্য কেউ পছন্দ করেন গাম্ভীর্য ও সমাসবাহুল্য, কেউ বা সহজসুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিয়ে খুশী। আরও একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। রাইনার মারিয়া রিলকে তাঁর Epitaph কবিতায় লিখছেন—

Rose, oh the pure contradiction, delight

Of being no one's sleep under so many lids

শঙ্খ ঘোষ এর অনুবাদ করেছেন—

গোলাপ, পবিত্র বিরোধ তুমি, এত সব

চোখের পাতায় থেকে কারো ঘুম না-হবার

সুখ। (নাম দিয়েছেন—'এপিটাফ')

প্রমোদ বসু অনুবাদ করেছেন—

গোলাপ,

তোমার সৌন্দর্যের ভিতর

দারুণ বিরোধ,

ঘুমের অবকাশেও যা আমাদের

নিদ্রাহীন করে। (নাম দিয়েছেন—'সমাধিলিপি')

শঙ্খ ঘোষ মূলানুগ। প্রমোদ বসু স্বচ্ছন্দ। শঙ্খ ঘোষ 'এপিটাফ' নামটিই রেখেছেন। শঙ্খের 'পবিত্র বিরোধ' ভালই, কিন্তু প্রমোদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ দ্বিধাহীন, তাই বলেছেন 'দারুণ বিরোধ' এখানেই দেখা দিয়েছে মেজাজের পার্থক্য। শঙ্খ বললেন, ঘুম না-হবার', প্রমোদ বললেন, সমাসবদ্ধ পদে 'নিদ্রাহীন'। সুতরাং প্রকাশ-ভঙ্গির বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়।

উপসংহার

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ-কবিতা-সংগ্রহ 'তীর্থরেণু' পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তোমায় এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য।' এই যে আত্মাকে এক দেহ থেকে অন্য দেহে আনা—এটিই যথার্থ আর্টিস্টের কাজ। একাজে তিনিই সাফল্য লাভ করতে পারেন যিনি একাধারে একাগ্রবুদ্ধি রসজ্ঞ ও ধৈর্যশীল। সংস্কৃত ভাষার কবি বলেছেন—ভবানীর ভ্রূকুটিভঙ্গি

ভব-ই জানেন, ভূধব নন। যিনি বুদ্ধিমান ও বসজ্ঞ তিনিই কাব্যের বা সাহিত্যের আত্মার বহস্য অনুসন্ধান কবতে পাববেন। আব চাই ধৈর্য। দেবযানী কচকে বলেছিলেন—

বমণীর মন

সহস্র বর্ষেবি সখা, সাধনাব ধন।

(বিদায় অভিশাপ)

সহস্রবর্ষ না হোক, দীর্ঘকালীন অধ্যবসায় অনুবাদ কর্মে সাফল্য লাভের তৃতীয় শর্ত।

সহায়কগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাসমূহ

১। প্রতিধ্বনি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

৩। সাহিত্যপাঠের ভূমিকা—ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

৪। কালিদাসের মেঘদূত—রাজশেখর বসু

৫। কাব্য-জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত

৬। মহাকবি কালিদাসের সমগ্র রচনাবলী—অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

৭। অভিমান পত্রিকা—সংকলন ঃ চার ; মাসিক বাঙলাদেশ—আগষ্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭

৮। Selected Poems— Rilke (Penguin)

সাহিত্য ও প্রকৃতি

সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সর্বাগ্রে মনে যে প্রশ্ন জাগিয়া ওঠে তাহা এই, সাহিত্যের সাহিত্য কাহার সহিত? অর্থাৎ সাহিত্যের ভাব ও বস কাহার দ্বারা গৃহীত হয় এবং সাহিত্যে কাহার ভাব প্রকাশিত হয়। এ প্রশ্নের উত্তরে বলিব, মানবমন সাহিত্যের সাহিত্য-সঙ্গী। আবাব সাহিত্য (ব্যাপক অর্থে) মানবমনের অভিব্যক্তির লিখিত বিকাশ মাত্র। Arnold Bennet সাহিত্য-প্রসঙ্গে বলেছেন,— "And literature cannot be said to have served its purpose until it has been translated into actual life of him who reads it. It is the vast reservoir of true ideas and emotions. Literature exists so that when one man has lived finely,ten thousand may afterwards live finely. It is a means of life, it concerns the living essence." এই যে 'living essence" এর কথা বলা হইয়াছে, এই 'living essence'—জীবন-নির্যাস—সাহিত্যের উৎস। মোহিতলালের কথায়—"জীবন বলিতে মুখ্যত যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, ধ্বংস ও সৃষ্টির অফুরন্ত লীলা বুঝায়, এবং যাহার আঘাত সর্বমানবকে অতি-গভীর রক্তগত অনুভূতির সমবন্ধনে আত্মীয় করিয়া তোলে .... তাহা হইতেই একটি পরম অভিজ্ঞতার উদ্ভব হয়"—এই "অভিজ্ঞতা'ই সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। সাহিত্যিক সাহিত্যে তাঁহার 'অভিজ্ঞতা'কে অপূর্ব ও অভিনব রূপে প্রয়োগ করেন।

'প্রকৃতি বলিতে এখানে আমরা বিশ্বপ্রকৃতিকে বুঝাইতে চাহিতেছি। ইংরাজ কবি Wordsworth-এর কাব্যে যে 'Nature'—আমরা তাহার কথা আলোচনা করিব। 'প্রকৃতি'র যে অর্থে আমরা মানব-প্রকৃতিকে বুঝাইতে চাই—এস্থলে 'প্রকৃতি'র সেই অর্থ ব্যবহার করিব না। অন্যত্র করিব। বিশ্ব প্রকৃতির দিকে আমরা যখন দৃষ্টিপাত করি তখন যাহা সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমাদের মনকে আনন্দ দান করে—তাহা ইহার বিচিত্রমুখী সৌন্দর্য - সাধনা। অতি ক্ষুদ্র তৃণলতা হইতে আরম্ভ করিয়া অসীম সমুদ্র পর্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে আমরা যে বিচিত্রতা লক্ষ্য করি তাহা সৃষ্টির এক বিস্ময়কর বিকাশ। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যাহার কথা সর্বাপেক্ষা বৃহৎভাবে অনুভব করি তাহা ইহার সংগ্রামময় জীবন-সাধনা। জীবনে প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ, মৃত্যুতে প্রাকৃতিক শক্তির আপাত অবলুপ্তি—অপরপক্ষে, বিবর্তন।

সৌন্দর্যের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তির স্থায়িত্ব ও মাধুর্য প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতায় যখন শুনি,—

"তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।"

তখন বলিতে পারি যে, পৃথিবীর মৃত্তিকার উপরে প্রকৃতির 'শুভে-অশুভে-স্থাপিত ... পাদপীঠে' তাহার (প্রকৃতির) অন্তর্নিহিত শুভপ্রভাবে ঘটিতেছে প্রাণের প্রকাশ, অশুভ প্রভাবে ঘটিতেছে মৃত্যু। ঐ কবিতায় যখন শুনি,—

"একদিকে আপক্ক ধান্য ভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—

* * *

অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর মরু ক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশু কঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।"

তখন সহজে জানিতে পারি যে, 'অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা'—পৃথিবীর প্রতি একথাটা কতদূর প্রযোজ্য। বস্তুতঃ প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ প্রকাশের যে ব্যাকুলতা এবং প্রাণ ধ্বংসের যে ভীষণতা যুগপৎ কার্যকরী, তাহার দ্বারাই লীলা চলিতেছে পরম রসের অথবা 'রসো বৈ সঃ' -এর। 'ছিন্নপত্রে' যখন পড়ি —"আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে, যেন এর মনে মনে আছে, 'আমি দেবতার মেয়ে কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনে, আরম্ভ করি সম্পূর্ণ করতে পারিনে, জন্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনে।" —তখন মনে হয়, পৃথিবীর এই যে মর্মবাণী বেদমন্ত্রের মতো কবির কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—এর পরিচয় আছে প্রকৃতির লীলা বৈচিত্র্যের মধ্যে। লীলাই প্রকৃতিব মর্মকথা। আপাত দৃষ্টিতে যাহা জীবন এবং যাহা মৃত্যু তাহাদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লীলাকে স্থায়ী করা। লীলার মধ্য দিয়া প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। লীলাই প্রকৃতির মূলকথা—তাহার পাদপীঠ শুভ অশুভ শুভাশুভ মিশ্রিত যাহাই হউক না কেন!

'চিত্রা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যাহাকে চিত্রা বলিয়াছেন সে বিশ্বব্যাপ্তা বিচিত্র সৌন্দর্যাভরণভূষিতা চেতনারূপিনী এক শক্তি। বিশ্বপ্রকৃতিকেও উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে পারি—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিনী।"

(চিত্রা,—চিত্রা)

প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্রতাই সর্বাপেক্ষা প্রধান দর্শনীয় বিষয় একথা পূর্বে বলিয়াছি। এই বিচিত্রতার মধ্যে একদিকে যে মাধুর্য, যে দীপ্তি, যে শান্তি, যে কল্যাণ এবং অপরদিকে যে শ্রীহীনতা, যে রুক্ষতা, যে ভীষণতা , যে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর প্রলয়ান্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, তাহাতে উভয় দিক হইতেই সৌন্দর্যের উপকরণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্যে সৃষ্টির লীলা স্থায়িত্ব লাভ করে, তবে এই স্থায়িত্ব ক্ষণকালের হইতে পারে অথবা বহুকালের হইতে পারে।

মানব প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টির এই 'শুভে-অশুভে-স্থাপিত পাদপীঠ' প্রতিষ্ঠিত। 'পৃথিবী'



কবিতায় যখন শুনিতে পাই

"দেবতার মন্ত্র উঠছে আকাশে বাতাসে অরণ্যে
দিনে রাত্রে
উদাত্ত অনুদাত্ত মন্দ্রস্বরে।
তবু তোমার বক্ষের পাতাল থেকে আধপোষা নাগদানব

ক্ষণে ক্ষণে উঠছে ফণা তুলে—
তার তাড়নায় তোমার আপন জীবকে করছ আঘাত

ছারখার করছ আপন সৃষ্টিকে।"

মানব-প্রকৃতির মধ্যস্থিত দুইটি বিভিন্ন দিকের কথা তখন মনে পড়ে। মানবপ্রকৃতির মধ্যে একদিকে দেবমহিমা —অপর দিকে দানব মহিমা। একটি কল্যাণ—অপরটি অকল্যাণ। একটি মহত্ত্ব—অপরটি হীনত্ব। জীবনে এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর শক্তির সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রাম—পরস্পর-বিরোধী। এই শক্তিসমূহের সংঘাতই জীবন। এই দিক দিয়া মানব প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির প্রভাবান্বিত। সাহিত্য মানবমনের লীলাক্ষেত্র। সুতরাং মানবমনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিচিত্র লীলার প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে। কথাটিকে বিশদ করিয়া আলোচনা করি। বহু মানবজীবনের সহিত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে এক একটি মানবের জীবনে যে বিশেষ ভাবধারা আসে মানবমনে তাহারই প্রতিচ্ছবি জাগিয়া ওঠে। বহু মানবের জীবনলীলা—তাহাদের আশা আকাঙ্খা, সুখ সাচ্ছন্দ্য, দুঃখ বেদনা, প্রেম প্রীতি এক একটি মানব জীবনের উপর যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবতরঙ্গ প্রবাহিত করে—তাহারই সুন্দর সুন্দর প্রতিচ্ছবি ভাষার দর্পণে সাহিত্যে ফুটিয়া ওঠে। সাহিত্য মানব চরিত্রের দর্পণ,—মানব জীবনের বহুমুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের লিপিবদ্ধ ইতিহাস।

. মানুষ যুগে যুগে তাহার প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া জীবনপথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। এই প্রবৃত্তি কখন তাহাকে পরিপূর্ণ অসংযমের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছে ভীষণতার চরম গভীরে, আবার কখনও তাহাকে সম্পূর্ণ সংযমের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছে সৌন্দর্যের গভীরতম আনন্দলোকে, যখন মানুষ অপরূপ সৌন্দর্যের অধীশ্বরকে জানিতে পারিয়া বলিয়াছে, "বেদাহমেতৎপুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।" অন্তঃপ্রবৃত্তির সহিত বহিঃপ্রবৃত্তির সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানব-জীবনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। এই জীবনপ্রবাহের বিচিত্র লীলার মধ্যে সৌন্দর্যের সন্ধান করা এবং সাহিত্যে তাহা প্রকাশ করা সাহিত্যিকের কার্য।

অতঃপর প্রশ্ন উঠিবে, সাহিত্য ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যকার প্রকৃত সম্পর্ক কোথায়? উত্তর হইবে, শিল্পিচিত্তে প্রকৃতির বিচিত্র লীলার যে প্রভাব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহার ফলে তাহার মনের মধ্যে যে সকল অনুভূতি জাগে তাহা কখনও সহজভাবে আবার কখনও মানব-জীবনলীলার 'অভিজ্ঞতা'র সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় সাহিত্যে। সুতরাং এই দিক দিয়া সাহিত্য বিশ্বপ্রকৃতির

নিকট ঋণী। মানবজীবনে প্রকৃতির প্রভাব কি এবং শিল্পিচিত্তে তাহার কি প্রতিচ্ছবি জাগে তাহা আলোচনা করিতে গিয়া মনে পড়ে,—

"নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্তেই
একত্রে করিব আস্বাদন এক হয়ে
সকলের সনে।

* * *

সহস্রের মুখে
রঞ্জিত হইয়া আছে সর্ব্বাঙ্গ তোমার,
হে বসুধে! প্রাণস্রোত কত বারম্বার
তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে
গিয়েছে ফিরেছে; তোমার মৃত্তিকা-সনে
মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে
কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে
ব্যাকুল প্রাণের আলিঙ্গন ; তারি সনে
আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে
তোমার অঞ্চলখানি দিব রাঙাইয়া
সজীব বরণে ; আমার সকল দিয়া
সাজাব তোমারে।

(বসুন্ধরা,—সোনার তরী)

আবার মনে পড়ে,—

ধরণীর তলে গগনের গায়
সাগরের জলে অরণ্য ছায়
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসার মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর ;
তারপর ছুটি নিব।

(পুরস্কার,—সোনার তরী)

আশাকরি উপরোক্ত কাব্যাংশদ্বয় হইতেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাবে অনুধাবন করা যাইবে। মানবজীবন ও প্রকৃতির সম্বন্ধ যখন আত্মীয়তায় পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন সাহিত্যের জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন অভিরামরূপময় কল্পনার জগৎ আপনার দ্বার উদঘাটিত করিয়া রাখে। কবি বা সাহিত্যিকের কার্য হইল সেই জগতের অপূর্ব সৌন্দর্য আপনার সৃষ্টিকর্মে বিকশিত করিয়া তোলা। প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি যে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের যেটুকু মানবজীবনের লীলারূপ অঙ্কনের কার্যে লাগিবে সেটুকু গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, সাহিত্যে প্রকৃতির প্রভাব বৃহত্তরভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। অর্থাৎ সাহিত্যে প্রকৃতির স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট স্থান আছে—উপযুক্তস্থলে একথা স্বীকার করিয়া তাহার সত্যকার রূপ আবিষ্কারের জন্য সাধনা করিতে হইবে।

যে সকল কাব্যে নাটকে উপন্যাসে 'একটা বহির্গত Symbol বা প্রতীক রূপে'—পশ্চাৎপট অথবা পটভূমিকারূপে প্রকৃতির স্থান নির্ধারিত সেখানে প্রকৃতির সৌন্দর্য একটি বিশেষ দিক দিয়া সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হইবার সুযোগ লাভ করে। অবশ্য প্রকৃতিকে লইয়া কাব্যরচনার কথা স্বতন্ত্র। সেখানে প্রকৃতিই সকল ভাবের উৎস,—মানবজীবন সেখানে স্থানে স্থানে পশ্চাৎপটরূপে ব্যবহৃত। উপন্যাসে, গল্পে, নাটকে প্রকৃতির যে স্থান তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নহে। পরন্তু, সাহিত্যে কোন কোন স্থানে প্রকৃতিকে একটি বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে—যাহাতে সাহিত্যের সৌন্দর্য অপূর্ব মহিমা মণ্ডিত হইয়া তাহাকে এক শাশ্বত গৌরব দান করিয়াছে। এ বিষয়ে সংস্কৃত সাহিত্য অগ্রণী। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে 'শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন তপোবন-প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোন নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান, এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।" অতঃপর বক্তব্য এই যে, সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান কতদূরে উন্নীত হইতে পারে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাহিত্যে মূক প্রকৃতিকে সচেতন করিয়া তাহাতে কতদূর পর্যন্ত মানবিক চেতনা আরোপ করা যাইতে পারে, এ প্রসঙ্গে ইহা নির্দেশ করাই সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য। অতঃপর তত্ত্বের দিক দিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলে ইহাদের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে নিরূপণ করা যাইবে।

শিল্পীর সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া মহাকবি Goethe বলিয়াছেন—

"প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ দ্বিবিধ ; তিনি একই সঙ্গে তার প্রভু ও দাস। দাস এই কারণে যে পার্থিব সামগ্রীর সাহায্যে তাঁকে কাজ করতে হয় নিজেকে বোঝাবার জন্য ; আর প্রভু এই কারণে যে এই সব পার্থিব সামগ্রী তিনি উপায় স্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁর উচ্চতর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে। সমগ্রতার সাহায্যে শিল্পী তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই সমগ্রতা কিন্তু প্রকৃতিতে নেই ; ত্রুটি তাঁর নিজের চিত্তের ফল, অথবা বলা যায়, ফল-সঞ্চারী ঐশ্বরিক প্রেরণা।"

(কাজী আবদুল ওদুদ কৃত অনুবাদ)।

এখানে যে 'সমগ্রতা'র (entirety) কথা বলা হইয়াছে, এই 'সমগ্রতা' হইতেছে শিল্পীর হৃদয়রসের দ্বারা অভিষিক্ত একটি সম্পূর্ণ নূতন অঘটন ঘটন পটিয়সী রসদৃষ্টি। আমাদের জীবনে যে পূর্ণতা নাই — তাহারই রূপ আমরা দেখিতে চাই সাহিত্যে। সাহিত্যে সেই পূর্ণতার সাধনা। Goethe যে 'ফল-সঞ্চারী ঐশ্বরিক প্রেরণা'র কথা বলিয়াছেন তাহা হইতেছে 'Love of truth' বা সত্যপ্রীতি। এই সত্যপ্রীতি সম্পর্কে Goethe-এর কথার বলি—'The first and last thing demanded of genius is love of truth'। সুতরাং বলা যায় যে, এই সত্যপ্রীতিই শিল্পীর বা সাহিত্যিকের প্রেরণাদায়িকা শক্তি। অতঃপর এই শক্তির চরম উদ্দেশ্য কি তাহা আলোচনা করিব। প্রকৃতির অন্তরে যে সৃষ্টিশীলতা আছে মানবজীবনে সেই প্রবৃত্তির মহত্তর উচ্চতর এবং সূক্ষ্মতর কার্যকারিতা দৃষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে Goethe-র কথা স্মরণীয় :—"প্রকৃতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে জ্ঞান করে আর—এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বলে, তার কাজ হচ্ছে অন্তর্লোকে আর এক চূড়ার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সে তার ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করে—সমস্ত সৌষ্ঠব ও গুণপনায় সে নিজেকে করে ভূষিত, নির্বাচন শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য অর্থবোধ, এ-সবের হয় তার বিশেষ প্রয়োজন, অবশেষে লাভ হয় তার শিল্প-সৃষ্টির যোগ্যতা যা তার অন্যান্য কর্ম ও কীর্তির পাশে লাভ করে বিশেষ মর্যাদার স্থান। একবার যদি এর সৃষ্টি হয়, একবার যদি এই শিল্পসৃষ্টি জগতের সামনে দাঁড়ায় মানস-সত্য রূপে তা হলে এর লাভ হয় এক স্থায়ী প্রভাব—শ্রেষ্ঠতম প্রভাব , কেননা বহু শক্তির সম্মিলন-ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তিরূপে এযে নিজেকে বিকশিত করে তোলে এইজন্য জীবনে যা-কিছু শ্রেয় প্রেয় ও গৌরবের সে-সবই নিজের ভিতরে সঞ্চিত করে, আর এইভাবে মনুষ্যমূর্তিতে (নতুন ভাবে) প্রাণ সঞ্চার ক'রে মানুষকে করে মহত্তর, তার জীবন ও কর্মের পরিধিকে করে পূর্ণাঙ্গ, আর অতীত-ও-ভবিষ্যৎ-সমন্বিত বর্তমানে তাকে দান করে দেবত্ব।" (কাজী আবদুল ওদুদ কৃত অনুবাদ)

এই 'দেবত্বে'র কথা বলিব । এই 'দেবত্বে'র সত্যতা বহির্জগতে নাই, এর সার্থকতা আছে মানস-সত্য (ideal reality) রূপে। সুতরাং প্রকৃতির বাহিরের রূপের মধ্যে এর সন্ধান করা বৃথা। শিল্পীর হৃদয়ের ধ্যানলোকে এই দেবত্ব-সমন্বিত যে মানবমূর্তি—

"সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে। (ক্ষণিকা , — পূরবী)

—এই মূর্তির আবিষ্কারের দ্বারাই মানবচিত্ত-জগতের সত্য ও সৌন্দর্য উদঘাটন করা সম্ভব।

বিরাট সাহিত্যপ্রতিভার মধ্যে প্রকৃতির সহিত একাত্ম হইবার যে ব্যাকুলতা দেখা গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া ঐ আকাঙ্ক্ষার কারণ ও ফল নির্দ্দেশ করিব। তাহাতে, সাহিত্যের উপর প্রকৃতির প্রভাব কতদূর বিস্তৃত,—এই জিজ্ঞাসার বা সমস্যার সমাধান হইবে। একদিকে Goethe

বলিযাছেন, "All your ideals shall not prevent me from being genuine, and good and bad—like Nature"— আবাব অপবদিকে ববীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—

"বিদাবিযা
এ বক্ষ পঞ্জব, টুটিযা পাযাণ বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীব, আপনাব নিবানন্দ
অন্ধ কাবাগাব—হিল্লোলিযা মর্মবিযা
কম্পিযা স্খলিযা বিকিবিযা বিচ্ছুবিযা
শিহবিযা সচকিযা আলোকে পুলকে
প্রবাহিযা চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্ত ভাগে উত্তবে দক্ষিণে
পূববে পশ্চিমে",

আবাব—

"ইচ্ছা কবে, বাব বাব মিটাইতে সাধ
পান কবি বিশ্বেব সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিবাধাবা নব নব স্রোতে।"
(বসুন্ধবা,—সোনার তরী)

প্রকৃতির সর্বপ্রকাব সৌন্দর্যের মধ্যে একান্তভাবে প্রবেশ কবিবাব এবং তাহাদের বস আস্বাদন করিবাব জন্য কবি-হৃদয়েব ব্যাকুল বাসনা উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে ; ইহাতে আমরা কবির বৃহত্তর ও উচ্চতর জীবন-সাধনার স্বীকৃতি খুঁজিয়া পাই। আবার, ঐরূপ ব্যাকুল বাসনার জন্য শিল্পীর ধ্যানজগতে এক নূতন কল্পলোকের সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পূর্বোল্লিখিত কথাগুলিব বহির্জাগতিক কোন সার্থকতা নাই,—উহাদের সার্থকতা আছে উচ্চ ভাব সাধনার মধ্যে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে যে, পূর্বোক্ত আবেগময়ী আকাঙ্খা কবি হৃদয়ে কিরূপে উদিত হয়? —প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি ও ধ্বংসের যে বিচিত্রলীলা অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, শিল্পীর হৃদয়ে তাহার অবিরাম স্পন্দন অপূর্ব বিস্ময় ও বেদনা সঞ্চার করে। এই বেদনা সৃষ্টির সূচনা। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি,—

"অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ..........
(ভাষা ও ছন্দ,—কাহিনী)

বিস্ময় বিমিশ্রিত এই যে জাগরণ এবং ইহার সহিত সংযুক্ত যে বেদনা —তাহা অনুভব করা প্রকৃত শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। কবি আপনার ধ্যানলোকে যখন প্রকৃতির অপূর্ব কল্পনাময়ী রূপলীলার মধ্যে আপনার সৃষ্টির উৎসস্বরূপ আনন্দিত বেদনার সাহায্যে অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাঁহার সৃষ্টির যথার্থ প্রয়োজনের কথা জানিতে চাহেন তখন তাঁহার অন্তরের মধ্যে এক অপূর্ব বিস্ময় সঞ্চারিত হয়। এ বিস্ময়— আবিষ্কারের বিস্ময়। কবি তখন ইংরাজ কবি D H Lawrence-এর মত বলিতে পারেন,

> 'Oh, for the wonder that bubbles into
> my soul,
> I would be a good fountain, a good
> well-head,
> Would blur no whisper, spoil no
> expression "
> (Song of a Man Who Has Come
> Through)

আপনার কল্পলোকে প্রকৃতির সুষমাময় রূপের মধ্যে সৃষ্টির মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য উচ্ছ্বসিত স্রোতনির্ঝরের মতো কবির ঐ মানস-অভিযান।

পরিশেষে সাহিত্যে প্রকৃতিবাদ বা Naturalism সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। প্রকৃতিবাদ সম্বন্ধে মোহিতলাল বলেন,— "গত শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যে একদল শক্তিশালী ফরাসী লেখক, যেমন বালজাক, মোঁপাসা প্রভৃতি—জীবনকে, মানুষের জীবনকেও, সৃষ্টির বৃহত্তর নিয়মের অধীন করিয়া দেখিযাছিলেন। পশু ও মানুষ নির্বিশেষে, এমন কি জড়প্রকৃতিতেও সেই জীবনের একটি অব্যভিচারী ও অব্যাহত নিয়মের প্রকাশ রহিয়াছে। সমস্ত সৃষ্টি—গ্রহ তারা হইতে জলমাটি, পশুপক্ষী ও মানুষ সেই এক জীবনধর্ম পালন করিতেছে। সেই ধর্মে বা নিয়মে মানুষের হৃদয-ধর্ম এবং শুভ-অশুভ নীতি-দুর্নীতির সংস্কারের কোন স্থান নাই, সকলই শক্তির লীলা এবং শক্তিমাত্রই সুন্দর। সেই শক্তির লীলায় দেশ বা পারিপার্শ্বিক, জন্ম বা জাতি, এবং কালের বা অবস্থার প্রভাব। এই সকলের যোগাযোগে, কার্য-কারণের যে অখণ্ডনীয় ফল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই কবি-কল্পনাকে উজ্জীবিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট, সেণ্টিমেণ্ট বা হৃদয়াবেগেই সেই দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ ও হেয় করিযা তোলে। সেই শক্তি জড়ে ও চিৎ-এ মানুষ ও পশুতে যে বৈষম্য দূর করিযাছে—সেই মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলে কল্পনা আরও মুক্ত আরও সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে। এ কল্পনা একরূপ বৈজ্ঞানিক কল্পনাই বটে। একজন বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক এই লেখকদের ভাবজগৎকে 'a land of pure logic and imagination' বলিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাইতেছি, এই সাহিত্য খাঁটি প্রকৃতিতান্ত্রিক—ইহা মানব - তান্ত্রিক নহে। মানুষের পৃথক আত্মিক সংস্কার বা হৃদয় বৃত্তিকে স্বীকার করে না। অথচ ইহা খাঁটি জড়বাদও নহে, একটা বৃহত্তর চিন্ময় সত্তার উপলব্ধি ইহাতে আছে। কিন্তু ইহাও মনোধর্মী সাহিত্য। ঐ মন আত্মনিরপেক্ষ বলিয়া উহাতে একরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভিমান আছে। কিন্তু জ্ঞান মাত্রেই পরোক্ষ—দর্শন,



অনুভূতির অতলে ডুবিয়া যে অপরোক্ষ দর্শন হয় উহা সেই দর্শন নয়। বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, উহাতে সেই আত্মবিলোপ নাই যাহা শেকস্পীরীয় কবি-কল্পনায় আছে ; সেই মুক্তির চেতনাও উহাতে নাই। উহা জীবনকেও একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়তি-নিয়মের অধীন করিয়া দেখে—মানুষের মহিমার পরিবর্তে সেই নিয়মের মহিমাই কীর্তন করে।" অতঃপর সাহিত্যে প্রকৃতিবাদ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা বাহুল্য, কিন্তু তথাপি মোহিতলালের কথাগুলিকে বিস্তৃতভাব বিচার করা কর্তব্য। মোহিতলাল এই মতবাদকে আর্টপন্থার দিক দিয়া 'জ্ঞান-পন্থা' এবং এই 'জ্ঞানপন্থা'কে আবার 'বিজ্ঞান-পন্থা' বলিয়াছেন। এই পন্থা অনুসারে সাহিত্যিক যে দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেন তাহা 'জীবনকেও একটা অলঙ্ঘনীয় নিয়তি-নিয়মের অধীন করিয়া দেখে।' এই মতবাদ Realism বা বাস্তববাদ অপেক্ষা উচ্চস্তরের । এই মতবাদ অবলম্বনকারিগণ সকল জীবনের অনুভূতিক্ষেত্র হইতে সুদূরে অভিনব কল্পলোকে জীবন-জিজ্ঞাসার সমাধান করেন। ইহা অত্যুচ্চ মানস-শক্তির কর্ম। কবি Wordsworth -এর কবিতায় পড়ি, —

" Come forth into the light of things,
Let Nature be your Teacher."

(The Tables Turned)

কবি কত সহজে কত বড় কথা বলিয়াছেন! এই যে 'Teacher' বা শিক্ষাদাতার কথা বলা হইয়াছে—ইহার কার্যকারিতা তখনই সার্থকরূপে পরিস্ফুট যখন শিল্পী ইহার নিকট Goethe -র কথায় 'slave' বা দাস। "He is her slave in as much as he must work with earthly things in order to be understood," এই হ'ল Goethe র কথা। ভাবজগতে 'light of thing's-এর জগৎ সম্পূর্ণ এক নূতন জগৎ, কেবল কবিমানসে তাহার অস্তিত্ব। সেখানে কবি প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যে আত্মহারা। কবি বলেন —

"এ সাতমহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে
গিঁঠাতে গিঁঠাতে।"

আবার—

" যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে
আছি তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে বিপুল ভুবন তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী।।"

(প্রবাসী,—উৎসর্গ)

কবি হৃদয়ের এ স্বীকৃতি এই যে 'নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে', ইহা 'মানুষের মহিমার পরিবর্তে সেই নিয়মের মহিমাই কীর্তন'। সুতরাং 'জ্ঞান-পন্থা'র দিক দিয়া প্রকৃতিবাদের মর্যাদা অতি উচ্চ।

কাব্যে মাধুর্যগুণ

মাধুর্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে মিষ্টতা, মনোহারিতা, সৌন্দর্য। কোন বস্তুর মিষ্টতা মনোহারিতা ও সৌন্দর্য একত্রিত করলে যে একটি সামগ্রিক আবেশ মনের মধ্যে সৃষ্ট হয়ে ওঠে—তারই নাম দেওয়া যেতে পারে মাধুর্য। অবশ্য এই মাধুর্য বিশেষভাবে কবিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কবিতা বোঝাবার চেয়ে যে অনেক পরিমাণে বাজবার জি—কবির একথাটি মনে রাখলেই মিষ্টতা ও সৌন্দর্য নিযেই আমাদের কাজ চলবে —মনোহারিতা-গুণ তখন বাহুল্য বিবেচিত হবে। কারণ, যিনি কাব্য পাঠ না করে শ্রবণ করবেন তাঁর নিকট মিষ্টতা এবং মিষ্ট শব্দ শ্রবণজাত যে মানসিক অনুবণন তাই এক অলৌকিক সৌন্দর্যের সন্ধান দেবে—অলক্ষিতে কাব্য-শব্দসৌকুমার্য কখন যে তাঁর মন হরণ করে নিয়ে গিয়েছে তা তিনি মানসদৃষ্টির সাহায্যে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেও হয়ত দর্শন করতে পারবেন না। এখানে মিষ্টতা সেই বিষয় যা ঃ

Like a flash of light
That has revealed the invisible.

মিষ্টতা ' flash of light' — সৌন্দর্য 'invisible'। এই সৌন্দর্য এক হিসাবে অ-দর্শনীয় —কারণ চর্মচক্ষে এ সৌন্দর্য দৃষ্টিপথাতীত—এ মানস-নেত্রগ্রাহ্য মাত্র।

প্রসাদ ও ওজঃগুণের মত—মাধুর্য কাব্য বা কবিতার একটি গুণ। সৌন্দর্য পরিচায়ক বা সৌন্দর্য সম্পাদক বা সৌন্দর্যবিবর্ধক এই গুণগুলির মধ্যে মাধুর্যগুণের পরিচয় ও গোত্র নির্ণয় সহজসাধ্য নয়। অবশ্য বিশেষ মাধুর্যগুণের যে ব্যাখ্যাই প্রাঞ্জলতম মনে হোক না কেন— তার প্রতি নতি জানিয়ে একথা সহজভাবে বলা যেতে পারে যে, মাধুর্যগুণের মূলতত্ত্ব এই, কাব্যের স্থানে স্থানে সু-চয়িত শব্দপুঞ্জের ধ্বনি মনের মধ্যে যে মিষ্টতার স্বাদ জাগ্রত করে এবং সৌন্দর্যদৃষ্টিকে স্ফুরিত করে তা সমগ্র চৈতন্যে আনে আনন্দময় জাগরণ; এই জাগরণই মাধুর্যগুণের দান এবং এইটিই কাব্যরসিকের কাম্য। মাধুর্য একটি আস্বাদ—ঠিক 'স্বসংবিদানন্দচর্বণ ব্যাপার' নয়—এ কবির কাব্যভাষায় এক আনন্দ-উদ্দীপক গুণ। মাধুর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি শব্দের বিশেষ আলোচনা অলঙ্কারশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে—সৌন্দর্য ও রমণীয়তা। সৌন্দর্য সম্পর্কে হিউম বলেন ঃ

"সৌন্দর্য বস্তুসমূহের স্বভাবভূত কোন গুণ নহে ; যে চিত্ত তাহাদের চিন্তন করে, কেবলমাত্র তাহাতেই ইহার অবস্থান।" মাধুর্য যে সৌন্দযকে জাগ্রত করে তা চিত্তে আনে ভাব—চিত্তকে করে দ্রবীভূত এবং বিগলিত।

'রমণীয়তা'র ব্যাখ্যা দিয়েছেন জগন্নাথ—"রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদ জ্ঞান গোচরতা"— অলৌকিক আনন্দের জ্ঞান গোচরতাই রমণীয়তা।



মাধুর্যগুণ আলৌকিক আনন্দের জন্ম দেয়। আর এই অলৌকিক আনন্দ উপলব্ধির দ্বারাই আসে রমণীয়তা। আবার—

"রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক ঃ শব্দ ঃ কাব্যম্।"

রমণীয় অর্থ যে শব্দ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই কাব্য। বুদ্ধি-স্থিত অর্থের দ্বারা জন্মে রম্যবোধ। রম্যবোধ ও রসের সম্মিলনে জাগে আনন্দ। মাধুর্য জাগায় সৌন্দর্যকে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যা আনন্দ দেয়, তাকেই মন সুন্দর বলে।"

সৌন্দর্যের একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, এক হিসাবে সৌন্দর্যমাত্রই আবস্ট্র্যাক্ট্ , সে তো বস্তু নয়, সে একটা প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে।

মাধুর্য জন্ম দিয়ে থাকে সৌন্দর্যের; এই সৌন্দর্যেই জেগে ওঠে আনন্দের ভাব। সুতরাং , মাধুর্যগুণের মোক্ষ আনন্দে। মাধুর্য—এক সুধাসমুদ্র, সৌন্দর্য—যেন চন্দ্র ; আনন্দ—চন্দ্র থেকে উচ্ছ্বসিত কিরণসম্পাতে এক অলৌকিক দৃশ্যের সৃষ্টি। মাধুর্যের স্থান আমাদের মানসসরোবরে—কাব্য থেকে আসে আনন্দের আলো—আর সুবিচিত্র শাশ্বত কল্পনালোকে জেগে ওঠে সুবিচিত্র সৌন্দর্য।

আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা পরিচিত হয়ে থাকি রূপ রস শব্দ স্পর্শ ঘ্রাণ-এর সঙ্গে। এদের সকলের স্পর্শে জাগ্রত হয় মাধুর্য। নাম ও রূপের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের জগৎ বিধৃত। এই জগতের সকল কিছুই মাধুর্যের দ্বারা আপ্লুত হতে পারে। কিন্তু মাধুর্যের একটি বিশেষ জগৎ আছে,—এক বিশেষ ধরনের নন্দন-নিকেতনে তার বাস।

এই প্রসঙ্গে সাবলিমিটির কথা এসে পড়ে। সাধারণ সৌন্দর্যের সঙ্গে সাবলিমিটিব (Sublimity.) র পার্থক্য আছে। সৌন্দর্য যখন ভীষণতা ও প্রশান্তি — এই উভয় গুণের সমাবেশে অপূর্ব আকার ধারণ করে—তখন সেই বিশেষ সৌন্দর্য সাবলাইম হয়ে ওঠে। সাবলিমিটির আরও কয়েকটি লক্ষণ—গভীরতা, মহত্ত্ব, বিশালতা ও গৌরব—সমুন্নতি। মাধুর্যের সঙ্গে সাবলিমিটির পার্থক্যও বিশেষ লক্ষণীয়। প্রকৃতি-জগতে ও মানবজগতে ভয়ঙ্করের সঙ্গে আনন্দের মিশ্রণে যে পরিণাম তাই সাবলিমিটির পরিণাম। কিন্তু মাধুর্যের পরিণাম অন্যতর।

হাসি কান্না ভাবনা দুঃখ দ্বন্দ্ব বেদনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের আন্দোলনে আন্দোলিত জীবন নির্ঝরিণীর সূর্য চন্দ্র তারকা-কিরণের বিচিত্র বর্ণালিস্পনে বিচ্ছুরিত বারিকণাগুলির সৌকুমার্য মাধুর্যলোকের সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু রচনা করে। হৃদয়বেদনার ক্ষীণ রজতধারার ঊর্ধ্বে কল্পনা কাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভবের শুভ্র মেঘখণ্ডগুলিই মাধুর্যলোকের মণিমাণিক্য। হিরণ্যহরিৎ শস্যক্ষেত্র, কাশবনশীর্ষের অপরিমিত আলস্য, নীলিমায় স্বপ্নময় গোধূলির অস্তরাগ—এইগুলিই মাধুর্যলোকের পরিচিত দৃশ্য। তার বাইরে জীবনের যে বৃহৎ সংক্ষোভ, সংগ্রাম, গরিমা, মহিমা, পতন ও অভ্যুদয়—তার মধ্যে আনন্দ আছে, উজ্জ্বলতা আছে, সমুন্নতি আছে—কিন্তু মাধুর্যের চির

ছায়াচ্ছন্ন লাবণ্যশ্রীর দীপালোকদীপ্তি অনুপস্থিত। জীবনের সংগ্রামসংক্ষুব্ধ দিনগুলির অবসানে কবিচিত্ত যখন মাধুর্যব্রতী তখন তিনি লিখেছেন—

হেলেন, তোমার রূপ মোর মনে হয়
সেকালের ভিনীসীয় তরণীর মতো,

কত না দুরন্ত সিন্ধু বিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, ক্লাসিক বয়ান,
নেয়াড তোমার লাস্য, মোরে আনে ঘরে
গ্রীসে, চির গৌরবের আদি পীঠস্থান
আর রোমে, আছিল যে বৈভব শিখরে।

(Edgar Allan Poe : অনুবাদ—বিষ্ণু দে)

দীর্ঘ রণ রক্তপাত ও সফলতার পরেও জীবনের যে অমৃততৃষ্ণা—মাধুর্য - তৃষ্ণা—তাই কবিচিত্তে অম্লান দীপবর্তিকায় জ্বলে উঠছে। কবি বলেছেন—

Ah Psyche,from the regions which
Are Holy Land!
আহা সাইকি! যেই দেশে তোমার নিবাস
সে যে পুণ্যভূমি !

(Edgar Allan poe : অনুবাদ—বিষ্ণু 'দে)

এই যে রূপ-বন্দনা ও মাধুর্য-তৃষ্ণা—এক চির লাবণ্যালোকিত গৃহ প্রাঙ্গণের অমর্ত্যমাধুরী তা কবিচিত্তের এক চিরন্তন প্রেরণা—এর প্রভাবেই ঋষিচিত্ত শান্ত সুন্দর মন্ত্রধ্বনিতে পূর্ণ—মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ন সন্তোষ ধি—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

অলঙ্কারের সাহায্যে কাব্যে মাধুর্যলক্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। শব্দালঙ্কারে অনুপ্রাস এবং অর্থালঙ্কারে রূপক—দুটি মাত্র অলঙ্কারের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে যে,—মাধুর্যগুণ অলঙ্কারের উপর বহু পরিমাণে নির্ভরশীল।

অনুপ্রাস—

বকুল বনে পবন হত সুরার মত সুরভি
পরাণ হত অরুণ বরণি। (মদনভস্মের পূর্বে : রবীন্দ্রনাথ)

রূপক —

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।। (জ্ঞানদাস)



অনুপ্রাসের মধ্যে যে শ্রুতি-মাধুর্যের সৃষ্টি হয়—তার মূলে থাকে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের ধ্বনিবৈচিত্র্য রূপকের অভেদ কল্পনা অলক্ষিতভাবে মনোহরণ রূপ সৃষ্টি ক'রে পাঠকচিত্তে রুচির রসাকে ঘনিয়ে তোলে। অন্যান্য অলঙ্কার সম্পর্কেও অনেকাংশে এই প্রকার কথা বলা চলে।

রূপগোস্বামী মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার বলেছেন—শান্ত, প্রীত (দাস্য), প্রেয়ঃ (সখ্য) বাৎসল্য, মধুর বা উজ্জ্বল (শৃঙ্গার)। মধুর রসে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরের নিবিড়তম রসানুভূতির সম্মিলন।

মধুর রস এখানে শৃঙ্গার রসেরই নামান্তর। কিন্তু কেবল শৃঙ্গার রস প্রসঙ্গেই এ আলোচন সীমাবদ্ধ নয়। কারণ মাধুর্য কাব্যে একটি সর্বব্যাপক গুণ এবং সর্বপ্রকার রসের আশ্রয়, সর্বশ্রেণীর কাব্যেই যে চিত্তাহ্লাদসাধক মাধুর্য—তাই আমাদের অন্বিষ্ট।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা এসে পড়ে। ভরতমুনি তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এই ব্যভিচারী ভাবগুলির মধ্যে কয়েকটির মাধুর্যগুণের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ রয়েছে। মাধুর্যগুণের উদ্দীপনের দ্বারা সহজেই যে ব্যভিচারী ভাবগুলি এসে পড়ে সেগুলি হচ্ছে—মোহ, হর্ষ, আবেগ, ঔৎসুক্য, সুপ্তি বা স্বপ্ন ও বিরোধ বা জাগরণ। এই ভাবগুলি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে আসে। কখনও মোহ ও আবেগ একত্রে আসে, কখনও মোহ ও সুপ্তি, কখনও বা হর্ষ, ঔৎসুক্য ও জাগরণ একত্র এসে পড়ে।

মাধুর্যের দ্বারা চিত্তে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ হয় সে সৌন্দর্যকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—দর্শনের দ্বারা লব্ধ সৌন্দর্য, শ্রবণের দ্বারা লব্ধ সৌন্দর্য এবং মননের দ্বারা লব্ধ সৌন্দর্য। এখন এই ত্রিবিধ সৌন্দর্যের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে,—

দর্শন,—

ছায়া মেলি সারি সারি স্তব্ধ আছে তিন চারি
সিসু গাছ পাণ্ডু কিশলয়,
নিম্ব বৃক্ষ ঘন শাখা গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পে ঢাকা,
আম্র বন তাম্র ফলময়

....

বসি আঙিনায় কোণে গম ভাঙে দুই বোনে,
গান গাহে শ্রান্তি নাহি মানি।
বাঁধা কূপ, তরুতল, বালিকা তুলিছে জল
খরতাপে ম্লান মুখখানি। (কুহুধ্বনি : রবীন্দ্রনাথ)

শ্রবণ,—

গান তার গুন্‌গুন্
মঞ্জীর রুন্ রুন্
বোল তার ফিস ফিস

চুল তার মিশ্ মিশ্
সেই মোর বুল্‌বুল্—
নাই তার পিঞ্জর,—
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভব। (পিয়ানোর গান : সত্যেন্দ্রনাথ)

মনন,—

স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম; হাসিখানি স্থির
অশ্রু শিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো ; প্রীতি স্নেহ
গভীর সংগীত তানে উঠিছে ধ্বনিয়া
স্বর্ণ বীণা তন্ত্রী হতে রনিয়া রনিয়া
অনন্ত বেদনা বহি। (মানস সুন্দরী : রবীন্দ্রনাথ)

স্বতঃস্ফূর্ত মহাকাব্যের (Authentic Epic)মধ্যে সাধারণতঃ মাধুর্যগুণ বিরল। তবে সাহিত্যিক মহাকাব্যগুলিতে (Literary Epic) রোমান্টিক পরিবেশের মধ্যে স্থানে স্থানে মাধুর্যগুণ প্রকাশিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়! ক্লাসিক্যাল কাব্য অপেক্ষা রোমান্টিক কাব্যে মাধুর্য লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট হওয়া স্বাভাবিক। ক্লাসিক্যাল কাব্যের সংহৃতি এবং রোমান্টিক কাব্যের আকৃতি—মাধুর্যগুণের প্রকাশ উভয় স্থলে সম্ভবকপর হলেও,—রোমান্টিক কাব্যের মধ্যে যে বিস্ময়ের মঙ্গে সৌন্দর্যের মিলন ঘটে (the addition of strangeness to beauty— Walter Pater) এবং তাতে চিত্তে যে সুখকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা মাধুর্যলক্ষণ পরিস্ফুট করে তুলতে বিশেষ সাহায্য করে। মাধুর্যের একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তাতে একটি শান্ত উজ্জ্বলতার ভাব থাকে আর যে রস তার মধ্যে অনুস্যূত হয়ে থাকে তাকে বলা যেতে পারে স্মিতরস। রোমান্টিক কাব্যের ব্যাকুল অভিসার যখন কিয়ৎ পরিমাণে স্থির হয়ে আসে—তখন চিত্তে যে শান্তি জাগে তার মধ্যে মাধুর্য ক্ষণে ক্ষণে ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত হয়ে উঠবার অবসর লাভ করে।

I. A. Richards বলেন—'emotive element' এবং 'means of reference' —শব্দের এই দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য। কবিতার শব্দসজ্জার পিছনে কবির মনে যদি মধুরের মূর্তি থাকে তবে কবির পরিশীলিত আবেগ স্বভাবতঃই মধুর শব্দচয়নের দিকে প্রবণতা দেখাবে। Emotional aspects বা ভাবধর্মের সহিত Intellectual aspects বা অর্থধর্মের ঐকরস সৃষ্টি হলেই কাব্য শ্রী ও ধী লাভ করবে। এই প্রসঙ্গে কবিগণের কোমল ও মধুর শব্দ প্রয়োগের কথা স্মরণীয় । জয়দেবের "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্" ইত্যাদি পদাবলী, বিদ্যাপতির প্রেম>পেম, বিধি >বিহি, রেখা>রেহ্য ইত্যাদির ব্যবহার এবং রবীন্দ্রনাথের 'তনিমা' 'শোণিমা' ইত্যাদির সৃষ্টি মধুর শব্দ প্রয়োগের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।



গীতি কবিগণের কবিতাতেই মাধুর্যলক্ষণ সমধিক উপলব্ধি করা যায়। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন সহজ সরল গানের মত সুরে প্রকাশিত হয়—তখন গীতি কবিতার জন্ম। গীতি কবিতায় চিত্তকে দ্রব করবার মত স্বতঃ উৎসারিত মধুব কোমল ভাবগুলি শব্দ ছন্দ ধ্বনিকে মাধুর্যলক্ষণাক্রান্ত কবে তোলে। শ্রেষ্ঠ গীতিকবির কবিতাবলী তার সাক্ষ্য দেয়।

মাধুর্যগুণ যে কেবল শৃঙ্গার রসের মধ্যেই বিশেষ স্থানলাভ করে থাকে তা নয়। হাস্য, করুণ ও শান্ত রসের মধ্যেও তার বিশেষ স্থান আছে। উদাহরণ দিতে গিয়ে মনে পড়ে—

শৃঙ্গাব,—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥

(কবিবল্লভ)

হাস্য,—

এখন যাঁরা বর্তমানে
আছেন মর্তলোকে
মন্দ তারা লাগত না কেউ
কালিদাসের চোখে।
পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যত
কালিদাসের কালে।

(সেকাল : রবীন্দ্রনাথ)

করুণ,—

হে জননী পুত্রহারা,
তবু জানি মনে
যখন ফিরিব পুন তব নিকেতনে
তখনি দুখানি বাহু ধরিবে আমার,

বাজিবে মঙ্গল শঙ্খ, স্নেহের ছায়ায়
দুঃখে সুখে ভয়ে ভরা প্রেমের সংসারে
তব গেহে, তব পুত্রকন্যার মাঝারে,
আমারে লইবে চির পরিচিত সম— (স্বর্গ হইতে বিদায় : রবীন্দ্রনাথ)

শান্ত,—

যাচি হে তোমার চরম শান্তি,
পরাণে তোমার পরম কান্তি,
আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও
হৃদয় পদ্মদলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে। (গীতাঞ্জলি : ১ : রবীন্দ্রনাথ)

"বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় শাক্ত পদাবলীরও মূল অবলম্বন ভক্তিরস।" (ডাঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত)

জগৎ জননীর মাধুর্যময় মূর্তি এবং ঐশ্বর্যময় মূর্তি—উভয়ই কবিচিত্তকে আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এখানে মাধুর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যের বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

তব প্রেমে ধন্য তুমি করেছ আমারে
প্রিয়তম। তবু শুধু মাধুর্য মাঝারে
চাহি'না নিমগ্ন করে রাখিতে হৃদয়
....
তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।
(নৈবেদ্য : ৮২ : রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের মনে মাধুর্যের সঙ্গে ঐশ্বর্যময় রূপভাবনাও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কাব্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে মাধুর্যের প্রকাশ আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব—এ সত্য বিশেষভাবে স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রেমচেতনা

হৃদয়ে হৃদয়ে সুনিবিড় বন্ধনই প্রেম। কিন্তু এই বন্ধন সহজে হয় না, সব সময়ে হয় না। সাহিত্যের একটি কাজ এই বন্ধনকে দেখানো— কেমন করে তা হয়, কেমন করে তা বেড়ে ওঠে, তার পরিণাম মিলনান্তক না বিয়োগান্তক এবং সংসারে ও সমাজে তার প্রভাব শুভ বা অশুভ—কি রকম?

বাংলা সাহিত্যের সূচনাকালে আমরা ধর্মীয় সাধনার বিষয়কে অবলম্বন করে সাহিত্য রচিত হয়েছে দেখতে পাই। কিন্তু ধর্ম আর যাই হোক মানবিক স্বতঃস্ফূর্ত লীলাকে সংকুচিত করেই দেখাতে চায়; কিন্তু যে প্রেম মানবহৃদয়ের স্নিগ্ধ সরসভূমির সুবর্ণপুষ্প— ধর্মীয় অনুশীলনের কঠিন পারিপার্শ্বিকে তার সাবলীল বিকাশ সম্ভব নয়। এইজন্য চর্যাপদে মানবিক প্রেমের ফল্গুধারা তত্ত্ব-পাষাণভূমির কঠিন পবিবেশের মধ্যে ক্ষীণপ্রবাহ ও স্তিমিতগতি। চতুর্থ চর্যাপদে কবি বলেছেন--

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পিবমি ॥

—'হে যোগিনী, তোমাকে ছাড়া ক্ষণিকের জন্যও বাঁচব না। তোমার মুখ চুম্বন করে কমলরস পান করব।'

কাহ্নপাদ বলেছেন—

তো বিণু তরুণি নিরন্তর ণে হেঁ।
বো হি কি লব্ভই এণ বি দেহেঁ ॥

—'হে তরুণী, তোমার নিরন্তর প্রেম ব্যতীত এই দেহের দ্বারা কি বোধিলাভ সম্ভব?' আটাশ এবং পঞ্চাশ সংখ্যক চর্যাপদে দুটি চমৎকার গীতিকবিতা পাই। এক যুবক শবর এবং তার পত্নী এক যুবতী শবরী—তাদের দাম্পত্য জীবনচিত্র ও প্রেমলীলা চমৎকার কাব্যভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মীয় সাংকেতিকতা ও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও এই পদ দুটির সরলার্থে যে কবিত্বশক্তির উৎকর্ষ আছে তা বিস্ময়াবহ। আটাশ সংখ্যক চর্যাপদে—

নানা তরুবর মোউলিল রে গণিত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ নৈরামণি দারী পেক্ষা রাতি পোহাইলী ॥

—'নানা দীর্ঘ তরু মুকুলিত হল, তাদের ডাল আকাশ ছুঁয়ে আছে। কর্ণে কুণ্ডল

বস্ত্র ধারণ করে একাকী শবরী এ বনে বিচরণ করে। শবর তিন ধাতুর খাট পাড়ে, মহাসুখে বিছানা পাতে। শবর ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্মা স্ত্রী প্রেমে রাত্রি পোহায়।' পঞ্চাশ সংখ্যক চর্যাপদে কবি শবর শবরীর গার্হস্থ্যজীবন, গৃহের পারিপার্শ্বিকের নির্গসৌন্দর্য, আসব-প্রীতি এবং দাম্পত্য প্রেমলীলার বর্ণনা দিয়েছেন। প্রাচীনকালের এই কবিতায় প্রেমচিত্ররচনা কবির আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করছে। পাহাড়ের উপরে প্রায় আকাশের কাছে শবর শবরীর বাড়ি। আকাশে রাত্রির অন্ধকারে জ্যোৎস্নার ফুল ফুটে ওঠে। বাড়ির চারিপাশে ফোটে সুন্দর কাপাস ফুল। মাঠে কঙ্গুচিনা (একশ্রেণীর ধান) পেকে ওঠে। শবর শবরী তা থেকে মদ তৈরী করে। মদ্যপানে বিলাস-লীলায় উন্মত্ত হয় শবর ও শবরী। অনুদিন শবর একটুও জাগে না, মহাসুখে বিভোর হয়ে থাকে।

সরহের দোহাকোষে পাই—'জোইণি-গাঢ়ালিঙ্গণহি বজ্জিল লহু উবসন্ন'—যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গনেই বজ্রধর শীঘ্র উপসন্ন হন।

চর্যাপদ থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত প্রায় তিন শতাব্দীব্যাপী অন্তর্বর্তীকালে সাহিত্যে বাঙালীর জীবনচেতনার ধারায় এক শূন্যতার যুগ বর্তমান। চর্যাপদের যুগের দাম্পত্য প্রেমের গৃহাঙ্গন পার হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা পরকীয়া প্রেমের অবারিত রাজ্যে উপনীত হই। জয়দেবের কাব্যে কৃষ্ণ ও রাধা দেব ও দেবী। যদিও জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে 'হরিস্মরণ'এর সঙ্গে 'বিলাসকলাকুতূহল' এর সমন্বয় সাধন করেছেন এবং ঐ বিলাসকলা সেযুগের জনমানসের প্রেমচেতনার ধারাবাহী, তথাপি তাঁর কাব্যের বহিরঙ্গে এবং অন্তরঙ্গ কারুকর্মে পৌরাণিক দৈবীচেতনার সংমিশ্রণ রাধাকৃষ্ণপ্রণয়কথাকে সাধারণ মানব-জীবনের স্তর থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। পরবর্তী কালে প্রমথ চৌধুরী গীতগোবিন্দ কাব্যের তীব্র অশ্লীলতার সমালোচনা করলেও, মনে রাখতে হবে গীতগোবিন্দের প্রেমচিত্রণে জয়দেব দেবদেবীর প্রেমই চিত্রিত করেছেন, মানবিক প্রেমের স্পর্শ থাকলেও তিনি কাব্যের পাত্র-পাত্রীকে গোলোকবিহারী এবং সম্প্রতি মর্ত্যবিহারী বলে প্রথমেই উপস্থিত করেছেন। 'হরিস্মরণে' তিনি নারায়ণ তথা কৃষ্ণের দৈবী মহিমার কথা স্মরণ করেছেন। সুতরাং পরবর্তী কালে বিশ্বসাহিত্যে মানবিক প্রেমের দৈহিক ভিত্তির স্বীকৃতি যেমন অকুণ্ঠ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এবং তাতে যে দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে মননে আবেগে এবং শিল্প প্রকরণে জয়দেবের কাব্য তা থেকে পৃথক। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' রাধা প্রথম দিকে গ্রাম্য বালিকা—অতীব সুন্দরী, অজ্ঞাতযৌবনা ও প্রেমোপলব্ধি-অনভিজ্ঞা, বরং কলহপরায়ণা, তর্কে পটু এবং অবিদগ্ধা। কৃষ্ণ গোঁয়ার, গ্রাম্য রাখাল বালক, রাধার রূপমোহে অন্ধ, তার দেহোপভোগ বাসনায় অধীর, নীতিসংযমহীন এবং নিজের অলৌকিক শক্তি ও ভগবৎমহিমা সম্পর্কে অতি সচেতন। সুতরাং কাব্যে প্রথম দিকে স্বাভাবিক গ্রাম্যতা, স্থূলরুচিপূর্ণ প্রণয়লীলা ও দেহসম্ভোগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট কলহ মান অভিমান ও উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে রাধার চিত্তে প্রেমের উন্মেষ হয়েছে এবং যৌবনচেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছেদের জন্য দুর্ভাবনায় এবং বিরহের জন্য হাহাকারে তার হৃদয়াকাশ মথিত হয়েছে। কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিক শঠতা,



প্রবঞ্চনা এবং অ-প্রেমিক সুলভ দাম্ভিকতার যদিও কোন পরিবর্তন হয়নি, তথাপি রাধা চরিত্রের আমূল পরিবর্তন এবং রূপান্তর হয়েছে। চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলীকাব্যে রাধাচরিত্রে সর্বোচ্চ বৈষ্ণবীয় প্রেমানুভূতির যে ভাবধারা, তার যথার্থ পূর্বসূরী বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাপ্রেম। সাধারণ গ্রাম্য বালিকা থেকে রাধাচরিত্রের এই প্রেম-উদ্দীপিতা, বিরহ-সন্তপ্তা, প্রেমের জন্য গৃহসুখসংসার পরিজন ধনমান ও সর্বস্ব পরিত্যাগে প্রস্তুত প্রেমৈকবর্তিনী শ্রীরাধায় রূপান্তর বড়ু চণ্ডীদাসের অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচায়ক। একথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন, যুগমানসের লৌকিক প্রেমের পটভূমিতে অপার্থির প্রেমের অভীপ্সা মূর্ত হয়েছে শ্রীরাধার প্রেমে। পরবর্তীযুগে সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যে সর্ববিধ পরকীয়া প্রেমের তরুমূলে রাধাপ্রেমের এই প্রভাব অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো জলসিঞ্চন করেছে। কিশোর ও কিশোরী, যুবক ও যুবতী, স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমে পরকীয়া প্রেমে এত গোপনীয়তা, হৃদয়বিদারক লজ্জা, অকুতোভয় সাহসিকতা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বাধাবিপর্যয়, স্বল্প ও দীর্ঘবিরহের ক্ষণ ও দীর্ঘস্থায়ী বিরহদহনজ্বালা ও ক্রন্দন নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাপ্রেমের মধ্যেই বাঙালিজাতি প্রথম সার্থক নরনারীপ্রেমের মুক্তছন্দের স্বাদ পেয়েছে। কৃষ্ণ ও রাধা দেবদেবী, তাঁদের বিরহমিলনলীলা মানবমানবীর অনুরূপ—এই ছিল জয়দেবের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এটি সংস্কৃত পৌরাণিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ কবিবরের ঐতিহ্য-আশ্রয়ী প্রেমচেতনা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ ও রাধা বহুলাংশে মানব ও মানবী (কৃষ্ণের নিজস্ব ভগবত্তা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতনতা সত্ত্বেও) এবং এই কাব্যে মানবজীবনসম্ভূত অতি অশ্লীল দেহসর্বস্ব নিম্নশ্রেণীর প্রেমের স্তর থেকে ক্রমান্বয় কারুকার্যখচিত পার্থিব প্রেমের রসপর্যায়ের মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজালকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে বড়ু চণ্ডীদাস ক্রমে ক্রমে উন্নত অধ্যাত্মিক প্রেমের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছেন। যদিও একথাও স্বীকার করা প্রয়োজন যে, ধর্মীয় প্রেরণা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান প্রেরণা এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যধারা পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রধানতঃ ধর্মভাবনাপুষ্ট, তথাপি বাংলা সাহিত্যে মানবজীবনের স্বীকৃতি বা মানবস্বভাবের স্বাক্ষর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রথম স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। এজন্যই একথা বলা চলে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণপ্রেমে বাংলা সাহিত্যে মানবিক প্রেমচেতনার প্রথম সার্থক প্রবর্তন।

বড়ু চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণপ্রেমকে গ্রাম্য ভোগাসক্তি বা জনমানসের উপভোগ্য স্তরে নামিয়ে এনে মানবরসমণ্ডিত করেছেন। বিদ্যাপতিও রাজসভার মার্জিত জীবনচর্যা, রাজকীয় বিদগ্ধ রুচি ও রস-উপলব্ধির উপযোগী করে ঐ রাধাকৃষ্ণ-কথা অবলম্বনে পরিশীলন-কোমল সহৃদয় হৃদয়সংবাদী কাব্য রচনা করেছেন। এতে উন্নত রুচির মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ কাব্যাস্বাদ সৃষ্টি হয়েছে। চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মীয় ভাবাদর্শপূর্ণ বৈষ্ণব পদাবলী রচনার বহুপূর্বে বিদ্যাপতি তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত উন্নত প্রেমকবিতা রচনা করেছেন, যার প্রভাব পরবর্তী যুগে সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও বহু রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর মধ্যে কৃষ্ণকে দেহসৌন্দর্যবিলাসী নায়ক এবং রাধাকে সুচতুরা নায়িকারূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সংস্কৃত প্রেমকাব্য-ধারাবাহী এবং যুগজনরুচিসংস্পর্শসমন্বিত ঐ কাব্যধারায় মানবিক প্রেমানুভূতির সার্থক রূপকার কবি হিসেবে তাঁর এক অভ্রান্ত পরিচয়ও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যে দাম্পত্য প্রেমের পরিচয় সুস্পষ্ট। হরগৌরী, রামসীতা, সাবিত্রীসত্যবান ও নলদময়ন্তী—এই সর্বভারতে প্রচলিত পৌরাণিক প্রেমকাহিনীগুলি ও তাদের অন্তর্নিহিত দাম্পত্যপ্রেমসৌন্দর্যের মাধুর্য মঙ্গলকাব্যবিধৃত প্রেমকাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। মঙ্গলকাব্যে যে জনজীবনের আচার আচরণ, মানসিক প্রবণতার ধ্যানধারণা পরিস্ফুট হয়েছে তা'তে রাধাকৃষ্ণপ্রণয়লীলার প্রভাব কোন সুচিহ্নিত রেখাঙ্কন করতে পারেনি। সত্য বটে ফারসী-পড়া বিদগ্ধরুচি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল নাগরিক বৈদগ্ধে নানাস্থানে সমুজ্জ্বল, কিন্তু প্রাক্-ভারতচন্দ্রীয় মঙ্গলকাব্যে প্রধানতঃ গ্রামকেন্দ্রিক জনমানসের জীবনবৃত্ত তার আত্ম-উদঘাটন করেছে এবং তাতে গার্হস্থ্য জীবনগণ্ডীর বাইরে প্রেম কোথাও ব্যাপকতর ও উন্নততর অভীপ্সার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়নি। বেহুলা, ফুল্লরা, খুল্লনা— মঙ্গলকাব্যের সুপরিচিতা এই সব নায়িকারা গার্হস্থ্যজীবন ও স্বামীপ্রেমের পরিচিত বর্ত্মেই পদসঞ্চার করেছে—কোন অলৌকিক ভাববৃন্দাবনের আহ্বান ও আকৃতি তাদের জীবনে অনুপস্থিত। বৈচিত্র্য এসেছে একমাত্র বেহুলার জীবনে,—অবশ্য তা দুঃখসহনের তীব্রতায় ও করুণার আর্তিতে এবং জীবনমৃত্যুর সংগ্রামে তার অটল সহিষ্ণুতা, নির্ভীক তেজস্বিতা ও অপার জয়িষ্ণু চিত্তবৃত্তির অভ্রান্ত পারদর্শিতায়। দৈবের হাতে ক্রীড়নক হয়ে না থেকে মানবী তার দুঃখরাতের অভিসার শেষে যে পরমপ্রিয় স্বামীদেবতার প্রাণ-প্রত্যর্পণের দাবিতে স্বর্গ অভিযানেও বিরত হয়নি এতে মঙ্গলকাব্যের অবদমিত, নিপীড়িত জনমানসের কাব্যভূমিতে অবশ্যই মানবধর্মের মহিমা দীপ্ত শিখায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সমাজজীবনের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রেমের যে অনির্বাণ দীপ্তি উজ্জলতর মহিমা লাভ করে, উত্তর যুগের সাহিত্যভূমিতে যার সমাধান সর্বপ্রধান গুরুত্ব পেয়েছে,সে সম্পর্কিত কোন সমস্যা এতে না থাকায় বেহুলার প্রেম সর্বোচ্চস্তরের সাহিত্যমূল্যের বিচারের ক্ষেত্রে কোনকালেই দৃষ্টিআকর্ষণকারী গুরুত্ব লাভ করবে না। ফুল্লরার স্বামীপ্রেমের পরীক্ষা হয়েছে ছদ্মবেশিনী ভগবতীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। খুল্লনাও তীব্র দুঃখসহনশীলতার মধ্য দিয়ে তার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠা রক্ষা করেছে।

প্রেমে দুঃখ ও বিচ্ছেদ অনিবার্য। সেই 'রুক্ষ দিনের দুঃখ পাইতো পাব'—এ সত্য স্বীকার করে নিয়েই সহজ সরল মানবিক প্রাণপ্রবর্তনায় মঙ্গলকাব্যের নায়িকারা স্বামীর দুঃখের অংশভাগিনী হয়েছে, তার প্রবাসযাত্রা ও বিচ্ছেদ সহ্য করেছে এবং যুদ্ধে ও শাঠ্যষড়যন্ত্রে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, প্রীতি, ভক্তি, ধৈর্য ও সহনশীলতার মধ্য দিয়ে তাদের প্রেমের সুন্দর সার্থকতা দেখিয়েছে। জীবনাচারণে বৈচিত্রের অভাব এবং মানবিকতার স্ফূর্তির অভাব সত্ত্বেও মঙ্গলকাব্যের প্রেমচেতনা তৎকালীন জনমানসের নির্ভুল স্বাক্ষর বহন করে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যসুন্দরের নাগরিক রুচির স্বাতন্ত্র্য একে মঙ্গলকাব্যের পঙ্ক্তিতে অভিনবত্বের মর্যাদা দিয়েছে। বিদ্যাসুন্দরের পূর্বরাগের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তাতে নায়ক ও নায়িকা সমাজবিধি-বহির্ভূত গতিবিধির পথিপার্শ্বে রূপজ ও কামজ মোহের যুগ্মবৃন্তে প্রেমপ্রসূনের লীলাদ্যোতনা অনুভব করতে চেয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র সেই যুগের সামাজিক



বিধানের দুর্গপ্রাচীরের তলদেশে অবক্ষয়ের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে অসামাজিক প্রেমের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন। কাব্যশিল্পকলা এবং ভাষাছন্দ রসসৃষ্টি-কৌশলের অনস্বীকার্য নৈপুণ্যের প্রসঙ্গ উত্তীর্ণ হয়েও যে অতৃপ্তি পাঠকের অনুভূতিতে বিস্বাদ আনে তার মূলে লালসার অসংযম ও ভোগের আতিশয্য। বহিরঙ্গের প্রসাধনকলার সঙ্গে অন্তর-সুষমার সাধনবেগ মিশ্রিত না হওয়ায় এ কাব্যের প্রেমপুষ্প কলঙ্কধূলিমলিন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে বিচ্ছেদ-বেদনাতুর রামচন্দ্রের হৃদয়-বিদারণকারী বিলাপে প্রেমসুরভিপূর্ণ বিরহ-সংগীত বেজে উঠেছে। কিন্তু কাশীরামের মহাভারতে জীবনচেতনার স্বতন্ত্র ধাবা (বেদব্যাসকৃত মূল সংস্কৃত কাব্যেতর) নবচিহ্নাঙ্কিত প্রেমপ্রবাহ সৃষ্টিতে অপারগ।

ভারতীয় সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমচেতনায় রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর প্রভাব অপরিসীম। চৈতন্য-সমসাময়িক বৈষ্ণবকাব্যে রাধাকৃষ্ণ-কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু আভীর পল্লির গ্রাম্য প্রেমগাথা চৈতন্যজীবনের অপার্থিব দিব্যসৌরভমণ্ডিত প্রেমানুরাগের স্পর্শে অলৌকিক সৌন্দর্যমহিমা লাভ করেছে। তাঁর অবতারত্ব, তাঁর দিব্য মহিমময় প্রেমধর্ম, তাঁর আলোকসামান্য জীবনকথা ও তার প্রভাব তাঁর যুগ এবং উত্তরযুগের কবিসংঘের কাব্যউদ্যানে অজস্র সহস্রবিধ অধ্যাত্মচেতনা-জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল পদাবলী-কাব্য-পুষ্পবিকাশে সার্থক। এতে মানবিক প্রেমের স্থান কোথায়? বড়ো চমৎকার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!

বলেছেন—

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে।
.... এত প্রেম কথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।

(বৈষ্ণব কবিতা : সোনার তরী)

মানবিক প্রেমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্যাস থেকে রাধার প্রেম এসেছে। যা মানবহৃদয় থেকে উত্থিত নয়, তা যতই আধ্যাত্মিক হোক না কেন, মানবের চিত্তকে আলোড়িত করতে পারে না, আকর্ষণ করতে পারে না, মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে না। প্রেমের মধ্যে একদিকে সৌন্দর্য

ও সুখ অপর দিকে বিচ্ছেদ ও দুঃখ। প্রেমের প্রৌঢ় অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভবভূতি মনোহরণ সুন্দর প্রেমের অমৃত-উজ্জ্বল রূপটির পরিচয় দিয়েছেন—যা সত্যই এককালে ক্লাসিকাল এবং চিরন্তন—

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য—
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য.................

সুখে দুঃখে একরূপ, সর্বাবস্থাতেই অনুকূল, হৃদয় যাহাতে বিশ্রাম লাভ করে, বয়সে যাহার রসক্ষয় হয় না, কালক্রমে লজ্জা ভয় সংকোচ অপগত হইয়া যাহা পরিণত স্নেহসারে অবস্থিতি করে, সুমানুষের সেই....... প্রেম... (অনুবাদ ঃ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। প্রেমের স্পর্শ পাই তাঁর কাব্যে—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয় গণো

প্রেমের দহনও তাঁর কবিতায় বাঙ্ময়—

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকল কায়োমোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনুমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্ ॥

মিলনের মধ্যেও বিরহবেদনা-রাগিণীর সুর-ঝংকার বৈষ্ণব পদাবলী কাব্যে—

দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥ (চণ্ডীদাস)

আবার—

কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াহলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়া জুড়ন না গেল। (কবিবল্লভ)

এই যে অনুভূতির স্পর্শময় দহনপূর্ণ আনন্দময় ও বেদনাময় হৃদয়ভাব—এই প্রেম। প্রেম



ও বিরহ যেন আলো ও ছায়া। রৌদ্র আছে ছায়া নেই—এ যেমন অ-প্রাকৃতিক, প্রেম আছে বিরহ নেই —এও তেমন অ-মানবিক। প্রেমের মধ্যে একটি জলোচ্ছ্বাসের ভাব আছে—বাত্যার হিন্দোল আছেপৃথিবী-পরিপূর্ণ এক সুনিবিড় মধুরিমা ও সীমাহীন আকাশব্যাপী উদার দীপ্ত চন্দ্রকরোজ্জ্বল পারিপার্শ্বিকে মত্ত কলাবতী রাগিনীর সংগীতধ্বনি আছে। অথচ প্রেম একটি পুষ্পের মতো কোমল, হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিময়, অশ্রুর মতো বেদনাবহ, ছুরিকার মতো তীক্ষ্ণদীপ্ত, ইন্দ্রধনুর মতো বিচিত্র বর্ণবিভঙ্গপূর্ণ এবং মুক্তার মতো সংহত। প্রেমের এই দুই রূপ। একদিকে প্রেমে মানস-প্রেরণা, অপর দিকে তা নানা অনুভূতির রঙে রাঙানো জ্বলন্ত সত্য। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

সাঁঝ সকালে তালে তালে রূপসাগরে ঢেউ লাগে
সাদা কালোর দ্বন্দ্বে যে ঐ ছন্দে নানান রঙ জাগে।

প্রেমের বিচিত্ররূপের সংঘাতে বিচিত্র ভাবের সংঘর্ষে বিচিত্র বর্ণের বিচ্ছুরণে ও বিচিত্র ছন্দের নৃত্যঝংকারে পৃথিবীতে জাগছে সৌন্দর্য আনন্দ আলোক ও মাধুর্য। এই প্রেমের প্রবাহই মানুষের জীবনের নিত্যধারা-নির্ঝরিণী—নর ও নারীকে, মানব ও বিশ্বকে, ভক্ত ও ভগবানকে অনিবার্য তরল কোমল মধুর সুন্দর বেষ্টনে ঘিরছে, নব নব তরঙ্গে আন্দোলিত করছে, সীমাহীনতাকে বাঁধছে স্নেহের সীমানায়—প্রেমের অমৃতধারা তাই নিত্যবহমান।

ত্যাগ এবং তপস্যার মধ্য দিয়েই প্রেমের উচ্চতম ভাবলোকে পৌঁছানো সম্ভব। তপস্বিনী পার্বতীকে তপস্বিবেশী হর ছলনা করে বলেছিলেন—

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং
সমাগম-প্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবত
স্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥

—'পিনাকীর সঙ্গে মিলন কামনা করে দুইটি সম্প্রতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে—কমনীয় চন্দ্রকলা আর এই জগতের নয়নজ্যোৎস্নারূপিনী তুমি।'

উমা প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন—

মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্
—'তাঁহার প্রতি অনুরাগে আমি স্থিরচিত্ত'।

এই একাত্মতাবোধ প্রেমের অপর সুলক্ষণ।

বৈষ্ণবীয় প্রেমের শেষ কথা চণ্ডীদাসের রাধায়—তা অশেষও,—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু—

সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটিমাত্র শ্বেত-শতদল
আলোকে পুলকে করে ঢল ঢল
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর—
সলিল মাঝে!

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেছেন, 'কবিরা পৃথিবী আঁকিয়াছেন এবং স্বর্গও আঁকিয়াছেন—কিন্তু বৈষ্ণব কবিবা পৃথিবী ও স্বর্গ এক করিয়া দেখাইয়াছেন'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বৈষ্ণব গাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে, তাহা সমাজ। তাহা একাই সহস্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজ বাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ... . এই সর্বনাশী, সর্বত্যাগী, সর্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেমকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে না পারিলে কাব্যহিসাবে ক্ষতি হয় না, সমাজনীতি হিসাবে হইবার কথা।

"এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর মনে হইতে পারে। কিন্তু ফলত তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। মানব প্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মুলিত করিতে পারে না। তাহা কাজে কথায় কল্পনায় আপনাকে নানা প্রকারে ব্যক্ত করিয়া তোলে। তাহা একদিক হইতে প্রতিহত হইয়া আর-এক দিক দিয়া প্রবাহিত হয়। মানবপ্রকৃতিকে অযথা পরিমাণে এবং সম্পূর্ণভাবে রোধ করাতেই সমাজের বিপদ। সে অবস্থায় যখন সেই রুদ্ধ প্রকৃতি কোন-একটা আকারে বাহির হইবার পথ পায় তখনই বরঞ্চ বিপদের একটা লাঘব হয়। আমাদের দেশে যখন বন্ধবিহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ............... বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়োছেন।" কিন্তু রাধার জীবনে যা ঘটেছে— তার পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিমান, আর্তি, আক্ষেপ, বিরহ, অভিসার, তন্ময়তা, মিলনাকাঙ্ক্ষা—এ সমস্তই পরিশীলিত মানবমানবীর জীবনে সম্ভব। বৈষ্ণব কবির প্রেম ভাবনা অধ্যাত্ম-অনুভবরস-সঞ্জীবিত হলেও এবং তার পরিণাম কান্তাপ্রেম হলেও, তা অমূল কল্পলতা নয়, তার মূল-মানবচিত্ত মৃত্তিকার গভীরে। সুতরাং মানব জীবনে তার প্রভাব এবং প্রবাহ যে সার্থক হবে—এতে সন্দেহ নেই।



বাউল সঙ্গীতের ধারায় মানবিক প্রেমচেতনার প্রবাহ অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্গীত ঝংকারে মন্দ্রিত হয়েছে। বেদের আত্মোপলব্ধির সাধনা, বৈষ্ণবের কান্তাপ্রেম, সুফী ধর্মসাধনায় ভক্ত ও ভগবানের যথাক্রমে প্রেমিকা ও প্রেমিক-সম্পর্ক (মাশুক আসেক), কবীর দাদূ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকগণের শাস্ত্রীয় গণ্ডিবহির্ভূত স্বাধীন ধর্মচেতনা বাউলেব Universal Love বা বিশ্বপ্রেমমূলক ধর্মসাধনায় আপনাদের সুর মিলিয়েছে। বাউল গেয়েছে—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যেরে।
হারায়ে, সেই মানুযে তার উদ্দেশে
দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে।

বাউলের বিশ্বাস—

তোরই ভিতর অতল সাগর।

বাউল আবার বলেছে—

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ।

রবীন্দ্রনাথের রূপক ও সাংকেতিক নাটকে ও বহু সংগীতে বাউল গানের প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—"আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ-রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউলের সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের সুর ও বাণী কোনো এক সময়ে আমার মনের মধ্যে এত সহজ হয়ে মিশে গেছে।" বৈষ্ণব কাব্য এবং বাউল সংগীতে অধ্যাত্মতত্ত্বপ্রেরণা ছাড়াও এতে যে মানবহৃদয়ের প্রেমসুরভি মিশে আছে তার কথা অস্বীকার করা চলে না। সেই কখন সুস্পষ্ট বা কখন সূক্ষ্ম মানবিক প্রেমচেতনা রবীন্দ্রসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। বৈষ্ণব পদাবলী কাব্য বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে পরবর্তী কালের লৌকিক প্রেমগীতিকেও। কবিগান পাঁচালি তর্জা প্রভৃতি সংগীত কোন সাধন -সংগীত নয়—সাধারণভাবে তাদের সৃষ্টি হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলী এবং শাক্ত পদাবলী সংগীতের মধ্যে যে উন্নত ধর্মীয় চেতনার পরিচয় পাই কবিগানে তার অধ্যাত্মিকতা প্রায় বিসর্জিত এবং জনরুচি-অনুমোদিত সংগীত ধারাটুকু অবশিষ্ট মাত্র।

কবিগানে তিন ধারায়—উমা শ্যামা ও শ্যাম এবং মানবিক প্রেম বিষয়ের গান গাওয়া হত। এই শেষোক্ত ধারায় অর্থাৎ মানবিক প্রেমের গানে কবিরা ধর্মপ্রভাবহীন প্রেমের গান সৃষ্টি করেছেন। 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণবকাব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানত যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন তাহা অতি অযোগ্য। কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। .... তাঁহাদের আরও একটি রচনার বিষয় আছে,

স্ত্রী-পক্ষ এবং পুরুষ-পক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস-প্রকাশপূর্বক দোষারোপ করা; সেই শখের কলহ শুনিতে শুনিতে ধিক্কার জন্মে।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি-সংগীতের এহেন কঠোর সমালোচনা করলেও এক স্থানে একথা স্বীকার করেছেন—"স্থানে স্থানে সে সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে।"

১৩০৫ সালে অবিনাশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সংকলিত 'প্রীতি গীতি' নামক একটি সার্ধদ্বিসহস্র উৎকৃষ্ট প্রেমসংগীতে সমন্বিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই সংকলনে সম্পাদক প্রেমসংগীতকে দুই শত শ্রেণীতে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করে দেখিয়েছেন। এই সংকলনে কিছু কিছু উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তিসম্পন্ন প্রেমসংগীত পাওয়া যায়। কিছু কিছু উদ্ধৃতির সাহায্য নিলে দেখতে পাওয়া যাবে এতে প্রেমপ্রত্যয়ের প্রাচীন ধারার পথ পরিত্যাগ করে কিছু দৃষ্টিভঙ্গি গত পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিধুবাবু গেয়েছিলেন —

তুমি কি জানিবে আমার মন
মন আপনারে আপনি জানে না।

বাংলা সাহিত্যে রোমাণ্টিক কাব্যভাবনা আত্মপ্রকাশের বহুপূর্বেই নিধুবাবু প্রেমিকের মানসাভিসারকে কাব্যলোকের দুর্জ্ঞেয় রহস্যনিকেতনে প্রথম আহ্বান করে নিয়ে যান। শ্রেষ্ঠ কবিগানের ভাবতরঙ্গ প্রধানতঃ তিনটি প্রবাহে স্পন্দমান—

১। বিরহের ক্রন্দন ও বিলাপ, ২। মিলনের প্রত্যাশা, ৩। অনুতাপের জ্বালা ও স্মৃতিচারণা অথবা মিলনের ব্যর্থতা ও আক্ষেপ। বিরহের ক্রন্দন—

প্রাণ যারে চাহে সদা দোষেতে তারো কি করে
সতত অস্থির প্রাণ না হেরিয়া হয় যারে।

মিলনের প্রত্যাশা—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই জানিনে।
বিধুমখে মধুর হাসি আমি বড় ভালবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসিনে ॥

মিলনে ব্যর্থতা ও আক্ষেপ—

শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না।
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল।
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারই গেল।
তোমার পরের প্রতি নির্ভর আমিতো ভাবিনে পর,



তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।
কথা কও একবার কথা কও, তোল ও বিধুবদন,
পিরিত ভেঙেছে ভেঙেছে তায় লজ্জা কী?

আখড়াই, হাফ্ আখড়াই, টপ্পা ও পাঁচালি গানের ধারাতে 'বিরহ' পর্যায়ের গানে এবং সারি ভাটিয়ালি, জারি, তর্জা ও নানা পল্লীগীতিতে কবিগানে বিধৃত প্রেমচেতনাই প্রবাহিত হয়েছে।

নাথ-সাহিত্যে ময়নামতী বা গোপীচন্দ্রের গানে তত্ত্বের কঠিন মৃত্তিকার পার্শ্বে মানবিক আবেগের প্রবল প্রবাহ স্বচ্ছন্দচারী। কিন্তু এতে যে লৌকিক সমাজচেতনার ধারা প্রবহমান তাতে অর্ধ-সভ্য, অপরিণত সংস্কৃতি এবং আদিম সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনবোধই পরিস্ফুট হয়েছে। সুতরাং এই কাব্যধারায় যে প্রেমচেতনা তা অকৃত্রিম ভোগলালসা এবং অতি সহজ কামনাবেগ দ্বারা উদ্দীপিত, এতে সন্দেহ নেই—

অদুনা বলেন শুন প্রভু গুণমণি।
স্ত্রীলোকের স্বামী বিনে বিফল জীবনী ॥
নারীকুলে জন্ম যার নাহি প্রাণপতি।
চন্দ্র বিনে দেখে যেন অন্ধকার রাতি ॥

পুনশ্চ,—

অভাগীর স্বামী তুমি যাবে দুরান্তরে ॥
নব যৌবন প্রভু নিবেদেয় কালে।
যুগী হয় প্রাণের নাথ এই ছিল কপালে ॥
স্বামীর নিকটে রাণী এই কথা বলি।
ফেলায় গায়ের বসন বুকের কাচুলি ॥
যুগী হবে প্রাণের নাথ কি ধন পাবে নিধি।
এ সুখ সম্পদ তোমার বঞ্চিত হইল বিধি ॥

আরাকানের মুসলমান কবিগোষ্ঠির কাব্যধারায় প্রেমচেতনা কিঞ্চিৎ নতুন মোড় নিয়েছে। বৈচিত্র্য এসেছে বিচিত্র ভাষার ভাবসম্পদের ঋণগ্রহণে এবং নবোপলব্ধ প্রেমচেতনায় বৈষ্ণবীয় ভাবপ্রবাহের অনুত্তরঙ্গ স্রোতের সৌন্দর্যলীলার নবতাৎপর্য পরিগ্রহণে। দৌলত কাজীর লোর-চন্দ্রানী কাব্যকাহিনীতে লোর চন্দ্রানীর প্রেমপর্ব বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর ধারা অনুসরণ করেছে। ময়নামতীর বিরহপর্বের প্রেমভাবনা বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবধারা অনুসরণ করেছে—

মলিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥
শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর ॥

কোন কোন স্থানে দৌলতকাজীর প্রেমচেতনা আধুনিক যুগের মননশীলতার সহধর্মী। মালিনীর প্ররোচনার একস্থানে দেখা যায়—

যাহার হৃদয়ে নাহি প্রেমের সন্ধান।
রূপে নরাকৃতি সেই হৃদয় পাষাণ ॥
প্রেম প্রীতি দয়া মায়া কাম-নৃপ-সখা।
সে সকল মিত্র সঙ্গে কারো নাহি দেখা ॥

যৌন কামনাই যে সকল সূক্ষ্ম সুকুমার ও কোমল হৃদয়ানুভূতির ভিত্তিমূল—এই উক্তি দৌলতকাজির প্রেমবোধসম্পর্কে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চিন্তার ইঙ্গিতবাহী।

আলাওল-এর পদ্মাবতীকাব্য প্রেমকাহিনীর রূপকে অধ্যাত্ম সাধনার নিগূঢ় তাৎপর্যের পরিচয় বহন করে।

প্রেম বিনে ভাব নাহি, ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥

সংস্কৃত হিন্দী আরবী ও ফারসী প্রভৃতি বিচিত্র ভাষার কাব্যসম্পদ আরাকানের কবিগোষ্ঠীর কাব্য-প্রেরণার উৎসমূল। ফারসী সাহিত্যের সত্য ও প্রেমের আদর্শ, সূফীধর্মচেতনা, বৈষ্ণবীয় প্রেমাকৃতি, হিন্দী কবি সাধনের 'মৌনা সত' এবং জয়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের রোমাণ্টিক প্রেমের স্বপ্নসৌরভ আলোচ্য কবিগণের কাব্যভূমিতে লৌকিক প্রেমচেতনার চিরপ্রবাহিত অমসৃণ ধারাপথে নূতন প্রাণের তরঙ্গ ও সুবিচিত্র মধুরিমা এনে দিয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গগীতিকা কাব্যধারায় বাংলা সাহিত্যে ইতঃপূর্বযুগে অনাস্বাদিত প্রেম-চেতনার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পল্লীকেন্দ্রিক জীবনধারার মর্মমূলে যে আধ্যাত্মিকতা-স্পর্শশূন্য অথচ ভোগোন্মত্ততাবিবর্জিত প্রেম চিরন্তন কাল ধরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তার সহজ স্বচ্ছন্দ সুরসপ্তকের সব ধ্বনি ও সব ব্যাকুলতার মূর্ছনা বিকীর্ণ করে কাব্যবীণা বেজে উঠেছে। এই 'গীতিকা' কাব্যধারায় প্রেমই একমাত্র জীবননীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আমরা পুরাণে যে সতীত্ব মহিমার গুণকীর্তন শুনি, রাধাপ্রেমের মধ্যে যে পরকীয়া প্রেমের কথা জানতে পারি—তাদের কিছু কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য এই প্রেমের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু তাহলেও এই প্রেমের সহজ সরল মানবিক আবেদন চির পরিচিত অথচ চির বিস্ময়াবহ ঐশ্বর্যে সমুজ্জ্বল। কারণ, প্রেমচিত্রণে একমাত্র প্রেমকেই নিয়ামক মানদণ্ড



হিসাবে গ্রহণ করে তার দ্বারা প্রেমিক ও প্রেমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিনায়ক ও প্রতিরোধকারী সকলকে ঐ আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করে ভালো বা মন্দ রূপে দেখানো হয়েছে। বাইরের দিক থেকে সতীত্বের চিরপ্রচলিত আদর্শ নায়িকাকে কোথাও তীব্রভাবে প্রেরণা দেয়নি, বরং পূর্বরাগপুষ্ট প্রেমই সতীত্ব ও পবিত্র দাম্পত্যের মর্মমূলে অবৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের অভঙ্গুর শপথের রূপ নিয়েছে। সর্বসন্দেহবিঘ্নবিপত্তিপ্লাবী সর্ব দুঃখ জ্বালা বিচ্ছেদসহনশীল এবং স্বাধীন আত্মনিষ্ঠ আবেগ-অভিব্যক্তির প্রত্যয়ে বিশ্বাসী প্রেম এই কাব্যধারার চিরসৌন্দর্য-সুশোভিত চিরঅশ্রুপ্রবাহিত চিরমুক্তিপিয়াসী এবং কখনো গৃহাভিমুখী ও কখনো গৃহবিবাগী প্রেমিকজীবনের উন্মুক্ত রাজ্যে পার্থিব জীবনের লীলাক্ষেত্রে অন্তরসুষমার মিলনবিরহের আলো অন্ধকারে সংস্থাপিত বিচিত্রবর্ণ অপার্থিব সুরভিসমৃদ্ধ হৃদয়-নন্দনকানন-কুসুমের অনিন্দ্যসুন্দর বর্ণচ্ছটাকে প্রকাশ করেছে। প্রেমিকাদের জীবনাবেগের গভীরতা ও তীব্র চলমানতা, দেহসৌন্দর্য ও অন্তরসৌন্দর্য যেমন একদিকে তাদের বৈশিষ্ট্যকে সুচিহ্নিত করেছে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে অদম্য জীবনোল্লাস ও স্পর্ধিত দুঃসাহস তাদের অসাধারণত্বকে প্রকাশ করেছে। নারীর প্রেমস্বভাবের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি, সমাজ জীবনের গণ্ডিবদ্ধ পরিবেশে প্রেমের এহেন দিগন্তবিস্তারী প্রসার, সাধারণ নায়িকার মধ্যে মহাভাবস্বরূপিনী রাধার বিরহার্তির স্ফুরণ, নিসর্গ সৌন্দর্যের সঙ্গে রূপচেতনা ও প্রেমচেতনার আশ্চর্য সংমিশ্রণ—এই কাব্যধারার কবিদের আশ্চর্য শিল্পকুশলতার পরিচয় বহন করে। 'মহুয়া'তে নায়ক নায়িকাকে বলেছে—

তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।

'আন্ধা বন্ধু'তে নায়িকা বলেছে নায়ককে—

দুই অঙ্গ ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হইব।
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাহা না শুনিব।।
আমার নয়ানে বন্ধু দেখিবা সংসার।
অমন হইলে ঘুচবো তোমার দুই আঁখির আঁধার।।

মহুয়া, মলুয়া, কাজলরেখা ও চন্দ্রাবতী প্রভৃতি প্রণয়িনীদের অন্তর-ঐশ্বর্যের অলোকসামান্য দীপ্তি আলোচ্য পল্লীকাব্যধারার প্রেমপ্রবাহের তীরে তীরে আলোকবর্তিকার সৌন্দর্যচ্ছটা বিচ্ছুরণ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্য রেনেসাঁসের লক্ষণাক্রান্ত এবং আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবপ্রবাহে পরিস্নাত। রেনেসাঁসের লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মনস্বী সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন—'রেনেসাঁসের প্রথম লক্ষণ অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল।... দ্বিতীয় লক্ষণ অশঙ্কিত রূপভোগ সৌন্দর্যভোগ।... তৃতীয় লক্ষণ মানবের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস।' প্রধানতঃ এই লক্ষণগুলিই নবযুগের বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে প্রেরণাশক্তি দান করেছে। বাংলাদেশে আধুনিকতার সূচনা হয়েছে চারজন মনীষীর নবজাগ্রত সমাজ চেতনা, সাহিত্য চেতনা এবং স্বদেশ চেতনার মধ্য দিয়ে। এই

চারজন মনীষী হলেন—ডিরোজিও, রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল। ডিরোজিওর মধ্যে ছিল ফরাসি-বিপ্লবোত্তর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনের প্রভাব। 'সত্যানুসন্ধিৎসা' এবং 'পাপের প্রতি ঘৃণা, তাঁর কর্মধারা এবং সাহিত্যচিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রামমোহনের বিশ্বমানবতাবোধ—তাঁকে রেনেসাঁসের যথার্থ পুরোধা রূপে চিহ্নিত করেছে। তিনি বলেছিলেন—

'.....all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches.'

এ ছাড়া দেশের নানা শিক্ষা ও সমাজসংস্কার তাঁকে আগামী যুগের পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন এবং সতীদাহ প্রথার বিলোপ তাঁর প্রধান কীর্তি। কিন্তু আমাদের জীবনে তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দান বোধ হয়, মধ্যযুগীয় সমষ্টি-কেন্দ্রিক, সমাজ-প্রধান এবং পরিবার-ভারাক্রান্ত ব্যক্তিত্ব-অবলোপকারী জীবনধারা থেকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদ্‌ঘাটনে। ফরাসি বিপ্লবের মধ্য থেকে তিনি "Liberty'র নতুন তাৎপর্যকে গ্রহণ করে তাকে ব্যক্তিজীবনে স্থান দিলেন এবং তার ফলে ঐ 'Liberty'র দ্বারাই 'Equality' এবং 'Fraternity'র যথার্থ প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব, তার উপলব্ধি সহজ হল। বিদ্যাসাগর ছিলেন রেনেসাঁসের উত্তরসাধক। তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করলেন, বহু বিবাহকে ধিক্কৃত করলেন, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করলেন এবং দেশের শিক্ষা সংস্কারে কর্মোদ্দীপনার পরিচয় দিলেন। এলেন মাইকেল। বিদ্রোহী,—সকল অনাবশ্যক প্রাচীন প্রথা, সকল কুসংস্কার, সব জড়তা এবং সর্ববিধ অর্থহীন বাধা বাঁধনের বিরুদ্ধে নবযুগের কারামুক্ত অগ্রপথিক। সাহিত্যে আনলেন নবযুগের প্লাবন—পাশ্চাত্ত্যের জীবনকল্লোল বাংলার মন্দগামী জীবনপ্রবাহে নব নব তরঙ্গান্দোলন কম্পবেগ সঞ্চার করল। বাঙালি উপলব্ধি করল, 'আপনা হতে বাহির হয়ে বাহিরে দাঁড়া/প্রাণের মধ্যে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া।' নতুন জীবনবোধ জেগে উঠল। দেবতা গিয়ে স্থান গ্রহণ করলেন মন্দিরে, মানবসমাজে তিনি আর নিত্য ভয়মিশ্রিত অনুকম্পা বিলোন না। মানুষের পদে পদে দৈব নির্ভরতা ঘুচল, শয়তানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য, বাধাবিপত্তি ও সমস্যা সমাধানের জন্য দেবতার দুয়ারে ধরনা দেওয়া চিত্তদৌর্বল্য বলে বিবেচিত হল, ধীরে ধীরে আত্মশক্তিতে জেগে উঠতে লাগল মানবচেতনা। আত্মশক্তিতে ও সর্ববিধ স্বাধীনতা-স্পৃহায় পুরুষ এবং ব্যক্তিত্বে ও স্বাতন্ত্র্যে নারী নবযুগের নতুন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন সমাজে। এইভাবেই রেনেসাঁসের নবজাগ্রত মানববাদের সার্থক উত্তরণ সুচিহ্নিত হল।

সামাজিক ব্যঙ্গকৌতুকপ্রবণ ঈশ্বর গুপ্তের প্রেমের কবিতায় প্রায়ই রসসৃষ্টি হয়নি। তিনি দুই-এক স্থানে প্রেমের কথা গভীর করে বলার চেষ্টা করেছেন—যেমন,—

রহিল মনের খেদ মনেই আমার।
বুকের বিষয় নহে মুখে বলিবার।



এতে কবির ব্যক্তিহৃদয়ের যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হতে পেরেছে। রঙ্গলালের 'কর্মদেবী' কাব্যে কর্মদেবীর শৌর্যময় ধৈর্যময় চরিত্রের মধ্যে অপূর্ব প্রণয়োৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। নারী-ব্যক্তিত্বের সমুজ্জ্বল আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই চরিত্রে। মাইকেলের কবি-ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুটি ধারার সংমিশ্রণ অনুভব করা যায়—প্রথম, রেনেসাঁস লক্ষণাক্রান্ত পাশ্চাত্ত্য জীবনচেতনার নববহ্নিরাগ, দ্বিতীয়, বাঙালীর আবহমান জীবনবোধের প্রতি সুগভীর মমত্ব। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—তাঁর কাব্য প্রচেষ্টার অন্যতম দিক 'দেশীয় শিরা-ধমনীতে পাশ্চাত্ত্যের উষ্ণ-রক্ত-সঞ্চারের জন্য যন্ত্রণা ও অস্ত্রোপচার।' ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'হৃদয়পাশে বন্দিনী হইয়া যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহিতেছে সেই নারীই মধুসুদনের কাব্য-নাটকের নায়িকা।' শর্মিষ্ঠা , দেবযানী, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, বিলাসবতী, তিলোত্তমা, সীতা, প্রমীলা, 'ব্রজাঙ্গনা'য় রাধা এবং 'বীরাঙ্গনা'য় সব নারীই দাম্পত্য অথবা পরকীয়া প্রেমের ফাঁদে অথবা অদৃষ্টের ফেরে আবদ্ধ।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' রাধা চরিত্রে নবযুগের নারী-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার আগ্রহ ও স্বনির্ভর প্রেমচেতনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের নায়ক ও নায়িকাদের কাহিনী গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি ঐ কাহিনীসমূহের কাঠামো ও নায়িকাগণের চরিত্র ও মর্মবিশ্লেষণে এবং প্রেমচেতনার কাব্যসুষমামণ্ডিত রূপায়ণে রেনেসাঁস-প্রভাবিত পাশ্চাত্ত্য কাব্যসাহিত্যপ্রেরণা চিরন্তন ভারতীয় প্রেম-স্বভাবের মধ্যে নবভাববৈচিত্র্যের প্লাবনবেগ সঞ্চার করেছে। এই কাব্যে নারী-ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণে, নারীর ধর্মীয় অনুশাসন-শাসিত-জীবনচেতনারিক্ত স্বাধীন ও সংস্কারবর্জিত রোমান্টিক প্রেমিকাসত্তার অন্তর্দ্যোতনাচিত্রণে এবং সম্ভাব্যস্থলে সতীত্ব ও প্রেমিকাসত্তার দ্বন্দ্বে প্রেমিকাসত্তার উজ্জীবনে—যুগান্তকারী শিল্পস্বাতন্ত্র্যের অভ্রান্ত ও মর্মস্পর্শী স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়েছে।

যুবতী নারীর প্রণয়ের বিচিত্রমুখী লীলাচঞ্চল আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে শকুন্তলা, রুক্মিণী ও শূর্পণখার পত্রে। কৈকেয়ী, দ্রৌপদী, জনা ও ভানুমতী ইত্যাদির প্রণয়ের মান-অভিমান, ক্ষোভ, পরিবেশ পরিস্থিতি ও চরিত্রবৈচিত্র্যহেতু প্রেমভাবনার মধ্যে অনুযোগের সুরের নানাবিধ পার্থক্য কাব্যশিল্পের চমৎকারিতার উদাহরণ।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নারীর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের যে প্রকাশ, নারীর মর্যদার যে অভিনব মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে তার যথার্থ পূর্ব-অভিজ্ঞান ছড়িয়ে আছে প্রমীলা চরিত্রে। প্রমীলা এবং সীতা—উভয় চরিত্রেই রোমান্টিক প্রণয়াবেগের স্পর্শ আছে। ব্রজাঙ্গনার রাধা প্রাকৃত নায়িকা—চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিগণের সৃষ্ট রাধার সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। বীরাঙ্গনা কাব্যে তারা চরিত্রের বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলা সাহিত্যে এযাবৎকাল প্রচলিত প্রেমধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। প্রেমিকা নারীর এহেন বাগ্‌বিভূতি, প্রেমের এহেন অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ, প্রেমে দ্বন্দ্ব জটিলতা সত্ত্বেও আত্মপ্রকাশে এরকম সংশয়দ্বিধাহীন মানসিকতার প্রকাশ ইতঃপূর্বে ছিল অকল্পনীয়। তারা সোমদেবকে বলেছে—

এস শীঘ্র! যাব কুঞ্জবনে,
তুমি, হে বিহঙ্গরাজ, তুমি সঙ্গে নিলে!
দেহ পদাশ্রয় আসি, প্রেম-উদাসিনী
আমি! যথা যাও যাব! করিব যা কর;
বিকাইব কায় মনঃ তব রাঙা পায়ে!
কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে.
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।

মধুসূদনের সৃষ্ট তারা চরিত্র মহাভারতের তারা চরিত্র থেকে পৃথক। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের দেহসম্ভোগ-বাসনাময় প্রেমস্বভাবের রূপচিত্রণ ঘটেছে এই কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের দেবযানী চরিত্রেও তারার মতো ব্যক্তিত্ব ও আসঙ্গলিপ্সাবিজড়িত প্রেমচেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। তারার উগ্র কামনা তার মধ্যে লক্ষিত না হলেও প্রেমের দাবিতে সে অধিকতর প্রত্যয়শীল—

জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলক পাতে; তাই আজি হেন
স্পর্ধা রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়ো নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতী তীরে মোরা দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক কবির সৃজন...........

স্বতন্ত্রভাবে আরও একটি কথা মাইকেলের প্রেমচেতনা সম্পর্কে উল্লেখ্য,—তাঁর কাব্যে ও নাটকে রাধাকৃষ্ণপ্রণয়কথা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে।

কবি বিহারীলাল বাংলাকাব্যে এক নতুন সুর সংযোজন করলেন। তা তাঁর নিজস্ব ভাবতন্ময়তার বহিঃপ্রকাশে ব্যক্ত। বিশ্বনিখিলব্যাপ্ত সৌন্দর্যই সারদা। কবি-প্রেরণা, প্রেয়সী সঙ্গিনী এবং প্রাণশক্তির অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর বন্দনায় কবির কবিত্বশক্তির চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। প্রেমে সংশয় দেখা দিয়েছে কখনো—

তবে কি সকলি ভুল,
নাই কি প্রেমের মুল,
বিচিত্রগগন-ফুল কল্পনা-লতার?

মন কেন রসে ভাসে,
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?

রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের সরস্বতী প্রসঙ্গে শেলীর বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে স্মরণ করেছেন—

Thou messenger of sympathies,
That wax and wane in lovers' eyes.

বলেছেন—শেলীর এই দেবীই বিহারীলালে সরস্বতীর।

কাব্যে পার্থিব প্রেমের ভাবানুষঙ্গ থাকলেও, বিহারীলাল পার্থিব প্রেমের উর্ধে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের স্বপ্নসুষমাবিমিশ্র প্রেমধ্যানেই বিভোর—

কী এক ভাবেতে ভোর,
কী যেন নেশার ঘোর,
টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন—
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িমা জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গল গল মন।

মাইকেল-যুগাবসান এবং রবীন্দ্রযুগসূচনার মধ্যে প্রধান কবিগণ—হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারে' গার্হস্থ্য প্রণয়চিত্র আছে এবং নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী'তে সুভদ্রা অর্জুন শৈলজা ও জরৎকারু কৃষ্ণ প্রেমপর্বে ক্লাসিক কাব্যকাহিনীর পটভূমিতে রোমান্টিক প্রণয়োচ্ছ্বাস আছে। রবীন্দ্রপূর্ব গীতিকবিগণের মধ্যে প্রেমবিষয়ক কবিতায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দচন্দ্র দাস। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মহিলা' কাব্যে বিহারীলালের ভাবধর্মের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। নারীর সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি মননশীলতা ও ভাবসংযমের ক্লাসিকাল পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন। অক্ষয়কুমার বড়াল 'নারী বন্দনা'য় সুরেন্দ্রনাথের অনুসারী, 'এষা'য় পত্নী-প্রেমের গার্হস্থ্য রোমান্টিকতা দার্শনিকতা এবং বিষাদ-বিধুরতায় সমন্বিত। ওমর খৈয়ামের ভাবধারাপুষ্ট তাঁর কবিতা বাংলাকাব্যে প্রেমভাবনামূলক গীতিকবিতায় নূতন ঝংকার। দেবেন্দ্রনাথ সেনের দাম্পত্যপ্রেমের স্বভাবমাধুর্যের কবিতায় বৃন্দাবনের স্মৃতিসুরভি, বাংলার বাসন্তী পুষ্পবিকাশও আবির কুঙ্কুমের বর্ণবিহ্বলতা এবং সংস্কৃত ও বৈষ্ণব কবিগণের ভারসমন্বয়ের সুরে ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ব্যঞ্জনা-সংযোগ উনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতায় লক্ষণীয় বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে। শেক্সপীয়ারের নায়িকাদের নামে লিখিত সনেটগুলিও তাঁর রুচি-বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করে। নিবিড় প্রণয়, ভাবোচ্ছ্বাস ও নৈসর্গিক ঐশ্বর্যবৈভব তাঁর

কবিতার বিশেষ লক্ষণ—

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?
বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা ক'স্ হেসে হেসে,
জহুরির দোকানের পট খুলে যায়!
কোহিনুরে কোহিনুরে, আলো যে উথলি পড়ে!
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হীরায় মুক্তায়;
যেখানে দাঁড়াস তুই, জাতী, বেল, মল্লী, যুঁই
ফুটে ওঠে; পারিজাত শাখায় শাখায়;
সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আঙ্গিনায়!
শাখী নাচে, পাখী নাচে, কুহু-শব্দ প্রতি গাছে,
সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায়;
(যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায়?)

দু'একটি স্মরণীয় পঙ্‌ক্তিতে তাঁর কাব্যভাবনার ও প্রেমচেতনার আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া যায়—'মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে দুর্জ্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে, দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন' (দাও-দাও একটি চুম্বন)।

গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় প্রেমের দৈহিক ভিত্তির স্বীকৃতি বলিষ্ঠ ও অকুণ্ঠ। দেবেন্দ্রনাথ সেনের পরিণত শিল্পবোধ এবং প্রকাশমাধুর্য তাঁর কবিতায় বিরল হলেও তিনি সাবলীল এবং নিজস্ব ভাবপ্রকাশে নির্বারিতহৃদয়। গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যে অসংযত ও উগ্র দেহলালসার উত্তেজক পারিপার্শ্বিকে, প্রমত্ত ভোগ-বাসনার সুস্পষ্ট স্বীকৃতিতে এবং মধ্যে মধ্যে সুরুচির বিঘ্নসৃষ্টিকারী উক্তিতে তাঁর দেহাশ্রয়ী প্রেমচেতনার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়েছে। উন্নত কাব্যাঙ্গিক সচেতনতা, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতধর্মিতা, নিবিড় সংবেদনশীলতা ও লীলাচঞ্চল ব্যঞ্জনার সম্যক্ উৎক্ষেপ—শ্রেষ্ঠ কবিতার এই সমস্ত লক্ষণ তাঁর কাব্যে বিরল। তিনি স্মরণীয়—অসংযমকে আর্টে বাঁধবার প্রচেষ্টায় এবং বলিষ্ঠ দেহভোগবাদকে কাব্যে উপস্থাপনায়—

আমি তারে ভালবাসি অস্থিমাংস সহ,
সকলি অমৃত তার—মিলন বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা
দেহ ছাড়া প্রেমকথা
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ।

অপর দিকে বিশ্বকে জানবার অপরিসীম মধুর ঔৎসুক্য। দ্বিতীয় পর্বে, সমাজজীবনে প্রেমের পরিণাম। শেষ পর্বে, আধুনিক জীবনপটভূমিকায় প্রেমের বিচিত্র রূপ। প্রেমে জটিলতা, বিবাহোত্তর প্রেম, সতীত্ব ও নারীত্বের স্বতন্ত্র মর্যদা—ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। দেহ ও আত্মার বিরোধ রবীন্দ্রপ্রেমসাহিত্যে তীব্র হয়ে দেখা দেয় নি। তিনি 'লালসার অসংযম'কে কখনোই চিত্রিত করতে চান নি,—অথচ বাসনাকে অস্বীকার করার উপায় নেই এবং এজন্যে তিনি দেহের বস্তুরূপকে ভাবাদর্শে উন্নীত করতে চেয়েছেন। কদাচিৎ তাঁর সাহিত্যে দেহের প্রবল কামনার কথা এসেছে এবং শেষজীবনের সাহিত্যে তার স্বীকৃতিও স্পষ্ট, তথাপি তিনি নিরাবরণ বর্ণনাকে এড়িয়ে গিয়ে ইঙ্গিত-ধর্মী ভাষার সাহায্য নিয়েছেন। রোমাণ্টিক প্রণয়স্বপ্ন, নারীর পূর্বরাগ, পুরুষের আবেগ ও চিত্তদ্বন্দ্ব, নারীপুরুষের অবারিত মিলন, স্বামী বা স্ত্রীর অপর নারী বা পুরুষের সঙ্গে প্রেমে বিক্ষোভ, বিকৃতি, আর্তি ও জ্বালা সবই আছে; কিন্তু সবকিছুকে ঘিরে জ্যোর্তিমণ্ডলের মতো দীপ্ত হয়ে আছে সুস্মিত ও শালীন, অসামান্য ও বিশ্বব্যাপ্ত নন্দনতাত্ত্বিক সৌন্দর্যচেতনা। এখানেই বাংলা সাহিত্যের পূর্বযুগের ও উত্তরযুগের সাহিত্যিকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর গোবিন্দলাল, 'ষোড়শী'র জীবানন্দের থেকে 'যোগাযোগে'র মধুসূদনের পার্থক্য এইখানে যে, মধুসূদন দাম্পত্য-প্রেমের ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রথম থেকেই আত্মসচেতন এবং কোন ব্যাপারে হতাশ হয়ে না যাওয়া তার স্বভাব বলে সে বলপ্রয়োগ করেও সার্থক হবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। সুতরাং, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাবলোকে সেও বিপরীত দিক দিয়ে সৌন্দর্যরসিক।

তাঁর সময় থেকে বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের অংশ হয়ে উঠেছে। আধুনিক বিশ্বমানবচেতনার অংশীদার তাঁর সৃষ্ট নরনারী। এমনকি তিনি যেখানে মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যকাহিনীর চরিত্র নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও আধুনিক জীবনচেতনা, আধুনিক মানসিকতা ও দ্বন্দ্বজটিল পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন।

তাঁর প্রেমাদর্শ ও প্রেমভাবনা সবিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। তিনি প্রেম সম্বন্ধে যা ভেবেছেন ও বলেছেন তার সংক্ষিপ্তসার রচনার প্রয়াস বোধ হয় এ প্রসঙ্গে অবান্তর নয়—

১. প্রেম—দেহ ও আত্মার সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলনে।

২. প্রেম দুঃখময়—দুঃখ-দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ মানসোৎসার।

৩. 'ভালোবাসা'য় আত্মসমর্পণ, 'ভালোলাগা'য়—সম্ভোগবাসনা।

৪. আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্খা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন, গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালোবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছেShelley-র Skylark আর একটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্তসুধা প্রার্থনা করছে, আর একজন অনন্তসুধা দান করছে।............... যে ভালোবাসে সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালোবাসে; সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা-সহিষ্ণুতা

প্রেমের আবশ্যক আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা।'

৫. প্রণয়ের সার্থকতা--পরিণয়ে, গৃহবন্ধনে, সন্তানজন্মে ও সর্বত্র কল্যাণপূর্ণ অন্তরমাধুর্য বিকিরণে।

৬. সংসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবপরিবেশের সঙ্গে সংস্পর্শযুক্ত প্রেমই শুভ পরিণাম আনতে পারে, কেবলমাত্র নির্জনতাবিলাসী প্রেমিক প্রেমিকার আত্মরতিই পূর্ণাঙ্গ প্রেম নয়।

৭. প্রেম ও ধর্মের একত্র সহাবস্থানেই মঙ্গল। যে প্রেম হঠাৎ কামনাবেগ প্লাবনে সব ভাসিয়ে নেয়, তার শক্তি আছে; কিন্তু তার পরিণাম শুভ নয়। তপঃ পূত প্রেমই স্থায়ী আনে এবং তা সার্থক।

৮. 'ত্যাগের সহিত প্রেমের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, ত্যাগ ছাড়া প্রেম হয় না, প্রেম না থাকিলে ত্যাগ করাও যায় না।'

৯. দেহভোগবাসনার প্রবলতা অস্বীকৃত; প্রেমের যথার্থ স্থান মানসিক সংবেদনায় ও আত্মিক সৌন্দর্যনিলয়ে।

১০. 'মানব বুভুক্ষার আদিম প্রেরণা নয়', অন্ধ ধমনীর স্থূলত্ব নয়, প্রজ্ঞা ও মননশীলতার আলোকে উদ্ভাসিত প্রেমই মহার্ঘ।

১১. 'নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র বসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায় তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে।'

১২. 'নর-নারীর প্রেমের এই যে একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তিবলে সে মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্রসূর্যতারা পুষ্পকানন নদনদীকে এক সূত্রে টানিয়া মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে আপনার চতুর্দিকে সাজাইয়া আনে................। কাব্যের পক্ষে এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। ইহা একই কালে সুন্দর এবং বিরাট, অন্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী, লৌকিক এবং অনির্বচনীয়।'

১৩ স্বভাবতঃ যিনি অসীম তিনি সীমার মধ্যে ধরা দেন আনন্দরূপে, স্বভাবতঃ যিনি নির্গুণ তিনি সীমার মধ্যে ধরা দেন সৌন্দর্যরূপে এবং স্বভাবতঃ যিনি নির্বিকার তিনি সীমার মধ্যে ধরা দেন প্রেমরূপে।

১৪. 'জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড় করে দিয়ে যায়।'

১৫. প্রেমের একদিকে 'প্রসাধন কলা', অপরদিকে 'সাধনবেগ'।

১৬. নারীর তিন রূপ—'একজাত প্রধানত মা', 'আর একজাত প্রিয়া' এবং এছাড়া

আরও একশ্রেণীর প্রেমময়ী মাধুর্যময়ী অথবা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যে মেলে।

কবি বলেছিলেন, 'আমি ভালবাসি অনেককে—কিন্তু মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে'। 'সোনার তরী'তে সেই 'মানসী' 'মানসসুন্দরী' কবিতায় বিশ্বব্যাপ্ত ভাবস্বপ্নসৌন্দর্যময় 'বিশ্বের কবিতা'—সে 'কখনো বা ভাবময় কখনো মুরতি'। মানবিক প্রেমচিত্র রচনায়ও এই কবিতা সার্থক—

ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহ্নিী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

'চিত্রা'য় 'উর্বশী কবিতায় বিশ্বসৌন্দর্যকে 'নারীরূপের আবরণে' আবৃত করা হয়েছে। তার উদ্দেশে বলা হয়েছে—

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ববাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছে তোমার
অতি লঘুভার।

কিন্তু সে, 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ'। কিন্তু যে প্রেয়সী একদিকে রাত্রের নর্মসহচরী, সে-ই প্রভাতে অন্যরূপে 'মঙ্গলময়ী মুরতি', 'দেবী'। তার কথা 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায়। রবীন্দ্রকবিচেতনায় নারীর উর্বশী ও লক্ষ্মী—এই দুই রূপচিন্তা এই সময় থেকেই পরবর্তী যুগের কাব্যে ও কথাসাহিত্যে প্রসারিত হয়েছে। 'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় প্রেমের জ্যোতির্ময় মহান্ রাজশ্রী,—সেই প্রেমে 'লাবণ্যের নাহি পরিসীমা'। পুরুষ ও নারীর চোখে স্বপ্নাঞ্জন লিপ্ত করে প্রেম হৃদয় বিনিময়ের লীলাক্ষেত্র রচনা করে। 'চৈতালির'র 'মানসী' কবিতায় নারী—'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা'। 'বলাকা'য় 'শা-জাহানে' সম্রাটের যে কালোত্তীর্ণ সৌন্দর্যস্বপ্নবিধুর প্রেমস্মৃতি, লৌকিক জীবনে তারই সমধর্মী স্মৃতিচারণা পূরবীর 'লীলাসঙ্গিনী'তে। নারীর মুক্তির বাণী, প্রেমিকারূপের স্বতন্ত্রমহিমা ও তীক্ষ্ণ আত্মবিশ্লেষণ শুরু হয়েছে 'পলাতকা' কাব্যে। 'মুক্তি' ও 'নিষ্কৃতি' প্রভৃতি কবিতায় তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। 'মুক্তি' কবিতায়—

আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণার নিদ্রাবিহীন শশী।

আর—

চায় সে আমার কাছে

আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।

পুনশ্চ—

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী

... ...

দাও খুলে দাও দ্বার

'মহুয়া'তে প্রেমের সঙ্গে উজ্জ্বলতর জীবনচেতনার সংমিশ্রণ। এতে আছে প্রেমের প্রসাধন ও সাধন—দুইয়েরই পরিচয়। কখনো বা লালসাকে অগ্নিদগ্ধ করে, মুগ্ধললিত অশ্রু-গলিত গীতকে পরিহার করে, 'ক্লেদঘন চাটুবাক্য'কে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছে দীপ্তশিখা প্রেমের অজেয় বন্দনা। নরনারীর মত্তমদির প্রেমের আবেগবিহ্বলতা, নারীর ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্য ও শক্তি, মর্মসঙ্গিনী ও ব্রতপালনে সহায়িকা নারীর তেজস্বিতা, পুরুষের কর্মসহচরী ও প্রেরণাদায়িনী চিরন্তনী নারীর মালিন্যমুক্ত শ্রী, পুরুষের আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব, নারীর প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অঙ্গীকার—এই কাব্যের মুক্তিপ্রয়াসী প্রেমের ভাবরাজ্যে পূর্বযুগবাহিত প্রেমচেতনায় নব নব বৈচিত্র্য ও বিস্ময় সঞ্চার করেছে। 'পুনশ্চ'তে 'সাধারণ মেয়ে'র মধ্যে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাহসিকতা ও প্রেমে সফলতার আকাঙ্ক্ষা প্রস্ফুটিত হয়েছে 'শ্যামলী'তে 'দুর্বোধ' কবিতায় 'নবনী' চরিত্রে তার স্বতোভাস্বর আত্মপ্রকাশ। কবি বলছেন—

কেউ বলেছে, বাঙালির মেয়েকে
লেখক এগিয়ে নিয়ে চলেছে
ইবসেনের মুক্তিবাণীর দিকে;
কেউ বলেছে রসাতলে।

বিশ্বসাহিত্যে 'ইবসেনের মুক্তিবাণী' নারীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে; রবীন্দ্রসাহিত্যেও নারী বিশ্বনারীত্বের লীলাসংগমে পথসঞ্চারিণী।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে ও গদ্যনাটকে প্রেমের নানাবিধ দ্বন্দ্বজটিলতা বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে রাজা ও রানী, তপতী, চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, চণ্ডালিকা, শ্যামা ও বাঁশরীতে। 'তপতী'তে সুমিত্রা ও বিক্রমের সম্বন্ধের মধ্যে বিরোধ ছিল। বিক্রমের প্রচণ্ড আসক্তিই ছিল সুমিত্রার প্রেমকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার অন্তরায়। সুমিত্রা কেবল রাজার প্রেয়সী নয়, সে 'লোকমাতা'ও—এইখানেই প্রেমে ও কর্তব্যে দ্বন্দ্ব। 'বিদায়-অভিশাপ' এর কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা'য় চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের মধ্যে রয়েছে 'অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়।' সে স্বামীর কাছে চেয়েছে নারীর রূপলাবণ্যের গরিমা ব্যতীত নারীব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্র মর্যাদা। নারীর যথার্থ মূল্য চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে চিরন্তন কালের সত্যভাষণে উজ্জ্বল মহিমা লাভ করেছে। নারী দেবী নয়, খেলার পুতুলও নয়, চারিত্র্যশক্তিতে সে সত্যই পুরুষের জীবনের অংশভাগিনী হতে পারে, এই তার আত্ম-অবিষ্কার। 'চণ্ডালিকা'য়'



বলেছেন, 'ধরার মানুষ আমি ভাই মহাকামী।' (আমার ভালবাসা)। দেবেন্দ্রনাথের মতোই তিনি গার্হস্থ্যপ্রেমের মিলন ও বিরহকে অবলম্বন করেছেন। তথাপি 'দেহছাড়া প্রেমকথা'র অস্বীকৃতিতে বাংলা প্রেমকবিতায় এক নতুন সুর সংযোজনের চিহ্ন এখানে স্পষ্ট হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং গোবিন্দচন্দ্র দাসের দেহবাদী প্রেমাদর্শ পরবর্তীকালে মোহিতলালের কাব্যে নবনির্মিত কাব্যশিল্পে উত্তীর্ণ হয়েছে।

'ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলনে' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় প্রেমকবিতাকে চারটি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন—(ক) গার্হস্থ্য, (খ) ইন্দ্রিয়াশ্রিত, (গ) আদর্শায়িত এবং (ঘ) প্লেটোনিক।

বাংলা প্রেমের কবিতার দুটি স্বতন্ত্র ধারা স্পষ্টই লক্ষণীয়। বিহারীলালের কাব্যে যে প্রেম আনন্দময়, কল্পনাবেশ এবং অতীন্দ্রিয় ভাবাকুলতার মধ্যে স্বপ্নপুষ্পবীথির সৌরভপিপাসী, রবীন্দ্রসাহিত্যে তার মননশীল, হার্দ ও মানবিক রসমাধুর্যময় বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনায় যে প্রেম—রেনেসাঁস - প্রভাবিত নারীজাগরণ এবং নারী - বন্দনায় অনুপ্রাণিত, পাশ্চাত্ত্য - জীবনভূমি থেকে উৎসারিত—তার প্রভাব ও প্রেরণা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার থেকে গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং উত্তরকাল পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এবং পূর্ণাঙ্গভাবে বলতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সর্ববিধ প্রেমচেতনার সহস্রবিধ সার্থক বিকাশ রবীন্দ্রসাহিত্যে।

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ মহিলা কবিদের কবিতায় নারীকণ্ঠে নারী-আত্মার জাগরণ-সংবাদ প্রথম বাংলা কাব্যভাষায় বিঘোষিত। পুরুষের কণ্ঠ থেকে নারীহৃদয়বাণী শুনতে চাওয়া অপেক্ষা নারীকণ্ঠের স্বভাষিত উক্তি শুনতে চাওয়ার প্রবণতা স্বাভাবিক। এই দিক দিয়ে তাঁদের কবিতায় প্রধানতঃ বিষাদপূর্ণ আবেগবিহ্বলতা এবং কখনো কখনো আত্মনিবেদিত প্রেমভাবনার সূক্ষ্মসুকুমার গীতি-প্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গার্হস্থ্য প্রেমবিষয়ক কবিতার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়াশ্রিত প্রেমকবিতায় —প্রধানতঃ প্রেরণা এসেছে বায়রন, শেলী, কীট্‌স্‌ প্রমুখ ইংরেজ কবিদের রূপচেতনা ও ইন্দ্রিয়তন্ময়তা থেকে। এই শ্রেণীর কবিতায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' মাইকেল, বলদেব পালিত, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগণ বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

আদর্শায়িত প্রেমকবিতায় 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে বিহারীলালের যাত্রা শুরু এবং তারপর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রমুখ কবিগণ এই ধারায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। 'নারীর মতন সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা' (বঙ্গসুন্দরী)—এই মর্ত্যেই আছে, সুতরাং স্বর্গে আর প্রয়োজন কি?—এই চেতনা কবিদের এই পর্বের কাব্যধারায় প্রেরণা সঞ্চার করেছে। অক্ষয়কুমার বড়াল যখন বলেন, 'মানবীর তরে কাঁদি যাচি না দেবতা'

(এযা)—তখন তা বিহারীলালের সার্থক প্রেরণাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 'চিত্রাঙ্গদা'য় রবীন্দ্রনাথের নারী-আত্মার রহস্য সন্ধান, ক্ষণিকার 'কল্যাণী' কবিতায় নারীর কল্যাণময়ী রূপের বন্দনা, 'মহুয়া'র নাম্নী কবিতাগুচ্ছে নারীরূপের বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ প্রয়াস এবং 'নির্ভয়', 'দায়মোচন' ও 'সবলা' প্রভৃতি কবিতায় প্রেমসম্পর্কে নারীর আত্মপ্রত্যয়ের সুর আদর্শায়িত প্রেমকবিতা প্রবাহে আকাঙ্খিত উত্তরণ সম্ভব করেছে। মহিলা কবিগণের মধ্যে সরোজকুমারী দেবীর কবিতায়ও এই আদর্শায়িত প্রেমের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় এবং রবীন্দ্রভাবনার সাদৃশ্য তাঁর কবিতায় বিশেষ লক্ষণীয়। নারীপ্রেমের মাধুর্য, নারীরূপের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জগতে ও জীবনে নারীর অনিবার্য ও অসংকোচ সাহচর্যসুন্দর আনন্দলোক সৃষ্টিপ্রয়াস আলোচ্য কবিগণের কবিতায় নারীরূপরহস্য উদ্‌ঘাটনে ও নারীবন্দনায় প্রেরণা সঞ্চার করেছে।

প্লেটোনিক প্রেমের ভাবধারা এসেছে শেলী প্রমুখ ইংরেজ কবিদের নিকট থেকে। প্লেটোর প্রেম সম্পর্কে ধারণা হচ্ছে, প্রেম আধ্যাত্মিক শক্তি ও মানসিক সৌন্দর্যবিশিষ্ট বিশ্বনীতি। শেলীর প্রেমচেতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে C.M. Bowra বলেছেন যে, শেলীর নিকট প্রেম—

'It stands in its own category and is a principle of action subject to nothing but itself. This is of course much more than even Plato attributed to love. It is Shelly's mature conception of the force which he had once seen at work in the physical universe and now saw at work in the realm of spirit; (The Romantic Imagination.)

বাংলাকাব্যে চেতনামানসআত্মা-বিহারিণী জ্যোতির্ময়ী অনন্ত - সুষমা - বিভূষিতা ও বাস্তবজীবনাতিরিক্ত শক্তিমাহাত্ম্য-সম্পন্না এই প্রেমপ্রতিমার দিব্য আরাধনার সূচনা বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসনে' এবং সমাপ্তি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যে প্রেমচেতনার নতুন রূপ উন্মোচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার মূলে ছিল একটি প্রবল অভিপ্রায়—নতুন যুগের পাঠকের চিত্তে সাহিত্যরস-পিপাসা জাগ্রত ও পরিতৃপ্ত করা। এজন্যে তিনি রোমান্সের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর যে সমস্ত উপন্যাসের পটভূমি ইতিহাস সেগুলি হচ্ছে—দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, রাজসিংহ, কপালকুণ্ডলা ও চন্দ্রশেখর। তিলোত্তমা-জগৎ সিংহ প্রণয়কাহিনী পূর্বরাগপুষ্ট। আয়েষা ভালবাসত জগৎ সিংহকে—জগৎ সিংহ তিলোত্তমাকে। সুতরাং, জটিলতা প্রায় নেই। 'মৃণালিনী' ও 'রাজসিংহে' নায়িকার প্রেম একমুখী—সুতরাং প্রেমে দ্বন্দ্ব নেই। 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারের একাধিক পত্নীর জীবনদ্বন্দ্ব আছে, মতিবিবির দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ই প্রেমে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। একমাত্র 'চন্দ্রশেখরে'ই ত্রিভুজ প্রেমের রূপরীতি আছে। শৈবলিনী আধুনিক নারীর সমস্ত জীবনজিজ্ঞাসা নিয়েই যেন পাঠকের সামনে উপস্থিত। বিবাহিত নারীর স্বামী ছাড়া অপর পুরুষকে ভালোবাসার অগ্নিচ্ছটা ও পাপপ্রণয়ের প্রায়শ্চিত্তের ধূম্রোচ্ছ্বাসের চিত্ররচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পদক্ষতা অসামান্যভাবে ভাস্বর। যে



'ত্রিভুজ দ্বন্দ্বে'র চিত্র এতে আছে বঙ্কিমসাহিত্যে তা অনন্য। শৈবলিনীর আত্মপ্রকাশ নারীর প্রেমসম্পর্কিত অধিকারসচেতনতার স্বাক্ষর বহন করে। স্বামী সম্বন্ধে সে বলেছে, "তাঁহাকে আমি কখনও ভালবাসি নাই— কখন ভালবাসিতে পারিব না"। সামাজিক বিধিনিষেধের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সে অনিবার্য ও অকুণ্ঠ প্রেমের তীব্র দহনকে প্রকাশ করেছে,—প্রতাপকে প্রশ্ন করেছে—"কেন তুমি তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়েছিলে? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন?" শৈবলিনী প্রায়শ্চিত্তও করেছে, প্রতাপ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তরের মণিকোঠায় প্রেমের স্বীকৃতি দিয়েছে,—কিন্তু শৈবলিনীর জীবন-অতৃপ্তি আমাদের কাছে এক বিপুল জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বার খুলে দিয়েছে।

পারিবারিক জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি হচ্ছে—বিষবৃক্ষ, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল। বিশেষতঃ 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমচন্দ্রের নরনারীর প্রেম সম্পর্কে মনোভাব, সমাজনিষিদ্ধ প্রেম সম্পর্কে ধারণা ও সিদ্ধান্ত এবং তাঁর সময়ের বাংলাদেশের সামাজিকনীতি ও তাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে তাঁর শিল্পী ও সংস্কারক হিসেবে মনোভাব আলোচিত হতে পারে। নগেন্দ্রের প্রতি কুন্দনন্দিনীর এবং গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রেম সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য,—এই প্রেম সমাজবিধি-বহির্ভূত অথচ বিশেষ সত্য। দ্বিতীয় বক্তব্য,—এই প্রেম সামাজিক নীতির দিক দিয়ে কোনভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, সামাজিক দিক দিয়ে নগেন্দ্রের উপর সূর্যমুখীর এবং গোবিন্দলালের উপর ভ্রমরের অধিকার কি হিসেবে উপেক্ষণীয় হতে পারে? কেবল সমাজনীতির দিক দিয়ে নয়, আর্টের দিক দিয়েও বিচার করলে—নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনী এবং গোবিন্দলাল-রোহিণীর মিলন এবং শুভ পরিণামমুখী সার্থক প্রেম কি সম্ভব ও শোভন? তৃতীয়তঃ, কুন্দনন্দিনীর বিষপান ও রোহিণীর পিস্তলের গুলিতে মৃত্যু আকস্মিক হলেও অসঙ্গত নয়। হীরার শেষ পরিণাম অপেক্ষা তাদের শেষ পরিণাম অবশ্যই গৌরবজনক। চতুর্থতঃ, বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙালি সমাজের জীবননীতি উপন্যাসের শিল্পপরিণামকে প্রভাবিত করেছে।

অনুশীলনতত্ত্ব-প্রণোদিত উপন্যাসগুলি—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী ও সীতারাম। বঙ্কিমচন্দ্র এই সমস্ত উপন্যাসে হিন্দুর ধর্মীয় নীতির ওপর স্থাপন করে প্রেমকে বিশ্লেষণ করেছেন। ধর্মীয় তত্ত্বে নারীর মোহিনী মায়ার ওপরে বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। নারীরা পুরুষকে প্রলুব্ধ করে, নারীর রূপে পুরুষ মুগ্ধ হয়, দাম্পত্য সম্পর্ক ছাড়া নারীপুরুষের অবাধ মিলন সঙ্গত নয়—এমন যে সমস্ত প্রচলিত চিন্তা আছে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে উপন্যাসে এনেছেন। দেখিয়েছেন, এই নারীর মায়া থেকে আনন্দমঠের সন্ন্যাসী ভবানন্দেরও নিষ্কৃতি নেই। সীতারামের প্রবল রূপমোহ শেষপর্যন্ত তাকে নিজের স্ত্রী-কে না পাওয়ার ব্যর্থতায় নিন্দনীয় ইন্দ্রিয়লালসার দিকে ঠেলে দিয়েছে। রমার প্রেম অবৈধ নয়,—কারণ সচেতনভাবে সে অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় দেয়নি। দেবী চৌধুরানী'তে প্রফুল্লের দাম্পত্য প্রেমপূর্ণ নারীত্বই তার সর্বগুণপনার সৌন্দর্য ও সর্বধর্মতত্ত্বের অলঙ্কারসহ প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রেমের

এই ধরনের বিশ্লেষণে সহজ প্রণয়াবেগের লীলাকে যেন পদে পদে থামিয়ে দিয়ে তার গতি-উচ্ছলতা ও আনন্দ-রমণীয়তাকে ব্যাহত করা হয়েছে। পরিণাম শুভ বা অশুভ, প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় যেমন হোক সহজে অবাধ প্রেমকে লীলায়িত হতে না দিয়ে যেন এক তীক্ষ্ণ তীর্যক পাপবোধের ছায়ায় মণ্ডিত করে তাকে এ সমস্ত উপন্যাসে দেখানো হয়েছে—যাতে নীতিশাসিত হয়ে তা প্রবল হতে ক্ষীণধারপথে এবং পরে আদর্শের উত্তাপে বাষ্পীভূত হয়ে ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেমধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি সত্যের মুখোমুখি হতে পারি। অতীব কঠিন নীতিশাসনে জীবনকে বাঁধতে গিয়ে তিনি সহজেই লালসার অসংযম এবং সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেমের জ্বালাময় রূপটির সন্ধান পেয়েছেন এবং তার অশুভ বিষবৃক্ষকে কুঠারাঘাতে নিশ্চিহ্ন করতে চেয়েছেন। তিনি নরনারীর অনিবার্য প্রেমপ্রবণতাকে বহুক্ষেত্রে সংকুচিত ও আবৃত করে দেখান নি, বরং তার পত্রপুষ্পশোভিত ঐশ্বর্যময় ও মাধুর্যময় রূপটিই দেখিয়েছেন—এইখানেই তিনি মহৎ শিল্পী, কিন্তু সর্বত্র নীতিতত্ত্বের কঠিন শাসনে সে যুগের সমাজচেতনাকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি কোথাও অসামাজিক প্রেমের শুভ পরিণাম দেখাতে পারেন নি। দাম্পত্য প্রেম মহৎ এবং বিবাহিত নরনারীর সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম গর্হিত—এইরকম নীতিতত্ত্ব তিনি প্রামাণ্য বলে উপস্থাপিত করলেও—বর্তমান কালের জীবনচেতনার বিচারে সেখানে Conflict of Values বা মূল্যবোধের দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উঠবে এবং তাঁর সহানুভূতিহীন একদেশদর্শিতার প্রশ্নও উত্থাপিত হবে।

বঙ্কিমযুগের ঔপন্যাসিকেগণের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির উপন্যাসেও রোমান্টিক প্রণয়াকাঙ্ক্ষার বিচিত্র নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণের নাটকে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন প্রতিবেশে রোমান্টিক প্রণয়াবেগই প্রাধান্য লাভ করেছে। রমেশচন্দ্র দত্ত 'সংসারে' শরৎ-সুধার প্রেমের মাধ্যামে প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁব এই উপন্যাস রচনার তিন বৎসর পূর্বে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হলেও, সমাজে তখন তার বিরুদ্ধে বিরোধিতা প্রবল। সে যুগে তাঁর এই উপন্যাসের সামাজিক পটভূমি নির্বাচন ও তার মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রদর্শন অবশ্যই নরনারীর প্রেমসম্মিলনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রেমচেতনার ভাবরূপগঠনে সহায়তা করেছে বিশ্বসাহিত্য। প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ডের উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক গীতিকবিতা, বৈষ্ণব পদাবলী, বাউল সংগীত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কালিদাস প্রমুখ কবিদের কাব্য তাঁর প্রেমচেতনার উদ্বোধনে সহায়তা করেছে। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যবাদী ভাববাদী দার্শনিক মানবহিতৈষী ও বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্যাণের সমন্বয়ের কবি। তাঁর প্রেমচেতনার প্রথম পর্বে একদিকে কৈশোর স্বপ্নবিভোর উদাসীনতা



এপিক-ধর্মী উপন্যাস 'সত্যাসত্য'তে এবং অন্য উপন্যাস 'রত্ন ও শ্রীমতী'তে আধুনিক জীবনের বাস্তবতা, রোমান্স, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক গতিপ্রকৃতি ও জীবনচ্ছন্দের বৈচিত্র্য ও প্রসার মননশীলতার আলোকে বিশ্লেষিত হয়েছে। অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য'তে বাদল সুধী ও উজ্জয়িনীকে কেন্দ্র করে যে বিশাল জীবন-প্রতিবেশ রচিত হয়েছে তাতে নরনারীর জীবনের বিচিত্র মিলন ও বিচ্ছেদ-সমস্যার রূপায়ণ একাধারে মননশীলতা ও হৃদয়াবেগের বিচিত্র নিপুণ কারুকর্মে শিল্পিত হয়েছে। 'গীতিকাব্যধর্মী উপন্যাসে' বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত ও বুদ্ধদেব বসু। তাঁদের উপন্যাসে সমস্ত জীবন-বিশ্লেষণকে ছাপিয়ে কাব্য-সৌন্দর্যতন্ময়তার প্রাধান্য। বুদ্ধদেবের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'তিথিডোরে' সত্যেন্দ্র ও স্বাতীর প্রেমবর্ণনার মতো এমন নির্মলমধুর কোমল মানস-সৌন্দর্যপূর্ণ প্রেমচিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। বিশেষ বিশেষ জনসমাজ, বিশেষ অঞ্চল, বিশেষ বিশেষ কিংবদন্তী-আশ্রয়ী জীবন প্রতিবেশে মূলতঃ রোমান্টিক প্রণয়চিত্রণে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁরা হলেন—তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। এ যুগের অন্য দুজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক—বনফুল ও বিমল মিত্র।

অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণতঃ না হলেও বহুলাংশে পূর্বতন সাহিত্যধারা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছে। জীবনদৃষ্টির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক বিশ্বসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের মর্মমূলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে একদিকে যেমন এর মধ্যে দেশীয় ভাবের অনেক অংশকে রূপান্তরিত করেছে, তেমনি বহির্বিশ্বের হৃৎস্পন্দন সঞ্চার করে এর মধ্যে বিশ্বব্যাপী সঞ্চরণশীল কল্পনা-প্রসার ও রুচিবৈচিত্র্য এনেছে। তাতে সাহিত্যে একদিকে যেমন মানস-প্রসার ঘটেছে তেমনি নানা বিকৃতিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে।

অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে— ১. নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার যান্ত্রিক জীবন পটভূমি। ২. বর্তমান সভ্যতায় বিকার, ক্লান্তি, ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যবোধ। ৩. সর্বক্ষেত্রে আত্মবিরোধের মনোভাব। ৪. ভগবান ও চিরপ্রচলিত নীতিধর্মে অবিশ্বাস এবং ছিন্নমূল-ঐতিহ্য জীবনধারা। ৫. ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের প্রভাব। অবচেতন মন ও চিন্তাধারার অসংলগ্নতা। ৬. আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে ও দার্শনিকদের চিন্তাধারায় জ্ঞানের পরিধি বিস্তার। ৭. মার্ক্সীয় চিন্তাধারা ও নতুন সমাজচিন্তা। ৮. প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয়। ৯. দেহজ কামনা ও তার আবেদনকে স্বীকৃতি দান। প্রেমের মূলে যে শারীরিক প্রণোদনা আছে তার প্রত্যক্ষ প্রভাবের উল্লেখ। ১০. রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিশ্বের বহুবিচিত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে চিন্তাধারা গ্রহণ করে নতুন জীবনবোধ সৃষ্টি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রবল হয়ে দেখা দিল তাঁরা হলেন—হামসুন, টমাস মান, মোপাসাঁ, বালজাক, জোলা, টুর্গেনিভ, ডষ্টয়েভ্স্কি, গোর্কি, টলস্টয়, চেখভ, ইবসেন, বার্নার্ডশ, গল্স্ওয়ার্দি, হার্ডি, হাক্সলি প্রমুখ। এই প্রভাবের ফলেই কল্লোলযুগের সৃষ্টি। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের গ্লানি হতাশা, রুগ্নজীবনের বিষণ্ণতা ও অনিকেত মনোভাব আমাদের সাহিত্যে যে নতুন ধারা নিয়ে এলো তার প্রভাবে

যৌনজীবনে ও প্রেমবিশ্লেষণে নতুন নীতি দেখা দিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে তরুণেরা নিজেদের 'Lost generation' ভাবত তারাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল বংক্রমে যুদ্ধোত্তর কালে তাদের মধ্যে চিন্তাধারায় ও মানসিকতায় দারুণ বিপর্যয় দেখা দিল এবং এক নিদারুণ পাপবোধে জীবনচেতনা অন্ধকারাচ্ছন্ন হল। এই সময় সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব দেখা দিল। ১৯৪১-৪৫ ঃ এই বছরগুলোতে বাঙালির জীবনে নানা বিপর্যয় দেখা দেয়। যুদ্ধ, দাঙ্গা, রাজনৈতিক আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির বিপর্যয় মানুষের মনে আনে অনিশ্চয়তা ও তীব্র সমস্যার চাপ। বেঁচে থাকার সমস্যা হয়ে ওঠে কঠিনতম সমস্যা। সত্য, ন্যায় ও ধর্মের ওপর আস্থা কমতে থাকে। ইতোমধ্যে পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের প্রভাবে বাঙালি নারীর সামাজিক জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। (ক) নারীর অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়, (খ) বিবাহ বিষয়ে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃতিলাভ করতে থাকে, (গ) বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারও নারী লাভ করে, (ঘ) সমাজ-জীবনে কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নারীর উল্লেখযোগ্য দান সমাদৃত হতে থাকে।

এই সময়ে সাহিত্যে দুটি ধারা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে—এক, পাশ্চাত্ত্যমুখী এবং আর একটি, দেশীয় জীবন-ধারা-অভিমুখী। এই পাশ্চাত্ত্যমুখী সাহিত্যিকগণ যে সমস্ত নতুন ভাবধারা ও শিল্পপ্রকরণ নিয়ে এলেন তারও একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে— ১. তাঁরা সাহিত্যের পরিধিকে বিস্তৃত করলেন। ২. আঙ্গিক ও রচনাশৈলীতে উজ্জ্বলতা, তীক্ষ্ণতা; বর্ণনায় সাংকেতিকতা ও ব্যঞ্জনার তীব্রতা বাড়ালেন। ৩. যৌন-জীবনের নিরাবরণ বিবৃতি দিলেন। যৌনমানসিকতার উর্ধ্বে যে উন্নত ভাবস্তরে প্রেমের অবস্থান—তার উচচ লক্ষ্যে না পৌছে যৌনতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাতে নৈপুণ্য দেখালেন, অবচেতন মনের গহনে প্রবেশ করলেন । প্রেমের অনাবিল মাধুর্যের লীলাসঞ্চরণ দুর্লক্ষ্য হল। এই সময়ে কবিতায় বোদলেয়ার, রিলকে, টি. এস. এলিয়ট ও পাউণ্ড প্রমুখ কবিগণের; পূর্বে উল্লিখিত পাশ্চাত্ত্য লেখকগণ ছাড়াও জেম্‌স্ জয়েস্, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্ ও প্রুস্ত প্রমুখ লেখকগণ এবং বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যিক মতবাদ যেমন—Symbolism, surrealism, Existentialism ও Stream of consciousness প্রভৃতির প্রভাব বাংলা সাহিত্যে দেখা দিতে শুরু করে। কবিতা ও উপন্যাস ছাড়াও নাটক ও ছোটগল্পে একই শ্রেণীর প্রভাব কার্যকরী হতে থাকে। এ যুগে প্রেমচেতনার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান বুদ্ধদেব বসুর। তিনি লেখেন ঃ

যে-প্রণয়
বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব
মৃত্যু নেই তার।

তিনি 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' ও 'কলকাতার ইলেকট্রা' প্রভৃতি নাটকে দেশী ও বিদেশী পৌরাণিক চরিত্রে প্রেমের বিশ্লেষণে আধুনিক মানস-সংবেদনা, দ্বন্দ্বজটিলতা ও ট্রাজিক পরিণামের শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর 'মরচে পড়া পেরেকের গান' কবিতা থেকে প্রেমের ও অজ্ঞাতযৌবন পুরুষের চিত্তে নারীর বেগবান সৌন্দর্য ও ছন্ন আবেগচঞ্চলতার বৈচিত্র্যময় ও সুগভীর নতুন অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যেতে পারে —



'যেখানে ত্রিলোক এক অখণ্ড স্থিরবিন্দুর মধ্যে সংহৃত,

ত্রিকাল এক সমতল ও নিরঞ্জন বিস্তার,

লুপ্ত সব দ্বৈত, তুমি আর আমি অনন্য—

আমি সেই ব্রজলোকে স্থান পেলাম, তার আলিঙ্গনে'।

তিনি বলেছেন—

যা কিছু লিখেছি, সব, সবই ভালোবাসার কবিতা।

(মৃত্যুর পরে ঃ জন্মের আগে)

অতি আধুনিক বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এই প্রবন্ধের সমাপ্তি চিহ্নিত হতে পারে। অতি আধুনিক বাংলা উপন্যাসে কিছু কিছু লেখায় অশ্লীলতার প্রাদুর্ভাব অতি প্রকট হয়ে উঠেছে। উপন্যাস ও পর্ণোগ্রাফির সীমারেখা একাকার হয়ে যাচ্ছে। সাহিত্য আর্ট, তার শিল্পরস যে জীবনধর্মী হবে—এতে দ্বিমত চলে না। আধুনিক কিছু সাহিত্যিকের উপন্যাসে প্রেমচিত্রণের নামে অতি প্রকট যৌনতার অবাধ লীলার প্রসার দেখা যায়। দেহ মনের আধারে প্রেমের জন্ম হলেও, প্রেমের সাধনা মানসিক সৌন্দর্য ও পূর্ণতার সাধনা। জীবনে দেহতৃষ্ণার স্থান অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু সেজন্যে মানুষকে কেবল জান্তব সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে কামচিন্তা ও কামকণ্ডুয়নের বিভিন্ন অসংলগ্ন পারিপার্শ্বিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ালেই যে বাস্তবতা কিংবা Existentialism ইত্যাদি মতবাদের যথেষ্ট সার্থকতা হয়, তা স্বীকার করা যায় না। পশুর কামোন্মত্ততা সরল, উচ্চস্তরের ভাবুক মানুষের প্রেমও এক ধরনের নন্দনতাত্ত্বিক শ্রেয়োবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য প্রেমের ক্ষেত্রে হিংসা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন চিরকালই আছে। তবু মধ্যে থেকে কেবলমাত্র মানসিক অবচেতনলোকের বিকার ও অতিবিকৃত যৌনক্ষুধার ফাঁদে বন্দী যে সব মানুষের অথবা অতি অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সত্য সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে কি? সাহিত্যের কাজ পূর্ণ থেকে পূর্ণতর সৌন্দর্যসৃষ্টি। সেই সৌন্দর্যকে যদি বিকৃতি ও পঙ্কিলতা থেকে উর্ধ্বে তুলে ধরে দেখানো হয়, তবেই বিকৃতি ও পঙ্কিলতার মূল্য, নচেৎ কি বাস্তবতা, কি জীবনসত্য, কি আর্ট—কোন দিক থেকেই তাদের সার্থকতা নেই। সৌন্দর্যকে স্থিরলক্ষ্য না করে বিকৃতির বর্ণনা ও মর্মবিশ্লেষণ আত্মঘাতী ও ব্যর্থ।

তবে, এর ব্যতিক্রমও আছে। কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কে এক কথাতেই প্রেমের কবিতা বলা হয়তো ঠিক হবে না। তবু প্রেম এখানে অন্তঃ সলিলা ফল্গুধারার মতো, লঘুপক্ষ তরঙ্গমালার মতো ধীর গতিতে এগিয়ে গিয়েছে চিরন্তন দুটি নরনারীর হৃদয়রাজ্যের অতিমানবিক দেশকাল-নিরপেক্ষ এবং আবহমান জীবন-চেতনার ধারাপথে। প্রেমের এ এক অনাস্বাদিতপূর্ব রূপ - যা বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে; উদ্ধৃত কবিতাংশে তার মর্মরহস্য অনুধাবন যোগ্য "সব পাখি ঘরে আসে- সব নদী- ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন; থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

জন্মশতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

॥ ১ ॥

পিতামহের উত্তরাধিকার ঃ যুক্তি জ্ঞান ও মননশীলতা

বাংলার নবজাগরণে যে-সব মনীষী তাঁদের বুদ্ধিনিষ্ঠ চিন্তা ধারণা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায় নিজস্ব অবদানের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে মনীষী অক্ষয়কুমারের দত্তের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমার প্রায় সব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা বারো বছরের মধ্যে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলি তাঁর "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক গ্রন্থের দুই খণ্ডে বিধৃত হয়েছিল। "পদার্থবিদ্যা" ও "ভূগোল" নামে তাঁর আরও দুটি গ্রন্থ ছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পিতামহের এই জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার স্পৃহা মনস্বিতা ও বস্তুনিষ্ঠা উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতামহের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন

— "হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায় / উদ্বোধিত চিত্ত মোর, গোরুড় সে জ্ঞান-পিপাসায়।" মোহিতলাল বলেছেন, "তাঁহার পিতামহের জ্ঞান পিপাসা তিনিও পাইয়াছিলেন — কাব্যসাধনাতেও তাহাই ছিল তাঁহার প্রধান প্রেরণা।' অক্ষয়কুমারের চিন্তায় মননে ও রচনায় বুদ্ধিবাদের প্রাধান্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "বাঙালীর মনের ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশ্ববোধকে বুদ্ধিগোচর করিবার গুরুভার লইয়াছিলেন অক্ষয়কুমার। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'তিনি বাঙালীর মনের প্রান্তরে যে রোশনাই জ্বালিয়াছিলেন, তাহার আলোকচ্ছটা ১৯শ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জীবনের বিচিত্র রহস্যকে উদঘাটিত করিতে পারিয়াছিল।" সত্যেন্দ্রনাথের চিত্তে সাহিত্য-প্রেরণার উৎস সন্ধানে এই সব উক্তি সবিশেষ স্মরণীয়। সত্যেন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যে এক হিসেবে জ্ঞানবিজ্ঞানজিজ্ঞাসু কবি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত" কবিতায় একটি উক্তি করেছিলেন, যা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখার মতো। উক্তিটি এই—

"তুমি বঙ্গ ভারতীর তন্ত্রী,-পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে",................

॥ ২ ॥

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও সাহিত্যসাধনার পরিচয়

সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মাতুলালয় নিমতা গ্রামে (২৪ পরগণা জেলায়) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রজনীনাথ দত্ত, মাতা মহামায়া দেবী। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে,



আনন্দের প্রতি প্রকৃতির প্রেমে ছিল দ্বন্দ্ব,—সে দ্বন্দ্ব প্রকৃতির প্রেম ও আনন্দের কর্তব্যের দ্বন্দ্ব। কিন্তু প্রকৃতির মহৎ ত্যাগে আনন্দ তার মুক্তি খুঁজে পায়। 'শ্যামা'র প্রেম ও তার প্রেমের মূল্য বিচার এক দুরূহ দ্বন্দ্বজটিল প্রশ্ন। শ্যামার বজ্রসেনের প্রতি প্রেমের জন্য উত্তীয়ের আত্মত্যাগ ও শ্যামার এই নিষ্ঠুরতার জন্য বজ্রসেন কর্তৃক শ্যামাকে পরিত্যাগ—এই নাট্যকাব্যে প্রেমের মূল্য ও মর্যাদার প্রশ্নকে তীব্র সংঘাতমুখর করে তুলেছে। কে বলবে, কোন্‌টি শ্রেয়?

'বাঁশরী'তে দাম্পত্যপ্রেম এবং বিবাহবন্ধনাতিরিক্ত প্রেমের সহ-অবস্থান দেখানো হয়েছে। সোমশঙ্কর ভালোবাসে বাঁশরীকে, কিন্তু বিবাহ করল সুষমাকে। আবার সুষমা ভালোবাসে পুরন্দরকে। কর্তব্যভারমুক্ত বাঁশরী এবং সোমশঙ্করের ভালোবাসা থাকবে অক্ষত ও অম্লান। ব্যক্তিত্বময়ী বাঁশরীর এই পরিণাম কাব্যকল্পনালোকে সুন্দর, কিন্তু বাস্তব জীবনে সার্থক কি-না এ প্রশ্ন থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একমুখী প্রেমের পরিচয় পাই 'নৌকাডুবি' ও 'গোরাতে'। প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব ও সমস্যার তীব্রতা সর্বাপেক্ষা বেশি আলোচিত হয়েছে চোখের বালি, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, দুইবোন ও মালঞ্চে। প্রেমের ক্ষেত্রে অন্যান্য সমস্যা দেখা দিয়েছে—যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও চার অধ্যায়ে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পুরুষ প্রধানতঃ দুই জাতীয়—এক আদর্শবাদী আর এক ভোগবাদী ও আত্মদর্পে বলীয়ান। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভূ 'ঘরে-বাইরে'র নিখিলেশ, দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভূ 'যোগাযোগে'র মধুসূদন। নারীও প্রধানতঃ দুইশ্রেণীর—এক 'মা'—কল্যাণময়ী, 'সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী'; আর এক শ্রেণী—'প্রিয়া'—বিচিত্র-সৌন্দর্যরস সঞ্চারিণী, সংসারভারবিবিক্তা ও প্রেমস্বপ্নবিহারিণী। প্রথম সারিতে—হেমনলিনী, সুচরিতা ও কুমুদিনী; দ্বিতীয় সারিতে—ললিতা, ঊর্মিমালা ও সরলা।

'নৌকাডুবিতে কমলার প্রেম স্বামিনিষ্ঠ। 'গোরা'তে গোরা আদর্শবাদী, কিন্তু তার মধ্যে এক মহৎ প্রেমিক বর্তমান। সুচরিতার প্রেমে ধ্যানসমাহিতি, ললিতার প্রেমে আবেগ-উদ্বেলতা। 'চোখের বালি'তে বিনোদিনী মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু তার গভীরতর আকর্ষণ বিহারীর প্রতি। বিনোদিনীর অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্খা এবং নিবিড় প্রণয়স্বপ্নই উপন্যাসে দ্বন্দ্বজটিলতা সৃষ্টি করেছে। 'ঘরে-বাইরে'তে নিখিলেশ স্ত্রী বিমলাকে প্রেমের ক্ষেত্রে স্বীয় অভিপ্রেত পুরুষকে নির্বাচিত করবার স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু নিখিলেশের আদর্শবাদ ও মহত্ত্ব এবং সন্দীপের আত্মপ্রচারমূলক দেশসেবার অন্তরালে ভোগসর্বস্বতা ও স্বেচ্ছাচার—এই দ্বন্দ্বে বিমলা শেষপর্যন্ত স্বামীর দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছে, কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বজর্জর চরিত্র বিশ্লেষণে এবং প্রেমের ক্ষেত্রে হতাশা ও হাহুকারে এই উপন্যাসের আবহ ভারাক্রান্ত ও দীর্ণবিদীর্ণ। 'চতুরঙ্গে'র দামিনী তার সমস্ত জীবন ও যৌবনের অকুণ্ঠিত দাবি নিয়ে সর্বপূর্বসংস্কারমুক্ত আধুনিক নারীরূপে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত। প্রকৃতি যে আনন্দে গ্রীষ্মকালে বিশুষ্কপ্রায় জীর্ণ প্রশাখায়ও ফুল ফোটায়, শীতের তীব্র কম্পনেও পুষ্পলতা যে আনন্দরস নিয়ে বসন্তাভাসের প্রতীক্ষা করে, দামিনী প্রকৃতির সেই সৃষ্টিলোকের সমস্ত আবেগব্যাকুলতা নিয়ে জীবনকে প্রেমে রঙে ও রসে সমুজ্জ্বল করে তোলবার আনন্দে মশগুল। যৌবনের তীব্র সংরাগ ও কামনাবেগের তীব্রতার উপর আধুনিক মনস্তত্ত্বসমীক্ষা তার চরিত্রে সমারোপিত হয়েছে, কিন্তু তা ছাড়াও সে অনন্য জীবনানন্দবিভোর নারী। 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চে' বিবাহিত

পুরুষের জীবনে বিবাহাতিরিক্ত প্রেমের সমস্যা দেখানো হয়েছে। 'দুইবোনে' উর্মিমালার আত্মত্যাগে শশাঙ্ক ও শর্মিলার জীবনে সামঞ্জস্য এসেছে; 'মালঞ্চে' আদিত্য ও সরলার প্রেমের জন্যে রিক্তহৃদয় ও অতৃপ্তপ্রেম নীরজা মারা গেছে। এই দুই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বিবাহিত নরনারীর জীবনে বিবাহাতিরিক্ত প্রেমের দ্বন্দ্বে যৌথজীবনে ভাঙন ও সর্বনাশের রূপ প্রদর্শন করেছেন। 'যোগাযোগে' মধুসূদনের রূঢ় ব্যক্তিত্বের অন্তরালে প্রেমের ক্ষেত্রে পরাজয়ের অগৌরব সুচিহ্নিত হয়েছে। কুমুদিনী যথার্থ মাধুর্যময়ী ও ব্যক্তিত্বময়ী নারী। 'শেষের কবিতা'য় অমিত ও লাবণ্য দাম্পত্য সম্পর্কে আবদ্ধ হয়নি উচ্চাঙ্গের ভাবস্তরে প্রেমের মহিমা সৌন্দর্য ও চিরমুক্তির আনন্দকে অম্লান রাখার জন্যে। 'চার অধ্যায়ে' এলা ও অতীন্দ্রের প্রেমে দ্বন্দ্বসংঘাত ও বেদনাময় পরিস্থিতি বহির্জীবনের সৃষ্টি। বিপ্লববাদের যান্ত্রিকতা যে নরনারীর সহজ স্বচ্ছন্দ প্রেমবিকাশের অন্তরায়, তা এখানে প্রদর্শিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু গল্পে প্রেমের রোমাণ্টিক আবেগ ও লিরিক উচ্ছ্বাস এবং কিছু গল্পে বৈচিত্র্যময় প্রেমের বহিঃপ্রকাশ দেখানো হয়েছে। এই গল্পগুলি—একরাত্রি, সমাপ্তি, মহামায়া, শাস্তি ও দুরাশা ইত্যাদি । প্রেমের ক্ষেত্রে তীব্র আবেগ ও মানসিক ভারসাম্যরক্ষার সমস্যা দেখা দিয়েছে 'নষ্টনীড়ে'। 'তিনসঙ্গী'র 'ল্যাবরেটরি' গল্পে সোহিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সতীত্ব সম্পর্কে ধারণায় ও নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অনন্য আত্ম-উদ্‌ঘাটনে। পাতিব্রত্য দৈহিক শুচিতানিরপেক্ষ, তার সার্থকতা স্বামীর জীবনব্রত উদ্‌যাপনে। স্বামীব কাছে প্রেম না পেয়েও সন্তানবতী, বল্লভপ্রভা এবং প্রেমের ক্ষেত্রে লঘুপক্ষসঞ্চারিণী হলেও আধুনিক সমাজজীবনে নারীর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে—সোহিনী চরিত্রে এমন সংকেত রয়েছে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখে বঙ্কিমচন্দ্র ভেবেছিলেন সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড দৃঢ়তর করবেন, কিন্তু সমাজের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি কুন্দনন্দিনী ও রোহিণীর ব্যর্থ জীবনের দিকে প্রবাহিত হল। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'ঘরে-বাইরে' ও 'চতুরঙ্গে' নতুন যুগের 'আঁতের কথা' বেরিয়ে এসেছে। শরৎচন্দ্র পূর্বসূরীদের সাহিত্য চেতনার সঙ্গে নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা ও সমাজবিশ্লেষণের তীক্ষ্ণ ধীশক্তির সমন্বয় সাধন করে উপন্যাসের গতিপথকে সুদূরপ্রসারী করলেন। তাঁর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে তাঁর সমবেদনাবোধের গভীরতা, মানবিকতাবোধের নূতনত্ব ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষে, ব্যক্তির স্থাননির্ণয় ও যথার্থ মূল্যায়ন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারী চরিত্র আবেগপ্রধান এবং সর্ববিধ প্রেমের দ্বন্দ্বজটিলতায় ঐ আবেগই তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। 'নারীর মূল্যে' শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, 'নারীর মূল্য নির্ভর করে পুরুষের স্নেহ সহানুভূতি ও নারীধর্মের উপরে।' এই 'নারীধর্ম' শরৎসাহিত্যের এক মহৎ উপাদান। আবার এই নারীধর্মের প্রধান সার্থকতা প্রেমে। সমাজের বিচারে যা অন্যায়, ব্যক্তিকে তা নির্বিচারে অন্যায় বলে মেনে নিতে হবে, শরৎচন্দ্র এই মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। অবস্থাচক্রে যে পাপী বা অসতী তাকেও আত্মবিকাশ বা অন্যান্য সদ্‌গুণাবলী বিকাশের সুযোগ ও মানবিক মর্যাদা দিতে হবে। সমাজের মনোভাব হবে নিষ্ঠুর অস্বীকৃতি নয়,—সহানুভূতির আলোকে ব্যক্তিজীবনের মূল্যনির্ণয়। শরৎচন্দ্রের কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করলে লক্ষ্য করা যাবে তাঁর চিন্তাধারায় কোন কোন বিষয়ে অভিনবত্ব তথা মৌলিকতার লক্ষণ স্পষ্ট।



১. 'সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়।...... একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান পা পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?

২. 'সতীত্বকে আমি তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার জীবনের চরম ও পরম প্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার জ্ঞান করি।' (স্বদেশ ও সাহিত্য)

এজন্য শরৎসাহিত্যে শাস্ত্রবিধিসম্মত নীতির চেয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রেমের স্থান ও পরিবেশবৈচিত্র্য এবং মনস্তত্ত্ব ও আবেগস্পন্দনের বিশ্লেষণতীক্ষ্ণতা বিস্ময়কর। তাঁর প্রেমচিত্রণকে কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—(ক) দাম্পত্য প্রেম ও বিরোধ। (খ) সমাজ-সমালোচনা ও কুণ্ঠিত প্রেম। (গ) পূর্বরাগ ও মিলনান্তক প্রেম। (ঘ) সমাজবিধিবহির্ভূত প্রেম। (ঙ) বুদ্ধিদীপ্ত জীবনচেতনা ও প্রেম। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও তাঁর সর্বাধিক সাফল্য যে ধারায় সে সমাজবিধিবহির্ভূত প্রেমের উপন্যাসে। 'চরিত্রহীনে' সাবিত্রী ও সতীশের নিন্দিত প্রেমের মধ্য থেকে দীপ্ত হয়ে উঠেছে সাবিত্রীর আত্মত্যাগের মহিমা। কিরণময়ী অসাধারণ সৌন্দর্য ও মানসশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত নারী হলেও আবেগ-প্রবলতায় সে নিজের জীবনে শেষপর্যন্ত সর্বনাশ ডেকে এনেছে। স্বামী হারাণের প্রতি মমত্বহীন কর্তব্যনিষ্ঠা, অনঙ্গডাক্তারের সঙ্গে ছল প্রেমাভিনয়, উপেন্দ্রের প্রতি প্রেম এবং দিবাকরকে আকৃষ্ট করে সেই প্রেমে ব্যর্থতার জ্বালা নিবারণের প্রচেষ্টা, সুরবালার সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে আত্ম-আবিষ্কার—সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই প্রেমের বিচিত্র জটিল চিহ্ন এতে ছড়িয়ে আছে। 'শ্রীকান্তে' রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তে প্রণয়লীলায় প্রেমকে উচচাঙ্গের ভাবস্তরে স্থাপন করা হয়েছে। সামাজিক সংস্কার ও উচচ আত্মাভিমান এই প্রেমকে কোথাও দৈহিক মিলনের পথে অগ্রসর হতে দেয়নি, উপরন্তু তাতে এক শ্রেণীর মানসোৎকর্ষ-সাধনা যুগলজীবনের সম্পদ হয়ে উঠেছে। নারীত্বের প্রতিষ্ঠায় সমাজ ও ধর্মের সংস্কারদ্রোহিতায় সর্বাপেক্ষা সাহসের পরিচয় দিয়েছে অভয়া। 'গৃহদাহে' অচলার চরিত্রে শরৎচন্দ্র এক হিসেবে চিরন্তন নারীমনের এক দুরূহ ও জটিল সমস্যা এবং আবেগপ্রবাহজাত বিক্ষোভময় অন্তর্দ্বন্দ্বের নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। দুটি পুরুষের প্রতি প্রেমে দোলাচল চিত্তবৃত্তিতে এবং চেতন মনের বিশ্লেষণে ও অবচেতন মনের অসংবরণীয় আবেগে তার জীবন আলোড়িত হয়েছে। বানার্ড শ-এর নাটকে এক নারী দুটি পুরুষকে ভালোবেসে প্রশ্ন করেছিল—

"Oh how silly the law is Why can't I marry both them.... Well, I love them both."

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অচলারও মনের কথা এই। অচলা চরিত্রের এই স্ববিরোধ ও অসঙ্গতিকে শরৎচন্দ্র উচ্চাঙ্গের Art-এর অন্তর্ভুক্ত করে বাংলা সাহিত্যে নারীর মানসরহস্যের এক নতুন ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'দেনাপাওনা'য় আমরা শরৎচন্দ্রের মিলনান্তক প্রেমচিত্রণের সার্থক রূপ দেখতে পাই। ষোড়শী জীবানন্দের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এনেছিল, তার মূলে তার স্বামিপ্রেম ও অপ্রতিরোধ্য নারীত্ব। এই নারীত্বই শরৎচন্দ্রের

সমাজসচেতন পুরুষ ও ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত পুরুষের হৃদয়ে প্রেমের লীলাক্ষেত্রে শুভ বা অশুভ যে কোন ভাবে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি বা প্রতিভার ন্যায় অসাধ্যসাধন করেছে।

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের মধ্যে করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায়ের কাব্যে রবীন্দ্রভাবলালিত কল্পনাকুঞ্জে রোমান্টিক প্রণয়গীতিগুঞ্জরণই সার্থকতামণ্ডিত হয়েছে। রবীন্দ্রযুগে স্বতন্ত্র কল্পনার আকাশে মুক্তপক্ষ কবিগণের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও নজরুল ইসলাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মোহিতলালের কাব্যে ক্লাসিকাল ভঙ্গির মধ্যে সুস্পষ্ট দেহবাদের স্বীকৃতি ও সুনিবিড় প্রণয়চেতনার স্বাক্ষর।

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি',
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্নসখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন,—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরানী!
নেত্র তার মৃত্যু-নীল!—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী!
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস! জানি তাহা জানি।

(পান্থ)

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রৌঢ়ত্বের ক্ষীয়মাণ জীবনচেতনার দীপাধারে লুপ্ত রোমান্টিক প্রণয়াকুলতার হাহাকার দেদীপ্যমান। নজরুলের প্রেমের কবিতায় ও সংগীতে মননশীলতার স্পর্শহীন নয়নমনোহর রূপসজ্জা ও ব্যাকুল হৃদয়ার্তির যুগ্মতন্ত্রীর সুরঝংকার।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তী যুগে প্রভাতকুমার মখোপাধ্যায়ের গল্পে ও উপন্যাসে শান্ত স্নিগ্ধ মিলনান্তক প্রেমচিত্রণের সার্থক রূপ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক জীবনধর্মী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের উপন্যাসে কৌতুক, মনস্তত্ত্ব ও রোমান্টিক প্রণয়-অভিব্যক্তি রয়েছে। বুদ্ধিপ্রধান জীবনবিশ্লেষণে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং প্রবোধকুমার সান্যাল উল্লেখযোগ্য। জীবনসম্পর্কে এক বিশেষ তত্ত্ব ও প্রণয়সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা তাঁদের উপন্যাসে স্থান নিয়েছে। প্রবোধকুমারের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'প্রিয় বান্ধবী' এই ধরনের উপন্যাসের বিশেষ উদাহরণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংকেতিকতা ও তীর্যক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসে সিদ্ধহস্ত,—তাঁর জীবনপর্যালোচনা ও জীবনরহস্যবর্ণনা নির্মম বাস্তবতামণ্ডিত,—প্রেমের মধ্যেও জৈবজীবনের অস্থিরতা ও আলো-আঁধারির চিত্র। আধুনিক জীবনের সমস্যা, জীবনের দ্বন্দ্বজটিলতা, আন্তর্মহাদেশীয় পটভূমিতে নরনারীর জীবনে প্রেমের উদ্ভব প্রসার ও পরিণাম, প্রেম ব্যতীত বিবাহে অস্বীকৃতি ও এ সম্পর্কে সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও যুগমানসের বিশ্বস্ত রূপায়ণে দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাশঙ্কর রায় উল্লেখযোগ্য। দিলীপকুমার রায়ের 'মনের পরশ',' রঙের পরশ', 'দুধারা', 'বহুবল্লভ' ও 'দোলা' প্রভৃতি উপন্যাসে, ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত' ও 'মোহানা'-য় এবং অন্নদাশঙ্করের সুবৃহৎ



জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন্ থেকে এফ, এ, পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সবিতা" প্রকাশিত হয়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "সাহিত্য" পত্রিকায় তাঁর প্রথম যে কবিতা প্রকাশিত হয়, তা হল "দেখিবে কি (ভল্টেয়ার হইতে)"। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি যে বাংলার একজন বিশিষ্ট কবি — এ বিষয়ে সকল সাহিত্য সমালোচকই একমত ছিলেন। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে; — ১। বেণু ও বীণা, ২। তীর্থ-সলিল, ৩। তীর্থরেণু, ৪। ফুলের ফসল, ৫। কুহু ও কেকা, ৬। মণি-মঞ্জুষা, ৭। অভ্র-আবীর, ৮। বিদায় আরতি, ৯। কাব্য-সঞ্চয়ন, ১০। সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা। এ ছাড়াও তিনি উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য— জন্মদুঃখী (উপন্যাস), রঙ্গমল্লী (নাট্য) ও চীনের ধূপ (নিবন্ধ) । জীবৎকালেই অবিনশ্বর কবিখ্যাতির গৌরব অর্জন করে সত্যেন্দ্রনাথ ৪১ বছর বয়সে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জুন তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন।

॥ ৩ ॥

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ এবং সত্যেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রপ্রতিভা যখন বাংলার সাহিত্য আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো ভাস্বর, সত্যেন্দ্রনাথ তখন বাংলা কাব্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের মধ্যে ছিলেন — করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়। রবীন্দ্র-অনুরাগী অথচ স্বতন্ত্র ভাবকল্পনা বিশিষ্ট কবিগণ প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার,যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুল ইসলাম। এই পাঁচজন কবির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথের কী কী বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল, তা বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' শোক কবিতায় বলেছেন, "হে কবি, দিবে না সাড়া তারে / তোমার নবীন ছন্দে?" রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র তাঁকে বলেছিলেন "ছন্দের রাজা" আর "ছন্দের যাদুকর"। সত্যেন্দ্রনাথের কবিচরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্নেহমমতায়পূর্ণ, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রদ্ধাশীল ; তাই বলেছেন, "তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল নির্মম, / করুণ কোমল।" বাংলার প্রকৃতি, বাংলার ছয় ঋতুর সৌন্দর্য, বাঙালির রূপচেতনা এবং বাঙালির সুখদুঃখ হাসিকান্না তো ছিলই এবং আরও ব্যাপকভাবে বলতে গেলে বিশ্বমানবের ভাবনা-বেদনা কবির কখনো হৃদয়োল্লাসে কখনো বা বেদনাবিহ্বলতায় বহু বিচিত্র কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। কোন্ কবির কবিতায় এমন ধরনের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যেতে পারে? যে কবি পৃথিবীকে ভালোবাসেন তাঁর কবিতাতেই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "জানি তুমি প্রাণ খুলি / এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে / সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্যনব সংগীতের হারে।" সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণে একটি দিক প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। সে হচ্ছে তাঁর স্বদেশ প্রীতির অনন্যতা। যে সব তরুণ দেশের মুক্তি যুদ্ধে অগ্রণী হয়ে আগামী যুগে এগিয়ে আসবে তাদের জন্য

কবি (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি / জয়মাল্য বিরচিয়া— রেখে গেলে গানের পাথেয় / বহ্নিতেজে পূর্ণ করি।") সত্যেন্দ্রনাথ যে কালজয়ী কবি, কালোত্তীর্ণ ছিল তাঁর কবিপ্রতিভা —এ সত্যও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হয়নি ; তাই তিনি তাঁর সম্পর্কে বলেছেন "অনাগত যুগের সাথেও / ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর।"

অসীম সৌন্দর্যপ্রীতি, নিসর্গসৌন্দর্যের সঙ্গে মানবিক জীবনবোধের অন্বয়-সাধন, সত্যনিষ্ঠা ও মানবজীবনে বন্ধনমুক্তির আহ্বান এবং অতন্দ্রভাবে বিশ্বপ্রীতিতে আস্থাবান্ চিত্তবৃত্তি —রবীন্দ্রনাথের উক্তি বিশ্লেষণ করলে আমরা সত্যেন্দ্র-কবিচরিত্রে বিশ্বের প্রতিভাবান্ কবিদের এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যগুলিই খুঁজে পাই।

॥ ৪ ॥

কবিতায় কল্পনার দ্বৈতরূপ এবং ছন্দ-বৈচিত্র্য

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর যে সর্জনী-প্রতিভাব সৃষ্টি সেই প্রতিভা দুই কল্পনারাজ্যে বিহার করেছে — একদিকে খেয়ালী কল্পনা ও অপরদিকে সর্জনী কল্পনা। খেয়ালী কল্পনার পরিচয় আছে তাঁর 'পাল্কীর গান', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'পিয়ানোর গান', 'সবুজ পরী', 'জর্দাপরী', 'লালপরী' ও 'ইলশে গুঁড়ি', প্রভৃতি কবিতায়। অপর দিকে, তাঁর সর্জনী কল্পনার পরিচয় পাই—"পদ্মার প্রতি", "আমরা চম্পা", "গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি", "চিত্রশরৎ", মহাসরস্বতী" ও "নমস্কার" প্রভৃতি কবিতায়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় এই ধরনের দ্বৈতরূপ। যে প্রতিভা কৈশোরসুলভ ঔৎসুক্য ও চঞ্চলতায় স্পন্দনময়, সেই প্রতিভা বিশ্বের জ্ঞান-সমুদ্রের বারিরাশি পান করে তা সর্বত্র যেন আলোক মণ্ডিত দীপমালায় বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়। এই পরস্পব বিরোধী চেতনা সত্যেন্দ্রনাথের সৃষ্টি—বৈচিত্র্যকে যেমন আকর্ষণীয় করে তুলেছে, তেমনি সমসাময়িক এবং উত্তরকালের বাঙালি কবিদের চেতনায় নব নব প্রেরণা সঞ্চার করেছে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার মর্মস্থলে ছিল এক বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার আর্তি। আবেগ নয়, বরং বিষয় বা বস্তুর অন্তঃস্বরূপের নির্মোহ মর্ম উদঘাটন ছিল তাঁর লক্ষ্য। আর ছিল একই ছন্দে চিরকাল স্রোতে ভাসা নয়, ছন্দে ছন্দে বৈচিত্র্য সৃষ্টির শিল্পকুশলতা। সত্যেন্দ্রনাথই একমাত্র কবি—যিনি প্রয়োজনে আবেগবর্জিত বর্ণনায় এবং ছন্দনির্মিতির কলাকৌশলে বাংলা কবিতায় এক নতুন ধারা আনতে পেরেছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল এক চিরকিশোর মন। এই মনই সৃষ্টি করেছে "ছেলের দল" "পাগ্‌লা ঝোরা" প্রভৃতি কবিতা। জ্ঞানী পণ্ডিত এই কবির দেশের প্রতি ভক্তি ছিল মর্মে গাঁথা। দেশের সকল বরেণ্য মনীষীর প্রতি তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। মানববিশ্বের সমগ্রতার প্রতি কবি ছিলেন একান্ত আস্থাশীল। বিশ্বমানব সমাজের কল্যাণেও তিনি ছিলেন একান্ত



আগ্রহী। "জাতির পাঁতি" কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, "জগৎ জুড়িয়া একজাতি আছে / সে জাতির নাম মানুষজাতি।" লিখেছিলেন "আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন / চারি মহাদেশ মিলিবে যবে, / যেই দিন্ মহামানব ধর্ম্মে / মনুর ধর্ম্ম বিলীন হবে।" রবীন্দ্রনাথের যেমন জীবনদেবতা, সত্যেন্দ্রনাথের তেমন "মহাসরস্বতী"। এই দেবী "বিশ্ব-মহাপদ্ম লীনা !", "মহাকাব্য-ধাত্রী" "মহাকবিকুলের জননী"। তারই আশীর্ব্বাদে সব বিদ্যা বার্ত্তা বিধি দেখিতে দেখিতে / গড়ি উঠে গীতে।" তাঁর আরাধ্যা দেবীর কৃপা প্রার্থনায়, তাঁর আবির্ভাবের প্রত্যাশায় তিনি লিখেছেন

"মহাসঙ্গীতের রূপে গড়ি, উঠে নিত্য অপরূপ
মানবের পূর্ণ বিশ্বরূপ,—
তোমারি প্রসাদে দেবী ! তুমি যবে হও আবির্ভাব
তখনি তো লক্ষ্য-লাভ তখনি তো মহালক্ষ্মী লাভ।"

ছন্দ নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, যা আজও তুলনারহিত এবং বিস্ময়কর। কালিদাসের "মেঘদূতম্" কাব্যের "মন্দাক্রান্তা ছন্দে'র অনুসরণে তিনি লিখলেন —

"পিঙ্গল বিহ্বল / ব্যথিত নভতল, / কইগো কই মেঘ / উদয় হও, /
সন্ধ্যার তন্দ্রার / মূরতি ধরি আজ / মন্দ্র মন্থর / বচন কও " /

হোমার "হিরোইক্ ভার্স"-এ "ইলিয়াড" ও ওডিসি" মহাকাব্য রচনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ এ-ছন্দের বাংলা রূপ দিলেন এইভাবে—

হিংসা কি / সংসারে / চিরকালই / থাকবেরে /
থাকবে কি / সংগ্রাম?
জন্তুরে / হীন তবে / জ্ঞান কর / কোন্ দোষে।
দাও তারে /দুর্নাম?

॥ ৫ ॥

কবিতার অনুবাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ

কবি ষ্টিফেন স্পেণ্ডার বলেছিলেন, "Poetry is a game played with the reader according to rules, but it is also a truth game in which the truth is outside the rules". এর সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ—কবিরা পাঠকের সঙ্গে নিয়মানুযায়ী কবিতা-খেলা খেলেন। এটি একটি সত্যেরই খেলা—যে খেলায় সব নিয়মেরই বাইরে থাকে -সত্য। অনুবাদ-কবিতায় মূল-কবিতার সাধারণ অর্থ বজায় রেখে অনুবাদ করা

সহজ; কিন্তু স্পেণ্ডার-কথিত কবিতার সেই "সত্য"কে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ। অনুবাদকের মূল সমস্যা এটাই। তবে মনে প্রশ্ন জাগে সত্যেন্দ্রনাথ অনুবাদ কর্মে অগ্রসর হলেন কেন? ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র বলছেন, "তিনি অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেছিলেন প্রধানতঃ দুই কারণে। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিভাগের দৈন্য মোচন করা ছিলো তাঁর প্রথম অভিপ্রায়, দ্বিতীয়তঃ ছন্দের অভিনবত্ব অনুসন্ধানে তাঁর সহজাত আগ্রহ ছিল।"

সত্যন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে তিনটি গ্রন্থ অনুবাদ-কবিতার সংগ্রহ। এগুলি হল— "তীর্থ-সলিল", "তীর্থরেণু" ও মণিমঞ্জুষা"। এই তিনটি কাব্যে মোট প্রায় সাড়ে পাঁচশো অনুবাদ-কবিতা আছে। "তীর্থ-সলিল" কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রনাথ লেখেন, "তীর্থ-সলিল জগতের সমস্ত সাহিত্য-মহাপীঠ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে।" সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা যেমন অভিনব, তেমনি সফল ও সার্থক। রবীন্দ্রনাথ "তীর্থরেণু" পড়ে লিখেছিলেন—"তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তর প্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য নহে ইহা সৃষ্টিকার্য"।

॥ ৬ ॥

সত্যেন্দ্রনাথ ও উত্তরসূরিবৃন্দ

T. S. Eliot তাঁর 'Tradition and the individual talent' প্রবন্ধে বলেছেন, "No Poet, no artist of any art, has his complete meaning alone, His significance, his appreciation is the appreciation of his relation to the dead poets and artists". সত্যেন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বাঙালি কবিগণের কাব্যে তাঁর প্রতিভার ছায়া রৌদ্রপাত কী ধরনের বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে তা বিবেচনা করা যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, সত্যেন্দ্র-পরবর্তী প্রতি তরুণ কবির কবিত্রতেই তাঁর প্রভাব অনুভব করা যায়। নজরুল, মোহিতলাল এবং এমন কি জীবনানন্দেরও প্রথম পর্বের কাব্যধারায় তাঁর প্রভাব লক্ষণীয়। জীবনানন্দ তাঁর 'ঝরা পালকে' সত্যেন্দ্রনাথের সাংবাদিকতা-ধর্মী কবিতারও প্রভাব-মুক্ত হতে পারেননি। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের দিনে সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম চারণ কবির ভূমিকা পালন করেন। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দিনে জীবনানন্দের কবিচেতনা সত্যেন্দ্রনাথেরই ধারা বহন করে এগিয়েছে—তাঁর "দেশবন্ধু" "বিবেকানন্দ" ও "হিন্দু-মুসলমান" প্রভৃতি কবিতা তার উজ্জ্বল নিদর্শন। আর এ কথা কে অস্বীকার করতে সক্ষম যে, জীবনানন্দই আধুনিক বাংলা কবিতার বাণী ভাব ও রসসৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ নতুন এক আদর্শের অভিমুখে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছেন?

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বাঙালি ও বাংলার চিরন্তন রূপ

প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ কবির নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তেরও তা ছিল। তখন রবীন্দ্রপ্রতিভা বাংলার সাহিত্য-আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো উজ্জ্বল। এই সময়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব কবি-প্রতিভায় দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক সদৃশ প্রভাময়। রবীন্দ্র-অনুসারী কবিগণের মধ্যে ছিলেন— করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়। এঁরা ছাড়াও ছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী অথচ স্বতন্ত্র ভাব ও কল্পনাবিশিষ্ট কবিগণ। এই সব কবি হলেন—প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুল ইসলাম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নানা কারণেই বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট কবি। তিনি ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারি মাতুলালয় নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রজনীনাথ দত্ত; মাতা মহামায়া দেবী। পিতামহ-মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এফ, এ. পাশ করেন। ছাত্রাবস্থায়, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' প্রকাশিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রধান প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে— ১. বেণু ও বীণা ২. তীর্থ-সলিল, ৩. তীর্থরেণু, ৪. ফুলের ফসল, ৫. কুহু ও কেকা, ৬. মণি-মঞ্জুষা, ৭. অভ্র-আবীর, ৮. বিদায় আরতি, ৯. কাব্য সঞ্চয়ন, ১০. সত্যেন্দ্রনাথের শিশু-কবিতা। এ ছাড়াও তিনি উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ-গ্রন্থ রচনা করেন। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জন্মদুঃখী (উপন্যাস), রঙ্গমল্লী (নাট্য), ও চীনেব ধূপ (নিবন্ধ)। ছন্দ- সরস্বতীর আশীর্বাদপ্রাপ্ত কবি সত্যেন্দ্রনাথ ৪১ বছর বয়সে, ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ জুন ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাঙালির একান্ত প্রাণের কবি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। বাঙালি জাতির চিরন্তন জীবনপ্রবাহ তাঁকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করত। বাঙালির অতীত যে বিশেষ গৌরবময় ছিল—কী শৌর্যে কী শিল্পসৃষ্টিতে কী সাহিত্যসাধনায়—সব দিকেই যে বাঙালি ছিল প্রাণবন্ত, তা তাঁর চোখে ছিল গর্বের বিষয়। বাঙালির বর্তমানে—কী স্বাদেশিকতায়, সাহিত্যের নব নব্ উদ্‌বোধনের আলোকোজ্জ্বল পর্বে, বিজ্ঞানসাধনায় অসামান্য কৃতিত্বে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। এ একদিন উন্নত জাতি হিসেবেও জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করবে—এও ছিল তাঁর গভীর প্রত্যাশার বিষয়। বাঙালি জাতিকে তিনি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে লক্ষ্য করেছেন। 'আমরা' কবিতায় কবি বলেছেন বাঙালির শৌর্যের কথা—

একহাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

বাঙালির জ্ঞানগরিমা ও সাহিত্যসাধনা কম গর্বের বস্তু নয়—

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান কপিল সাংখ্যকার
এই বাঙলার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙালীর ছেলে ফিরে এল দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙলার রবি জয়দেব কবি কান্ত কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

বাঙালির শিল্পসাধনাও বিশ্বের বিস্ময়—

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরের' ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজে 'ওঙ্কার ধাম,'—মোদেরি প্রাচীন কীর্তি।
ধেয়ানের ধনে মূর্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান,—যাদের নাম অবিনশ্বর।

বাঙালির বিজ্ঞানচিন্তা বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন ও অধ্যাত্ম-সাধনাও কবির মর্মে বাসা বেঁধেছে। ঐকান্তিক গৌরববোধ নিম্নোদ্ধৃত পঙক্তিগুলির যোগসূত্র রচনা করেছে—

তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া!
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালি দিয়েছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।

আর,—

বাঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।

পুনশ্চ, —

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী।
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।

কবির গভীর প্রত্যাশা, জগতে বাঙালি জাতির অবস্থিতির সার্থকতা এইভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করবে—

মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেব-ঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

বিজ্ঞান-সাধনায় কবি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বিজ্ঞান-সাধনার কথাই বিশেষভাবে মনে রেখেছিলেন। বিশ্বমৈত্রীর সাধনায় যে কবি মনীষী চিরকাল

আস্থাশীল ছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথের কথাই কবি এখানে স্মরণ করেছেন। রামকৃষ্ণদেবের অধ্যাত্মসাধনার কথাও কবি বলেছেন। পরিশেষে, কবির নিজস্ব বাঙালি-জীবনবোধ নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিতে অপূর্ব রূপলাভ করেছে—

বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙালীর গৌরবে।

'সাগর তর্পণ' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-তর্পণ করেছেন। এখানেও সেই অনন্যসাধারণ বাঙালি ব্যক্তিত্বের পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের একদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে—

বাংলাদেশের দেশী মানুষ! বিদ্যাসাগর বীর!
বীরসিংহের সিংহশিশু! বীর্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়
চক্ষে দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সংবর্ধনা উপলক্ষে রচিত 'মনীষী-মঙ্গল' কবিতায় কবি লিখেছেন—

জ্ঞানের মণি প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে।

  

দাস্য-কালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে;

—এতে একদিকে যেমন তাঁর আচার্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের পরাধীনতার বেদনাও কবির দারুণ মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবির আশা, পরাধীনতার গ্লানি ও মলিনতার অন্ধকারে আচার্যের আবিষ্কার আমাদের জাতীয় গৌরব ও আনন্দের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, 'হে তরুণ বন্ধু মোর'। সেই 'তরুণ বন্ধু' সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কী গভীর শ্রদ্ধা বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে আত্মজীবনে গৃহীত এবং জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছিলেন, তার পরিচয় আছে তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতায়। এই কবিতাগুলি হল—

'আভ্যুদয়িক', 'নমস্কার' ও 'শ্রদ্ধা-হোম'। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত 'আভ্যুদয়িক' কবিতায় কবি গভীর আন্তরিকতা ও বিস্ময়ে সমুৎসুক চিত্তে লিখেছেন—

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
প্রতিভার এই পুণ্য পূজায় সপ্তসাগর মিলল আসি'।

কোথায় শ্যামল বঙ্গভূমি,—কোথায় শুভ্র তুষার-পুরী—
কি মন্তরে মিলল তবু অন্তরে কে টানল ডুরি!

আবার একথাও লিখেছেন—

ধন্য কবি! কাব্য-লোকের ছত্রপতি! ধন্য তুমি,
ধন্য তুমি, ধন্য তোমার জননী ও জন্মভূমি।

'নমস্কার, কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ বাণী ও ছন্দ-সুষমার অসামান্য মিলনে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন। 'ছন্দের যাদুকর' কবি এখানে স্নিগ্ধগম্ভীর সুরে ও শ্রদ্ধানিবেদনের অনবদ্য ভঙ্গি-প্রকাশক ঋজু নম্র ও আবেগস্পন্দিত ছন্দোবৈচিত্র্যে আমাদের চিত্তকে সম্মোহিত করে রাখেন—

স্বদেশে যে সর্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশ দিক,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য-বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

'শ্রদ্ধা-হোম' কবিতার শেষাংশে কবি লেখেন—

তোমায় দেখে প্রাণ উথলে,
হাসি-উজল চোখের জলে
অফুট বোলে দেশ বলে—'জয়! জয়!'

সত্যেন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছু কিছু অবিস্মরণীয় কাব্য পঙ্‌ক্তি সৃষ্টি করেছেন। দু'একটি কবিতায় তাঁর কোন কোন উক্তি কিশোরসুলভ কৌতুক ও চাপল্যপূর্ণ বলে মনে হলেও, আসলে তা তাঁর স্বজাতিপ্রীতির বিশেষত্বেরই বহিঃপ্রকাশ। 'জাতির পাঁতি' জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে রচিত তাঁর এক আত্মপ্রত্যয়ে নির্ভরশীল অনিন্দনীয় কবিতা। এতে তিনি কেবল বাঙালির জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধেই বক্তব্য পেশ করেননি, উপরন্তু বিশ্বের সকল জাতিই যে এক 'আদিজননীর পুত্র' একথা বলে 'জাতির তর্ক' থামিয়ে দিতে চেয়েছেন।—

বাউরী, চামার, কাওরা, ডেওর,
পাটনী, কোটাল, কপালী, মালো,
বামুন, কায়েৎ, কামার, কুমোর,
তাঁতি, তিলি, মালি সমান ভালো;



বেনে, চাষী, জেলে, ময়রার ছেলে,
তাম্বুলী বারুই তুচ্ছ নয়;
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ,
সকল জগৎ ব্রহ্মময়।

কবির নির্দেশ—

সরে দাঁড়া তোরা বচন-বাগীশ
ভেদের মন্ত্র ডুবা রে জলে,
সহজ সবল সরল ঐক্যে
মিলুক মানুষ অবনীতলে।

কবি কখনো বা কোন উৎসব বা পার্বণকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বজাতিপ্রীতির স্বতন্ত্র ধরনের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়েছেন। 'তাতারসির গান' কবিতায় কবি লিখেছেন—

রসের ভিয়ান বার করেছি আমরা বাঙালী,
রস তাতিয়ে তাতারসি, নলেন্ পাটালি।

মধুর রসের আমরা গুরু,
(আজ) তাতারসির জন্মদিনে ভাবছি তাই খালি—
আমরা আদিম সভ্য জাতি আমরা বাঙালী।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় বাংলার চিরন্তন ছয় ঋতুর প্রকৃতি, নদ নদী বর্ষা, পর্বত অরণ্য ও সকলের অনুপম রূপশোভার বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলার পুষ্পরাজি ও বনভূমির বৃক্ষলতার অদেখা অজানা সৌন্দর্য এবং কিশোর মনের ভাবনায় ঘেরা পরীরাজ্যের রহস্যকে বিচিত্রবর্ণের তুলিকায় নানা বর্ণসম্পাতে চিত্রিত করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে পণ্ডিত 'ছন্দের যাদুকর' কবি ছিলেন। কিন্তু, যখনই তিনি কবিতা লিখেছেন, তখন মনে হয়, শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত সকল বাঙালির যে চিরন্তন অনুভূতি ও ভাবনা-কল্পনা—তাঁর কবিতার আবেদন তাদের সকলের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট। ফলে, বাংলার প্রকৃতিরাজ্যের অধীশ্বরী প্রকৃতির সকল রূপ রঙ রস গন্ধ সংগীত ও চিরকালীন বৈভব—তাঁর কবিতায় অবারিত করে ছড়িয়ে দিয়েছেন। গ্রামের জীবন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে কোনদিনই সরে আসেননি তিনি। কারণ, গ্রামের পরিবেশেই রয়েছে বাংলার অকৃত্রিম সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ সুধাপাত্রখানি। আর, গ্রামের জীবনছন্দেই বাঙালির জীবনের, বাংলার প্রকৃতির শ্যামল শোভন সুন্দর ও শাশ্বত রূপখানি কালের পটে অচঞ্চল, অথচ চিরবহমান। 'কোন্ দেশে' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল?
কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্বা কোমল?
কোথায় ফলে সোনার ফসল—
সোনার কমল ফোটে রে?
সে আমাদের বাংলা দেশ
আমাদেরি বাংলা রে!

বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনায় সত্যেন্দ্রনাথ যেমন ভাবের অভিনবত্ব তেমনই ছন্দের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। 'গ্রীষ্মের সুর' কবিতায় লিখেছেন—

দিবসের হৈম জ্বালা দীপ্ত দিকে দিকে, উজ্জ্বল-জাজ্বল-অনিমিখ,
নিঃশ্বসিছে, নিঃস্ব হাওয়া, হতাশে মূর্ছিত দশদিক্!
রৌদ্র আজি রুদ্র ছবি, আকাশ পিঙ্গল,
ফুকারিছে চাতক বিহ্বল,—
খিন্ন পিপাসায়;
হায়!

বর্ষা' কবিতায় কবি লিখেছেন—

বাদল্ হাওয়ায় আজ্‌কে আমার পাগ্‌লি মেতেছে;
আপন মনে গান গাহে সে নাই কিছু দৃক্‌পাত,
মুগ্ধ জগৎ, মৌন দিবা, সংজ্ঞাহারা রাত!

'চিত্রশরৎ' কবিতায় শরতের অতি সুন্দর চিত্রময় বর্ণনা আমাদের বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে—

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে!
মিশির জমি জমিয়ে ঠোটে শরৎরাণী পান খেয়েছে!
মেশামেশি কান্নাহাসি, মরম তাহার বুঝবে বা কে!
এক চোখে সে কাঁদে যখন আরেকটি চোখ হাসতে থাকে!

'মধুমাসে' কবিতায় বসন্ত-বন্দনা উল্লেখযোগ্য। 'কু'? 'মদন-মহোৎসবে' প্রভৃতি কবিতায় বসন্তের বৈচিত্র্যময় রূপ ও বিচিত্রভাবের আসা-যাওয়া বর্ণিত হয়েছে।

'হিমালয়াষ্টক' 'কাঞ্চন-শৃঙ্গ' ও 'মেঘলোকে' কবিতায় পর্বতমালা ও মেঘের অপরূপ রূপ-বর্ণনার সঙ্গে কবিমানসের সৌন্দর্যচেতনা ও জীবকল্যাণবোধ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবি 'মেঘলোকে' কবিতায় লিখেছেন—



রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া
উঠিল মেঘের দল,
শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া
চলিয়াছে টলমল;

'হিমালয়াষ্টক' কবিতায় কবি লিখেছেন—

নম নম হিমবান্!
মৌনে শুনিছ বিশ্ব-জনের দুঃখ-সুখের গান;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার
নিজ মস্তকে বহ অনিবার,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান;
নম নম হিমবান্!

নদনদীর সঙ্গে বঙ্গপ্রকৃতির অঙ্গাঙ্গি যোগ। দেশের প্রাণের ধারা যেন নদীর পুণ্যধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। যে বঙ্গভূমি কবির ধ্যানের জননীমূর্তি, তাঁরই হৃদয়ে প্রবাহিত গঙ্গা। কবি তাঁর 'গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি' কবিতার উপসংহারে তাই বলেছেন—

ধাত্রী! তোমায় দেখছি আমি—দেখছি জগৎ-ধাত্রী-বেশ,
জয়-গানে তোর প্রাণ ঢেলে মোর গঙ্গাহৃদি-বঙ্গদেশ!

'যুক্তবেণী' কবিতার উদ্ভব গঙ্গা ও যমুনা নদীর মিলিত জলধারার রূপ দর্শনে। 'যুক্তবেণী' কবিতার ছন্দ-হিল্লোলে নদীর তরঙ্গভঙ্গের কলকল্লোলের সুর শোনা যায়। এই সুর বড়োই শ্রুতিমধুর এবং ধ্বনিবৈচিত্র্যে মনোমুগ্ধকর। কবিতাটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা!
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা!
কালোচুলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ!
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব!
সখী-সুখে মুখে মুখে দুঁহু নিঃসঙ্গা!

প্রলয়ংকরী পদ্মার ভীষণ রোষে গ্রামের পর গ্রাম, বিরাট জনপদ ও নগর, গগনচুম্বী অট্টালিকা এবং বিশাল প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়। গঙ্গা জীবধাত্রী জননীরূপা, সে বঙ্গভূমি-মাতৃকার কণ্ঠহার। অপরদিকে, পদ্মা সৃষ্টিছাড়া বাঁধভাঙা তাণ্ডব নৃত্যপটীয়সী, প্রমত্তা ধ্বংসশীলা সমুদ্র-সহচরী—সমুদ্রে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সে প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে। কবির অনুভূতিতে পদ্মা বাঙালির ধ্বংস-চেতনার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে—

ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছে তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে;
না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা! অয়ি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী।

'ঝর্ণা' কবিতায় কবি ঝর্ণার সৌন্দর্য উন্মোচন করেছেন অপূর্ব ছন্দোসুষমায় এবং বিচিত্রবর্ণ ইন্দ্রধনুর মতো ভাব-বৈচিত্র্যে—

ঝর্ণা! ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিক স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনুভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল এক চির-কিশোর। সেই কৈশোরের স্বপ্নে বিভোর কবির মন নানা অচেনা অজানা রহস্যের দিকে খেয়ালী কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে গিয়েছে কখনো সজ্ঞানে, কখনো অজ্ঞান্তে। কিশোর মনের দুটি প্রধান লক্ষণ। এক, কারণে অকারণে বেদনা অনুভব এবং সহানুভূতি বোধ করা, আর, লঘু কল্পনার পাখায় ভর করে জগৎ ও জীবনের রহস্যরাজ্যে স্বপ্নবিহার করা। 'বিদ্যুৎপর্ণা' কবিতার সমাপ্তিতে কবি লিখেছেন—যা 'বিদ্যুৎপর্ণা'রই কথা—

গাও কবি! গাও গান
হে কিশোর-চিত্ত!
কিশলয় কর দান
চুম্বন-বিত্ত।
বাঁধ মোরে ছন্দে গো
বাঁধ ভুজবন্ধে গো,
তোমা' ঘিরি' ফিরি' ফিরি'
হের করি নৃত্য।।

'সবুজ পরী' নবজীবন সৃষ্টিশক্তি। মরুর শূন্যতার উপরে শ্যামলিমা বিস্তারের, নিত্য



নব নব বৃক্ষলতা ও তৃণে, শাখা প্রশাখা ও পল্লবে প্রাণসঞ্চারিণী শক্তির প্রতীক। দুর্গমের মধ্যে অভিযানে যেতে কঠোর যারা—তাদের প্রেরণাদাত্রী 'জর্দা পরী'। 'লাল পরী' কবিতায় শৈশব-স্বপ্নে-ঘেরা পরিবেশে শিশুদের মধ্যে স্নেহ প্রীতির আশ্বাস আদর সোহাগের পুলক নিয়ে আবির্ভূত হয় লাল পরী। 'নীল পরী' আমাদের জীবনে বহন করে আনে মৃত্যুর অনিবার্য সংকেত।

আমাদের ছেলেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ। তাদের ওপরেই জাতির গতি, উজ্জ্বল সম্ভাবনা এবং উন্নতি নির্ভর করছে। কবি বলেন—

ওই আমাদের চোখের মণি, ওই আমাদের বুকের বল,—
ওই আমাদের অমর প্রদীপ, ওই আমাদের আশার স্থল,—
ওই আমাদের নিখাদ সোনা, ওই আমাদের পুণ্য ফল,—
আদর্শে যে সত্য মানে—সে ওই মোদের ছেলের দল।

(ছেলের দল)

'কিশোরী' কবিতায় কিশোরীর রূপবর্ণনায় কবি তাঁর প্রাণ ও মনের সমস্ত আবেগ, বর্ণচয়নের আগ্রহ এবং সংগীতধ্বনিত কাব্য-বাঁশরীর সুর একত্র এনে কাব্যপাঠকের চিত্তে আনন্দ ও সৌন্দর্যসম্ভার উজাড় করে দিয়েছেন। একটি স্তবক উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

তারে আসতে দেখে ঘাটের পথে
শিউলি ঝরে লাখে লাখে,
জুঁয়ের বুকে নিবিড় সুখে
প্রজাপতি কাঁপ্‌তে থাকে।
জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা রং আলোক জ্বলে,
লুব্ধ ক'রে মুগ্ধ ক'রে
বৌ-কথা-কও কেবল ডাকে;
আর হাল্‌কা-বোঁটা ফুলের বুকে
প্রজাপতি কাঁপ্‌তে থাকে।

কোন কোন মাস সম্পর্কে লেখা কবিতায় ঐ মাস ও তৎসম্পর্কিত ঋতু সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ানুভূতির মর্মরহস্য কবি সুনিপুণ সৌন্দর্য চিত্রাঙ্কনে এবং আবেগ স্পন্দনের সুনিয়ন্ত্রিত প্রকাশে আমাদের নিকটে উন্মোচন করেছেন।

'জ্যৈষ্ঠী-মধু' কবিতায় কবি লিখেছেন—

ওগো কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে

জাম্‌রুলি-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী।

'ভাদ্রশ্রী' কবিতায় কবি লিখেছেন—

নক্‌লী রাতে চাষার সাথে চষা—ভূঁয়ের হচ্ছে বিয়ে,
হচ্ছে শুভদৃষ্টি বুঝি মেঘের চাদর আড়াল দিয়ে;
ক'নের মুখে মনের সুখে উঠছে ফুটে শ্যামল হাসি,
চাষার প্রাণে মধুর তানে উঠ্‌ছে বেজে আশার বাঁশী।

'পাল্কীর গান' ও 'দূরের পাল্লা' কবিতায় রয়েছে ছন্দের আন্দোলনের অপূর্বতা। আমাদের পরিচিত পরিবেশই পাল্কী এবং ছিপের আন্দোলনের তালে তালে নূতন হয়ে দেখা দেয়; আমাদের চকিত ও সম্মোহিত করে। 'পাল্কীর গান' কবিতায় কবি লিখেছেন—"পাল্কী চলে,/পাল্কী চলে—/ দুল্‌কি চালে/নৃত্য তালে"! আর, 'দূরের পাল্লা' কবিতায় কবি লিখেছেন— "ছিপ্‌খান্‌ তিন-দাঁড়—/ তিনজন মাল্লা/চৌপর দিন্‌-ভোর/দ্যায় দূর-পাল্লা।"

আর একটি প্রসঙ্গ দিয়ে এই আলোচনার উপসংহারে আসা যেতে পারে। বাঙালির জীবনে এটি একটি চিরন্তন সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্রের ঘরে কন্যার বিবাহ দিয়ে কন্যার মাতাপিতার আর উদ্বেগের অন্ত থাকে না। কৈলাসবাসিনী উমার পিতৃগৃহে হিমালয় তথা বাংলায় অল্প কয়েকদিনের জন্য আসায় মা মেনকা গভীর আনন্দে নিমগ্ন; তথাপি কোথাও এক তীব্র বেদনার সুর তাঁর মর্মে চিরতরে গাঁথা রয়ে গেছে। 'গিরিরাণী' কবিতায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার জনমানসের চিরন্তন আনন্দ-বেদনার বিমিশ্র-অনুভূতির বিশ্বস্ত রূপকার। 'গিরিরাণী' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে?
শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি;
উৎসুকী মন হঠাৎ কেন উদাস হয়ে পড়ে,
শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় ̗কাল মেঘের ঝড়ে।

কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন, "বাংলার মাটি জল, বাংলার হৃদয়ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যদি এ-দেশের কোনো কবির কাব্যের গভীর সংযোগ না থাকে, তবে তিনি বিশ্বকবি হতে পারেন,—বাঙালির কবি নন।"

অতঃপর, সত্যেন্দ্র বাংলা ও বাঙালির কবি কি-না তা বিচার করা কোন কঠিন কাজ নয়।

'আবহমান বাংলা, বাঙালী'র কবি জীবনানন্দ দাশ

॥ ১ ॥

জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ময়কর নাম। কবির ব্যক্তিত্ব, তাঁর কবিতার প্রকাশভঙ্গিমা ও বক্তব্যের স্বাতন্ত্র্য—একই সঙ্গে এসে আমাদের কখনো সম্মোহিত ও কখনো শিহরিত করে। তাঁর কবিতার অবলম্বন নিসর্গপ্রীতি স্মৃতিচারণা ইতিহাস-চেতনা, চিরন্তন কালের পটভূমিকায় মানবসত্তা ও মানবসভ্যতার ভাঙা-গড়া উত্থান-পতনের বৃত্তান্ত। কিন্তু সবই ধূসর স্বপ্নে-ঘেরা রোমাণ্টিক পরিমণ্ডলে এক ক্ষয়িষ্ণু বিনশ্বর ও বাস্তবের কঠোর সংসারের মধ্যে পরী-দেশের অলৌকিক জ্যোৎস্নার আভারকোমল আবেগে ও প্রচ্ছন্ন অশ্রুপ্রবাহে আচ্ছন্ন। দূরে দূরে বহুদূর দেশের অবিনশ্বর স্মৃতি, বাংলার প্রকৃতি হেমন্ত ঋতুর সর্ববিধ বিষণ্ণতা ও উজ্জীবন-শক্তি, বাংলার মাটি জল হাওয়া, নর-নারী গাছপালা, পশু পাখি ফুল তাঁর কবিতায় নতুন মাত্রা তাৎপর্য ও অর্থ লাভ করেছে। বাংলার নারীর রূপ, শাড়ি অঙ্গসজ্জা অলংকরণ, প্রেম বিরহ আর্তি আকুলতা, শ্মশান চিতা ছাই আগুন, বাংলার রূপকথা ইতিহাসের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশ ও কিংবদন্তী এক অনবদ্য ভাষা ও সংবেদনশীল শিল্পিত নমনীয় ভঙ্গিমায় রূপায়িত। জীবনানন্দীয় আপাতলুপ্ত রোমাণ্টিক-আবহমণ্ডলে প্রচ্ছন্ন তীব্র লুপ্ত-প্রেম-সুপ্ত- বেদনা-জাগানো, ম্লান হিমেল কুয়াশা-জড়ানো, হৃদয়ের গভীর উৎস থেকে উৎসারিত রোমাণ্টিক করুণার লাবণ্য নির্ঝরের গীতলতা মোহিনী মায়ার রাজ্যে ডাক দেয়। সেখানে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা আবহমান বাংলা ও বাঙালি আমাদের গভীর গোপন আত্মীয়তা-বন্ধনের রহস্যাবৃত রাত্রির নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোছায়ায় ওড়নার আবরণ উন্মোচিত করে দেয়। আমরা পুলকিত হই এবং যেইমাত্র বাস্তবের সংস্পর্শে আমাদের স্বপ্ন ভেঙে যায়, তখনই আবার আমরা নতুন করে সেই স্বপ্ন দেখার জন্যে ব্যাকুলতা অনুভব করি। জীবনানন্দের হেমন্তের জোৎস্না-কুয়াশা-হিম-জড়ানো রাত্রির মধ্যে আমরা চিরকাল খেলা করি, আকুল হই আমাদের অন্তরে অধরাকে ধরবার আকুতি নিয়ে, ব্যথিত হই লুপ্ত রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের অন্বেষণে ব্যর্থতার হাহাকারে।

॥ ২ ॥

জীবনানন্দের কাব্যে যে বাংলাদেশ উপস্থিত সে বাংলা বহু জনশ্রুতি কিছু ইতিহাস কিছু লোককথার উপাদানে স্মৃতির মায়ায় ঘেরা। যে বাঙালি জনসমাজ সেই বাংলায় বাস করে সে কত শত যুগ পার হয়ে আজও কবির স্মৃতিতে অম্লান—তা স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। কেবল আধুনিক অতীত বা ভবিষ্যতের বাংলার প্রাকৃতিক রূপ শোভা গন্ধ ও গান, জল মাটি ও হাওয়া, নর ও নারী নয়—চিরন্তন স্মৃতি-স্বপ্ন-মায়াঞ্জন আলিম্পনে কল্পনার সৌন্দর্য-দৃষ্টিতে ধরা বাংলা ও বাঙালির প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে কবির 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে। বাংলা ও বাঙালিকে আজীবন যে কী অসীম করুণ মধুর ভালোবাসায় নিজের অন্তরে গ্রহণ করেছিলেন কবি, তার পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে পরিশীলিত আবেগের



অনলংকৃত সৌন্দর্যে ধরা দিয়েছে।

॥ ৩ ॥

'রূপসী বাংলা'র কবিতাবলী সম্পর্কে জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন, "এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে এক শরীরী, গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ-প্রসূতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।"

নিবিড়ভাবে বাংলার নিসর্গের মধ্যে ডুবে যাওয়া মরে যাওয়া এবং নবজন্ম নবজীবনের প্রত্যাশা ভালোবাসা নিয়ে জেগে ওঠা—'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের এইটিই মূল সুর। কখনো কেবলমাত্র প্রকৃতি-রাজ্যে তিমিরাভিসার, কখনো বা মানুষে প্রকৃতিতে মিলে একাত্মতা ও নিরবচ্ছিন্ন মাধুর্যস্রোতে নিমগ্ন হয়ে যাওয়ার চিত্রময় বর্ণনা অতি অপরূপ হৃদয়-সংবেদ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কবির কবিতায় তার পরিচয় আছে—

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে ব'সে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের অশথের ক'রে আছে চুপ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে;....

কবি প্রকৃতির মধ্যে ডুব দিয়েছেন খেয়ালী কল্পনার আবেশে, নিভৃত নির্জন অবকাশে—

একদিন জলসিড়ি নদীটির পারে এই বাংলার মাঠে
বিশীর্ণ বটের নিচে শুয়ে র'ব ;—পশমের মতো লাল ফল
ঝরিবে বিজন ঘাসে,—বাঁকা চাঁদ জেগে র'বে,—নদীটির জল
বাঙালী মেয়ের মতো বিশালাক্ষী মন্দিরের ধূসর কপাটে
আঘাত করিয়া যাবে ভয়ে ভয়ে......

বাংলার শ্রাবণের বিস্মিত আকাশ
চেয়ে রবে; ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে
শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প—ভাসানের গান নদী শোনাবে নির্জনে;



চারিদিকে বাংলার ধানী শাড়ি—শাদা শাঁখা-বাংলার ঘাস
আকন্দ বাসকলতা ঘেরা এক নীল মঠ—আপনার মনে
ভাঙিতেছে ধীরে ধীরে;.....চারিদিকে এই সব আশ্চর্য উচ্ছ্বাস.....

রূপকথার আবেশে স্বপ্নমন্থর লঘুভার কল্পনার পাখায় ভেসে-যাওয়া কবিমনের ক্ষণকালের স্থিতি লক্ষ্য করি বাংলার পল্লীর সন্ধ্যাকালীন রূপবর্ণনার মধ্যে—

......আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা... কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে;
আমার চোখের'পরে আমার মুখের'পরে; চুল তার ভাসে;
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখেনিকো-দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে
পৃথিবীর কোনো পথেঃ নবম ধানের গন্ধ—কল্‌মীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখান,
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস, —লাল লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ ঃ

'বাংলার প্রাণ' কোথায়, তা কবি এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন,—উপলব্ধি করা সহজ হয়।

কবি অতীতের মধ্যে বর্তমানকে খোঁজেন। বর্তমানে তাঁর সম্পূর্ণ তৃপ্তি নেই। তাই তিনি ডুবে যেতে চান আবহমানে—

........পাঁচশো বছর আগে হয়তো বা—সাতশো বছর
কেটে গেছে তারপর তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে;
ধান কাটা হয়ে গেলে মাঠে মাঠে কতবার কুড়ালাম খড়,
বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে,
ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে

মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাঁকা হল খড় আর ঘর।

কবি সাম্প্রতিক কালোত্তীর্ণ নিত্যকালীন সত্তা, তিনি বাঁধা নন কোন সমাজবন্ধনে। তাই তিনি বলেন, "তোমাদের আম জাম কাঁঠালের দেশে—তিনি অচেনা আগন্তুক। তিনি বাংলার প্রকৃতির সৌন্দর্যবন্দনায় উন্মুখর হয়েও এক আশ্চর্য শিল্পিসুলভ নিরাসক্তিতে আত্মনিমগ্ন এবং সুদূরবর্তী। তাঁর কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে ঃ

কোথাও চলিয়া যাব একদিন;
—তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতকাল জানিব না আমি;

পুনশ্চ—

তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চলে যাবে;
—চোখের উপরে
নীল মৃত্যু উজাগর—বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—

মৃত্যুর এই নিরাসক্তির আবরণ দিয়ে তিনি অনায়াসে ঢেকে রাখেন তাঁর বঙ্গপ্রকৃতির প্রতি অপরিসীম প্রীতি। কিন্তু তবু আবার এক জীবনরসবিভোর কবিসত্তাকে উজ্জীবিত হতে দেখি আশ্চর্য সুষমায়, করুণ মমতায় লাবণ্য-নির্ঝর-সিঞ্চিত ব্যাকুল পুনর্জন্ম-প্রত্যাশায়—

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়·
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়।



আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে

বাংলার প্রকৃতিতে এই যে সর্বাত্মক আত্মনিমজ্জন— তা তাঁর অপূর্ব নিসর্গপ্রীতির অম্লান স্বাক্ষর বহন করে। বস্তুত তাঁর সমগ্র কবিজীবনের আদি মধ্য ও অন্ত—সকল পর্বেই প্রকৃতি তাঁর কাব্য-ভাবনার মূল উৎস। তাঁর জীবনে প্রকৃতির অস্তিত্ব যে ব্যাপক ও গভীর 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতায় তার অম্লান স্বীকৃতি—

লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার
গলিতে নেমে আসে;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজো যেন

লেগে আছে বহুতা পাখায়
ঐ সব পাখিদেব, ঐ সব দূব দূব ধানক্ষেতে,
ছাতকুডোমাখা ক্লান্ত জামেব শাখায়

॥ ৪ ॥

'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে আমবা বিভিন্ন ভাবেব প্রবাহ লক্ষ্য কবি। প্রথমত, এতে আছে ইতিহাস-চেতনা কিংবদন্তী রূপকথা প্রভৃতিব সমাবেশ। জীবনানন্দ এ সম্বন্ধে বলেছেন, "সময়-ও-সীমা-প্রসূতির ভিতব সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে আমি ভালোবাসি। কবিতাব অস্থি-ব ভিতবে থাকবে ইতিহাস চেতনা, মর্মে থাকবে পবিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।" ইতিহাস কিংবদন্তী ও রূপকথা, জনশ্রুতি ও চিবন্তন জন-জীবনেব নিত্যসৌন্দর্য কবিকল্পনায় নতুন আবেগ ও সর্জনশীল প্রতিভাব আলোকে নতুন অর্থ পেয়েছে। তাতে এসে মিশেছে সুদূব কালেব সুদূব দেশেব বিষণ্ণতা অথবা হাবানো উজ্জ্বলতাব বোমান্টিক স্মৃতিচিত্র। উৎকণ্ঠায় ঐ নিত্যসৌন্দর্যেব সঙ্গলাভেব তীব্র আকাঙ্ক্ষা কবিচিত্তকে কবেছে ব্যাকুল বিহ্বল দিশাহাবা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কবা যায় যে, 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থেব 'হাওয়াব বাত' কবিতায় কবি লিখেছিলেন—

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেবা কাল জেগে উঠেছিল আকাশে
একতিল ফাঁক ছিল না,
পৃথিবীব সমস্ত ধূসব প্রিয় মৃতদেব মুখও সেই নক্ষত্রেব
ভিতব দেখেছি আমি
অন্ধকাব বাতে অশ্বত্থেব চূডায় প্রেমিক চিলপুরুষেব শিশিব
ভেজা চোখেব মতো ঝলমল কবছিল সমস্ত নক্ষত্রেবা,
জ্যোৎস্নাবাতে বেবিলনেব বাণীব ঘাডেব ওপব চিতাব উজ্জ্বল
চামডাব শালেব মতো জ্বলজ্বল কবছিল বিশাল আকাশ।
কাল এমন আশ্চর্য বাত ছিল।
যে নক্ষত্রেবা আকাশেব বুকে হাজার হাজাব বছব আগে
মবে গিয়েছে তাবাও কাল জানালাব ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ
সঙ্গে কবে এনেছে, যে রূপসীদেব আমি এশিবিয়ায়, মিশবে, বিদিশায়
মরে যেতে দেখেছি কাল তারা অতিদূবে আকাশেব সীমানাব
কুয়াশার কুয়াশায় দীর্ঘ বর্শা হাতে করে কাতারে কাতাবে
দাঁড়িয়ে গেছে যেন—

'রূপসী বাংলা' কাব্যে ইতিহাস-চেতনার দুই দিক— ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের স্মৃতি এবং জনপদ-জীবনের আবহমান সৌন্দর্যময় রূপালেখ্য বর্ণনা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণা—

.... সীতারাম রাজারাম রামনাথ রায়—
ইহাদের ঘোড়া আজো অন্ধকারে এই ঘাস ভেঙে চলে যায়—
অন্যত্র—কেউ নাই কোনোদিকে—তবু যদি জ্যোৎস্নায়
পেতে থাক কান শুনিবে বাতাসে শব্দঃ 'ঘোড়া চ'ড়ে কই যাও হে
রায়রায়ান—'

যুগ-যুগান্তরের সময় অতিক্রম করে চলেছে মহাকালের রথের ঘোড়া;—সেই 'ঘোড়া' জীবনানন্দীয় ইতিহাস চেতনার মধ্যে বিশেষভাবে উপস্থিত—

বল্লাল সেনের ঘোড়া—ঘোড়ার কেশর ঘেরা ঘুঙুর জিনের
শব্দ হত এই পথে—আরো আগে রাজপুত্র কতদিন রাশ
টেনে টেনে এই পথে কি যেন খুঁজেছে......

জীবনানন্দের কবিতা স্মৃতিময় স্মৃতি স্বপ্নময় স্বপ্ন রহস্যময়, দূর দেশ কাল কুয়াশাময়—তাদের অস্তিত্ব কবিচেতনার আকাশে আলো-আঁধারে নীহারিকাময়। কিন্তু এই কবিতা কোথাও দুর্বোধ্য নয়—কারণ কবির ভাবনার উৎসার আত্মমগ্নতা এবং এক ধরনের চরাচর-প্রেম থেকে। কবি বলেন—

আমাদের সত্য, আহা, রক্ত হয়ে ঝরে শুধু; আমাদের
প্রাণের মমতা ফড়িঙের ডানা নিয়ে ওড়ে, আহা ঃ চেয়ে দেখে
অন্ধকার কঠিন ক্ষমতা ক্ষমাহীন—বারবার পথ আটকায়ে ফেলে—বারবার
করে তারে গ্রাস; তারপর চোখ তুলে দেখি অই কোন্ দূর নক্ষত্রের ক্লান্ত
আয়োজন ক্লান্তিরে ভুলিতে বলে—ঘিয়ের সোনার-দীপে লাল
নীল শিখা জ্বলিতেছে যেন দূর রহস্যের কুয়াশায়,—আবার স্বপ্নের
গন্ধে মন কেঁদে ওঠে;—তবু জানি আমাদের স্বপ্ন হতে অশ্রু ক্লান্তি রক্তের কণিকা
ঝরে শুধু—স্বপ্ন কি দেখেনি বুদ্ধ—নিউসিডিয়ায় বসে দেখেনি মণিকা?
স্বপ্ন কি দেখেনি রোম, এশিরিয়া, উজ্জয়িনী, গৌড়, বাংলা, দিল্লী, বেবিলন?

জনপদ-জীবনের আবহমান সৌন্দর্য কবির কাব্য-নির্মিতির এক বিশেষ উপাদান। ইতিহাস-চেতনা-নির্ভর কবিতার মধ্যে এই সৌন্দর্য পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে। কবি লিখেছেন—



মধুকুপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি-রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালীদেহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়
আসিয়াছে চণ্ডীদাস ... .
শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা; মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে 'শঙ্খমালা' কবিতায় শঙ্খমালার রূপ কবি কেমনভাবে চিত্রিত করেছেন তা লক্ষ্য করা যেতে পারে—

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা;



কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে ঃ দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়



চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো ফিরে আর।

'রূপসী বাংলা'র কবিতায় আবার ফিরে এসেছে বাংলার অতীত কালের সুদূর সুন্দরীরা—

....কিশোরীর ভিড়
আমের বউল দিল শীতরাতে;—আনিল আতার হিম ক্ষীর;
মলিন আলোয় আমি তাহাদের দেখিলাম,—এ কবিতা লেখা
তাহাদের ম্লান চুল মনে ক'রে; তাহাদের কড়ির মতন
ধূসর হাতের রূপ মনে ক'রে; তাহাদের হৃদয়ের তরে।



তাদের হলুদ শাড়ি—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চ'লে গেছে পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরেঃ
আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।

এইসব কবিতায় এক ধরনের নির্জন ইতিহাস-বোধ-নির্ভর স্মৃতিচারণা কাজ করে গেছে।

দ্বিতীয়ত, 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি সম্পর্কে কবিচিত্তের এক গভীর আত্মীয়তাবোধ অনুভব করি—যার গভীর গহন রূপ আমাদের সম্মোহিত করে। এই কাব্যে মানবিক প্রেমের মধ্যে সুদূর দেশকালের আবহাওয়ার বিষণ্ণতা স্বপ্নমন্থরতা এক অতিরিক্ত সঞ্চারী রস সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ করা যায় 'বনলতা সেনে'র 'ঘাস' কবিতা দিয়ে—

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভবে গিয়েছে এই ভোরের বেলা;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস তেমনি সুঘ্রাণ
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের এই ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

কবির মননে স্থান পেয়েছে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের নিবিড়তা মাধুর্য ও পুলক-শিহরণ। মানবিক প্রেমে দূর দেশ-কালের বিষণ্ণতা—

কোথায় পাহাড় দূরে শাদা হয়ে আছে যেন কড়ির মতন,—
সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দিনভোর ফেটে যায় রূপসীর বুক;
তবুও সে বোঝে নাকি আমারো যে সাধ আছে-আছে আনমন
আমারো যে—চন্দ্রমালা, রাজকন্যা, শোন শোন তোল তো চিবুক।

পুনশ্চ—

পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দু'জনার মনে;
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।



তৃতীয়ত, বাংলার মঙ্গলকাব্য রূপকথার জগতে তাঁর মনঃসংযোগ গভীর। হারানো দিনের হারানো জগতের স্বপ্নমায়ায় আত্মমগ্ন স্মৃতিচিত্র রচনার মধ্য দিয়ে এক ধরনের দেশাত্মবোধ উপলব্ধি করা যায় তাঁর কবিতায়। প্রচলিত অর্থে তা দেশপ্রেম নয়, কিন্তু প্রকৃতি-মানুষ-স্মৃতি-সংবেদনা অন্য এক ধরনের দেশপ্রীতির সৃষ্টি করে আমাদের মনে, যা পরে বিশ্ববোধের দিকে উদ্‌বোধিত করে চিত্তকে। বাংলা দেশ—প্রচলিত অর্থে ইতিহাসে খ্যাত স্থান হিসেবে নয়, কিন্তু মানব-সংসারের এক অংশের বাসস্থান হয়ে কিভাবে স্মৃতি-স্বপ্ন-ভাবনা-কল্পনায় যুগের পর যুগ ধরে বিকশিত হয়ে উঠেছে তার পরিচয় 'রূপসী বাংলা' কাব্যে পাওয়া যায়। কবিতা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ—

আজ সারাদিন এই বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়ায়
চাঁদ সদাগর ঃ তার মধুকর ডিঙাটির কথা মনে আসে,
কালীদহে কবে তারা পড়েছিল একদিন ঝড়ের আকাশে,
...... আহা, ঐ ঘাটে এলানো খোঁপার
সনকার মুখ আমি দেখি না কি? বিষণ্ণ মলিন ক্লান্ত কি যে
সত্য সব;—তোমার এ স্বপ্ন সত্য, মনসা বলিয়া গেল নিজে।

পুনশ্চ—

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়



বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,
আমারে দিয়েছে তৃপ্তি;.......
.... বেহুলার লহনার মধুর জগতে
তাদের পায়ের ধুলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন...

রূপকথার জগতে কবির কল্পনার পাখায় ভর করে উড়ে যাওয়া—

খই রঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন কাহিনীর দেশে—
'পরাণ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে.......

স্বদেশ বিশ্ব ও বাংলাদেশের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কবিতায় নতুন সুরে নতুন আঙ্গিকে—

লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে?
সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

চারিদিকে শান্ত বাতি-ভিজে গন্ধ-মৃদু কলরব,
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে র'বে চিরকাল;—
এশিরিয়া ধুলো আজ—বেবিলন ছাই হয়ে আছে।
কোথাও চলিয়া যাব একদিন; তারপর রাত্রির আকাশ
অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে ঘুরে যাবে কতকাল জানিব না আমি..

কবি তাঁর মৃত্যুকামনা করেছেন এইভাবে—তাতেও বাংলার ছবি ফুটে উঠেছে অন্য বর্ণে অন্য রূপে—

কখন মরণ আসে কেবা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলেব নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো; তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনায় নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

সর্বশেষে লক্ষ্য করা যায় কবির জীবন-দর্শনও ধরা দিয়েছে 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে। জীবনানন্দের জীবনদর্শন অনুসন্ধান করলে দেখতে পাই যে, তিনি মনে করেছেন, মানুষের কাছে পৃথিবীর সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এক 'স্বপ্নের জগৎ' থেকে যায়। জীবনেব সব রণ রক্তপাত ও সফলতা, বেদনা নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার হিসেব শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ভাবুক কবির জন্যে অবশিষ্ট থাকে স্মৃতির জগৎ স্বপ্নের জগৎ অবিনশ্বর কল্পনার নানা-রঙে-আঁকা অনুভূতি ও শিল্পসৃষ্টির জগৎ। এই জগতের কথা আছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'স্বপ্নের হাতে' কবিতায়—

উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়।
পৃথিবীর পুরোনো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়।



'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থে কবি এই 'স্বপ্নের জগৎ'-এর কথাই নানা ভাবে বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য তাঁর শিল্পকৌশল! তাঁর কবিতা কখনো একঘেয়ে লাগে না, প্রতি মুহূর্তে মনে হয় নিত্য নতুন। তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' নিবন্ধে তিনি বলেছেন "প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনা প্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্র ভাবে সৃষ্ট হয়, এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয়।" জীবনানন্দের কাব্যভাষা ও কাব্যাঙ্গিকে যে 'অপরূপ সঙ্গতি' খুঁজে পাওয়া যায় তার মূলে আছে তাঁর অনন্য জীবন-দর্শন। 'রূপসী বাংলা'য় সেই জীবন-দর্শন অপূর্ব কবিতা সৃষ্টি করেছে—

.....মানুষের হৃদয়ের পুরোনো নীরব
বেদনার গন্ধ ভাসে;—খড়ে চালের নিচে তুমি আর আমি
কতদিন মলিন আলোয় ব'সে দেখেছি বুঝেছি এই সব;
সময়ের হাত থেকে ছুটি পেয়ে স্বপনের গোধূলিতে নামি
খড়ের চালের নিচে মুখোমুখি বসে থেকে তুমি আর আমি
ধূসর আলোয় ব'সে কতদিন দেখেছি বুঝেছি এই সব।

কবি জীবনানন্দের বিশ্ব-চেতনার মধ্যে বাংলাদেশ-চেতনা কিছু পরিমাণে সম্প্রসারিত, আবার বাংলা ও বাঙালির কথার মধ্যেও কখনো কখনো তাঁর আবহমান বিশ্বব্যাপ্ত দেশ-কাল-চেতনা ও বিশ্বমানব-সংসারচিন্তা ছায়া ফেলে গেছে।

মানবদরদী কবি সুকান্ত

এক

সহমর্মিতার ঐতিহ্য

কবিকিশোর বলেছিলেন ঃ

এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান;
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের।
চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

কবি ছিলেন বিশেষ রাজনৈতিক ভাবাদর্শের অনুগামী। বাংলাকাব্যে নিপীড়িত জনগণের প্রতি সমবেদনা এর পূর্বে দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল ঃ১. পরাধীনতার বেদনা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও শোচনীয় মূঢ়তার অসহায়তার অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য কবির সংকল্প গ্রহণ, ২. ধনিকতন্ত্র বণিকতন্ত্রের চক্রান্ত, সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক ছলনা, ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের অত্যাচার, জাতের নামে বিভেদপন্থীদের বজ্জাতি, কালোবাজারি, মুনাফা শিকারীদের জমিদার জোতদারদের দীনদরিদ্র অসহায় জনগণের প্রতি অবিচার ও নিষ্ঠুর শাসন শোষণে বিক্ষুব্ধ কবিচিত্তের বিদ্রোহ ও সংগ্রামের জন্য উদাত্ত আহ্বান। প্রথম ধারা প্রবাহিত হয়েছে বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রকাব্যে। দ্বিতীয় ধারার কবি নজরুল। কিন্তু এঁরা কেউ বিশেষ কোন রাজনৈতিক মত বা আদর্শ অবলম্বনে কবিতা লেখেন নি। মার্কসবাদী চিন্তাধারা, কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মপরিকল্পনা ও বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বমানবতার অকুণ্ঠ সমর্থক উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বরের কবি কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—
"মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।...



এতে আছে দেশবাসী 'মূঢ় মূক' জনগণের জাগরণের আহ্বান। কিন্তু চিরকাল কেউ তথাকথিত মূঢ় মূক জনগণকে জাগ্রত করতে সাহায্য করে যাবে না। তাই চাই আত্মিক জাগরণ। রবীন্দ্রনাথের জনচিত্ত জাগরণের বাণীর মর্মকথা জনগণের আত্মশক্তিও আত্মবোধের উদ্বোধন।

আর নজরুলের আহ্বান, জনতার সারিতে দাঁড়িয়ে জনগণের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জনজীবনের সঙ্গী হয়ে তাদের জীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হতে। 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের 'সর্বহারা', 'সাম্যবাদী', 'ফরিয়াদ,' ও 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় কবি দেশকালের বন্ধন ছাড়িয়ে বৃহৎ বিশ্বের মানব সংসার প্রাঙ্গণে যেন এক সৈনিক, সংগ্রামী বীররূপে বিদ্রোহী। ভাবালুতা ও ভাবুকতার জাল ছিন্ন করে সব ভালোমানুষী শোভনতার ছদ্মবেশ দূর করে সকল জড়তা তামসিকতার কুহেলিকা দীর্ণ করে আগামী দিনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দীপ্ত মধ্যাহ্নে সবাইকে আহ্বান জানিয়েছেন অত্যাচার নির্যাতন অপমান ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জাগ্রত হতে উত্থিত হতে। তিনি শেষ পর্যন্ত দেখেছেন—

চির-অবনত তুলিয়াছে আজ গগনে উচ্চশির!
বান্দা আজিকে বন্ধন ছেদি' ভেঙেছে কারা-প্রাচীর।
এতদিনে তার লাগিয়াছে ভালো
আকাশ বাতাস বাহিরের আলো,
এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে ত্রাণ।
মুক্ত-কণ্ঠে স্বাধীন বিশ্বে উঠিতেছে একতান—
জয় নিপীড়িত প্রাণ!
জয় নব অভিযান!
জয় নব উত্থান!

১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ —এই সময়-সীমায় নজরুলের বিদ্রোহী কবিমানসের সার্থকতম প্রকাশ ঘটেছে। এর পর পূর্ব ঐতিহ্য নতুন বাঁক নিয়েছে। নিপীড়িত জনগণ—সর্বহারা শ্রেণীকে এক দেশের সীমারেখায় আবদ্ধ করে দেখা হয় নি। বিশ্বের সমস্ত দেশের উৎপীড়িত নিগৃহীত জনগণের অথবা বাঙালির উৎপীড়িত নিগৃহীত অংশে বিশ্বমানবতার ক্রন্দনধ্বনিকে সমবেদনার সহানুভূতির ভাবে ব্যঞ্জনায় কবিতায় রূপ দিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়—তাঁরযাত্রা শুরু ১৯৩৮এ। পাশাপাশি আর একটি ধারা চলেছিল যাতে ছিল একদিকে অন্তর্মুখী তিক্ততা জ্বালা দহন ও সহানুভূতির ঝর্নাধারা—যার প্রকাশ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়, বহির্মুখী প্রবাহ গতিময় অভিযান ও রোমান্টিক উদ্দীপনায় অতন্দ্র ছন্দোঝংকারে ও ভাবুকতার উদ্দীপনে প্রকাশ পেয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়।

যতীন্দ্রনাথ—'কবি নহি' কবিতায়—

জানি না সে ব্যথা কবে হবে কোথা শেষ,
শুধু জানি আমি ধরেছি নিরুদ্দেশ
অনন্ত ছায়াপথ,
বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলেছে তিমির-ললাট'পরে
মানুষের দাসখৎ।
কবি নহি আমি, করিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র—তাঁর 'আমি কবি যত কামারের' কবিতায়—

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
— আমি কবি যত ইতরের!
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই!

একদল সৈনিক বেরিয়ে পড়েছে বিশ্বের মুক্তির দিন আনতে—সেই সব 'সূর্যসেনা'—প্রশ্ন করছেন কবি 'ফেরারী ফৌজ' কবিতায়—

এখনো ফেরারী কেন?
ফেরো সব পলাতক সেনা
সাত সাগরের তীরে
ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো;
আনো সব সূর্য-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হ'ল ফেরারী ফৌজের।

এই সব ভাবে আভাসে যা ছিল গণচেতনার ইঙ্গিতবাহী গণজাগরণের বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের সংকেতচিহ্ন—তাই বিশেষ পটভূমিকায় মার্কসীয় চিন্তায় উদ্দীপিত কবি সুভাষ



মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় নতুন তাৎপর্যে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর কবিতা চিত্তজয়ী সার্থকতা পেল নতুন ভাষা কাব্যাঙ্গিক ও সচেতন সংলাপভাষণধর্মী শিল্পপ্রকর্ষে। কখনো প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে , কখনো সহজ সরল উক্তির মধ্য দিয়ে অসমসাহসিক আত্মবিশ্বাসে কখনো বা নিয়ন্ত্রিত আবেগের অন্তর্নিহিত মূর্ছনায় কবিচিত্ত যুগযন্ত্রণার সায়াহ্ন—রাগরক্তকে ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্যপংক্তিমালায়—

প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না; নেবো তীর-ধনুক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই;
দেহ না-চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।

কবি পুনশ্চ বলেছেন—

মুক্তিদাতা মজুর চাষা—
নতুন আশা সামনে।

পরিণত কবিতাভাবনা কবিকে যেমন আঙ্গিক সচেতন করে তুলেছে তেমনই তিনি তাঁর মনের দ্বার অবলীলায় খুলে দেখিয়েছেন কেমন ভাবে তিনি তাঁর কবিকর্মকে যুগচিন্তার বাহন করে তুলতে পারেন, তাঁর প্রত্যয় ও মননধর্মী কাব্যশিল্পকে কর্মজীবনের কর্মিজীবনের পাশাপাশি এনে দাঁড় করাতে পারেন, কবিতা রচনা যে ভাববিলাসী কবির সাকীর সঙ্গে সুরাচর্চার মণিহর্ম্য বিলাস নয়, পরন্তু তা দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম তা তিনি দেখিয়েছেন অপূর্ব শিল্পিসুলভ সৌজন্যে—

আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।
আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা

ট্র্যাকটরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি—
এই আমার ছুটি
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও॥

সুকান্ত এই সমস্ত ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কবিতাকে তিনি কেমন ভাবে রূপ দিতে চাইতেন, কবিতাকে তিনি কেমন ভাবে কাজে লাগাতে চাইতেন, Art for art's sake নয় বরং কবিতাকে জীবনসঙ্গী—গণজীবনের সঙ্গী করে তুলতে চেয়েছিলেন তা তাঁর কবিতা থেকেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সময়ে বিশ্ববন্দিত বাঙালি কবি। তাঁর মানবমুখী মননধারা ও মানবজীবনের 'খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা' ও 'শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি'র বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক ও কায়িক মানসিক সংগ্রাম সম্পর্কে কবির কৈশোরে বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মেছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের পুনরাবির্ভাব কামনা করে 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশ্যে' কবিতায় বলেছেন—

আমার প্রার্থনা শোনো পঁচিশে বৈশাখ
আর একবার তুমি জন্ম দাও রবীন্দ্রনাথের।
হতাশায় স্তব্ধ বাক্য; ভাষা চাই আমরা নির্বাক,
পাঠাব মৈত্রীর বাণী সারা পৃথিবীকে জানি ফের।

কবি স্মরণ করেছেন—

রবীন্দ্রনাথের সেই ভুলে যাওয়া বাণী
অকস্মাৎ করে কানাকানি
'দামামা ঐ বাজে, দিন বদলের পালা
এল ঝড়ো যুগের মাঝে'।

কবির প্রত্যাশা—

এবারে নতুনরূপে দেখা দিক রবীন্দ্র ঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।

সামগ্রিকভাবে বিচারে রাজনৈতিক মতাদর্শের কবি হলেও তিনি মানবদরদী কবি হিসেবে যুগোত্তীর্ণ ক্রান্তদর্শী অনাগত জনজীবনের নতুন স্বাস্থ্য সমৃদ্ধি ও উজ্জ্বল বৈভবের



কবি। হিংসা তাঁর জীবনে বর্জিত নয় এ হিসাবে বুদ্ধ বা গান্ধীর বিরাট প্রভাবের কাছে তাঁকে নতশির ক্ষুদ্রকর্মা মনে হতে পারে, কিন্তু কবিকিশোর বহির্জীবনের প্রকাশে হিংসাকে আশ্রয় করলেও এবং লেনিন ও মার্শাল টিটোর মানবমুক্তির বাণী ও বিপ্লবস্পন্দনের জয়ধ্বনি তুলে উচ্ছ্বসিত হলেও—অন্তরে অন্তরে তিনি চিরমানবকল্যাণকামী এক স্বপ্নদ্রষ্টা ও ন্যায় সত্য সুন্দরের পূজারী ভাবুক। সংকীর্ণচিত্ত নন বলেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সব ক্ষোভ সংঘাত বিরোধ ও দুর্যোগের মধ্যেও—

আর মনে ক'রো আকাশে আছে এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মর ধ্বনিতে আছে আন্দোলনের ভাষা,
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।

ধ্রুবনক্ষত্রে সত্য, নদীর গতির মধ্যে চিরপ্রবাহমান জীবনচ্ছন্দ, অরণ্যের মর্মরে জীবনানন্দের চাঞ্চল্য ও নব নব কম্পনাবেগ এবং পৃথিবীর আবর্তনে আবর্তিত মানববিশ্বের ভাঙাগড়া উত্থান-পতন—এই সমস্তের পারম্পর্য এবং অনাদি অনন্ত রহস্য নিবিড় গভীর রূপকের মতো মানবজীবন মর্মসত্য ব্যাখ্যা যে কবির নয়নে ধরা পড়েছে, মানববিশ্বের বাস্তব সমস্যাজর্জর যে কবির হৃৎস্পন্দনে বীণাঝংকার তুলেছে—তিনি অবশ্যই মানববন্ধু সৎ কবি। এখানেই তাঁর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠত্ব।

দুই

সমাজচেতনা ও প্রাসঙ্গিক কবিত্বপ্রেরণা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়' গ্রন্থে নজরুল সম্বন্ধে বলছেন "নজরুলের সমস্ত ঝড়ের অন্তরালে একটি গভীর শান্তি আছে বিষাদ আছে যার জন্ম প্রেমে। সেইটিই নজরুলের সমস্ত দহনদীপ্তির উৎসমুখ। যে প্রদীপের শিখায় দাবানল জ্বলেছে সে প্রদীপটি আসলে গৃহকোণের স্নিগ্ধ প্রদীপ ....."—এ কথা সুকান্ত সম্বন্ধে বলা চলে। বলা চলে তাঁর সমস্ত কাব্যচেতনার মূল সুর মানবপ্রেম। যে স্নিগ্ধ শান্তিকে প্রোজ্জ্বল করে তুলছিল গৃহকোণের দীপশিখা তাই বিনষ্ট হল যখন শিখাটি বিচিত্র দহন ছড়িয়ে দিল পল্লীতে পল্লীতে। এমনটি হবার কারণ ঝড়,—মানবমুক্তির আন্দোলনের ঝড়। বিশ্বব্যাপী মানবমুক্তির যে বিপ্লব বিদ্রোহের ঝড় উঠেছিল সেদিন তার আবেগে উন্মথনে বিশ্বকবিচিত্ত জেগে উঠেছিল প্রবল বিক্ষোভে। সুকান্ত সেই ঝড় ও অগ্নির কবি। যে কিশোর চোখে স্বপ্ন নিয়ে সুন্দর করে দেখতে চেয়েছিল পৃথিবীকে, যখন সে তা পেল না তখনই সে অগ্নিময় ঝড়ের কেন্দ্র থেকে মশাল জ্বালিয়ে ছুটে গিয়েছিল তাদের দিকে যারা তার স্বপ্নের সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করেছে ধ্বংস করেছে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে বীভৎস নারকীয় তাণ্ডব নৃত্য।

সুকান্তের জন্ম ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৩, মৃত্যু ২৯শে বৈশাখ ১৩৫৪। দেখা যেতে পারে এই সময়ের মধ্যে—এবং এর কিছু পূর্বে কি ঘটেছে সারা বিশ্বে। বাংলায় কি ঘটেছে তারও কথা জানা দরকার অবশ্যই। ১৯১৭ সালে ঘটে রুশ বিপ্লব। ওয়াশিংটনের অধ্যাপক ওয়াল্শ্-এর বিচারে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল এই অক্টোবর বিপ্লব। বিশ্বমানসে এর দ্রুত ও ব্যাপক প্রভাব পড়ে। জার শাসনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ার জনগণ—শ্রমিক আর কৃষক —বিপ্লবের তাৎপর্যকে বাড়িয়ে তুলল এই দিক দিয়ে যে—রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের দাবী হল প্রবলতম। জনগণই ছিল বিপ্লব—সেই জনগণই দেশে দেশে জাগ্রত হতে চাইল সংঘবদ্ধ হতে চাইল সংগঠন গড়ে তুলতে চাইল এই দিক দিয়ে যে, ফ্যাসিবাদকে তারা রুখবেই সাম্রজ্যবাদকে তারা প্রতিরোধ করবেই এবং শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রশক্তিকে তারা করায়ত্ত করবেই। ঔপনিবেশিক অনধিকার ও শোষণ শাসন অত্যাচারের বিরুদ্ধেও গণ-আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগল। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের মনীষিগণ তৎপর হলেন। নানা সংঘ ও প্রতিষ্ঠান থেকেও ধিক্কারবাণী উচ্চারিত হল। রবীন্দ্রনাথ বললেন,

"আমি এ কথা বারে বারেই বলেছি, জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যে আগ্রাসী চেতনা পশ্চিমের জাতিগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করছে, তা সমগ্র বিশ্বের পক্ষে বিপদস্বরূপ"।

.... রোমাঁ রোলাঁর আহ্বানে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ তারিখে ব্রুসেলসে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হয় সেখানে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লেখক, শিল্পী ও মনীষীদের স্বাক্ষরিত ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্যোগে এক প্রতিবাদপত্র প্রেরিত হয়। এতে স্বাক্ষর করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহরু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু ও প্রেমচাঁদ প্রভৃতি। প্রতিবাদপত্রে উল্লিখিত হয়ঃ

"কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে, আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েট ইউনিয়নই হউক, বা নাৎসী জার্মানীই হউক—যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।"

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

ত্রাসের পদাঘাতের তাড়নায়
অসম্মান নিয়ো না শিরে, ভুলো না আপনায়।
মিথ্যা দিয়ে, চাতুরী দিয়ে, রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে কোরো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ

বলীর পদে দুর্বলের কোরো না বলিদান।

পুনশ্চ, অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা তাঁর এক পত্রে সেদিনের বিশ্বব্যাপী বিপন্ন মানবতার চিত্র সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যক্ত হয়েছে—"দেখলুম দূরে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহা-সাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বারবার স্বীকার করল যা তাব প্রাচ্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনও ঘটেনি"। এই রকম অত্যাচার ঘটতে লাগল আবিসীনিয়ার ক্ষেত্রে ইটালির ব্যবহারে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে জার্মানীর, স্পেনে জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়ল—তাকে সাহায্য করল আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের এই প্রলয়ঙ্কর বন্যাকে রোধ করতেই হবে।...... বর্বরতার প্লাবনে নিমজ্জিত হওয়ার আগেই সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে।" ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বাংলার লেখক, শিল্পী ও মনীষীরা এগিয়ে এলেন। 'ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' 'বিজ্ঞাপনী'তে লেখা হল—"ফ্যাশিষ্ট দানবতার হিংস্র আক্রমণে সমগ্র বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন—নির্দোষ ও নিরস্ত্র ভারতের তথা বাংলার শ্যামল ক্রোড়ও আজ ফ্যাশিস্টদের অগ্নিবাণে বিধ্বস্ত। সভ্যতা ও প্রগতির এই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সৃষ্টি।" বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সভ্যতা ও ফ্যাশিজম' প্রবন্ধে লিখলেন,

"আজকের দিনে এমন এক বাষ্ট্রশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে যারা এই ব্যবস্থাকে স্থায়ী করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় লিপ্ত, এবং সকল মানুষকেই লৌহশাসনের যন্ত্রে পিষ্ট না করলে যাদের চলে না। তাদেব আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি এমনই যে সকলের আগে কবির মুখ বন্ধ করা তাদের দরকার, কেননা কবি সত্য ও সুন্দরের উপাসক। এরই নাম ফ্যাশিজম।"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন,

"নির্মম ক্রুর স্বার্থান্ধ এক যূথবদ্ধ মানব-সম্প্রদায়। দৈহিক এবং সর্বপ্রকার আসুরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ এক বিশেষ জাতি। অন্তরলোকে উগ্র স্বার্থবুদ্ধির হিংস্র ক্ষুধা। ..... তার হবে প্রভু, কর্তা; .... আর সমগ্র পৃথিবীর মানুষ তাদের গোলামী করবে।"...

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য এই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ। তিনি দেখলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা। দেখলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্যের যোগান দিতে হল ভারতকে। ফলে ভারতের অসামরিক অধিবাসীদের জন্য খাদ্যের যোগানে প্রচণ্ড টান পড়ল। এর ফলে তীব্র দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সেই দুর্ভিক্ষে মারা পড়ে গরীব চাষী, ক্ষেতমজুর ও কারুকর্মীরা। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার দুর্ভিক্ষে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৪৬ এর আগস্টে কুখ্যাত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। তিনি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন বিশেষ সচেতন। তিনি যে যে আদর্শ, চিন্তা ও কর্মধারার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা করা যেতে পারে ঃ—

১৯৪১-৪২	ঃ	মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন।
১৯৪৩ (১৩৫০)	ঃ	মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ। 'কিশোর বাহিনী' নামে সারা বাংলাদেশে কিশোর সংগঠন গড়ে তোলা।
১৯৪৫-৪৬	ঃ	যতগুলি গণ-আন্দোলন হয়েছে সবগুলিতেই সুকান্ত সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।
১৩৫১	ঃ	দুর্ভিক্ষের সম্পর্কে কবিতা সংকলন 'আকাল' সম্পাদনা।

কবির কাব্যচিন্তার পরিবেশ ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন পৃথিবীর ভয়াবহ পরিবেশ। এই ভয়াবহ পরিবেশে বাংলার জনজীবনের রূপ তিনি দেখেছিলেন। দেখেছিলেন, দুর্ভিক্ষ মহামারী দাঙ্গা, দেখেছিলেন ব্রিটিশ শাসনের শোষণ বঞ্চনা, অন্যায় পীড়ন এবং তার পরিণামে যন্ত্রণা, হতাশা, ক্ষোভ গ্লানি, বিষাদ ও রিক্ততা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় ছিল মানবজীবনের দুঃসহ অবদমন ও কৃষ্ণপক্ষের কালিমায় ঢাকা মর্মান্তিক অসহায়তার অনাবৃত বিকার ও শোচনীয় সীমাহীন শূন্যতা।

কবি দেখেছিলেন ধনী ও বণিক সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত দীন মানুষদের জীবনের সর্বস্ব অবলুপ্তিকে। দেখেছিলেন, কেমনভাবে ক্ষমতাশালী সমাজের হাতে বলি হচ্ছে সহস্র সহস্র প্রাণের জীবনীশক্তি, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ের উপরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে-বসা নিগ্রহ ও প্রতারণা, কেমনভাবে সুচতুর কৌশলে বাঁধা হচ্ছিল কোটি কোটি মানুষের ভবিষ্যৎকে রাজনীতির দাবা খেলার ছকে। সুকান্ত ছিলেন সমাজসচেতন জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন কবি। সুকান্ত ছিলেন সাম্যবাদ স্বাধীনতা প্রগতি ও শান্তির মন্ত্রে বিশ্বাসী কবি। সুকান্ত ব্রত গ্রহণ করেছিলেন যন্ত্রণার্ত মানুষ এবং সর্বহারা-শ্রেণীর মুক্তিযজ্ঞে কবি- সৈনিকের। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে উঠলেন সর্বহারা-শ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামে এক অজেয় প্রবল বাণীবহ বিদ্রোহচেতনার বাঙ্ময়মূর্তি। বিশ্বব্যাপী সর্বহারা জনসমাজের বন্ধনমুক্তির বার্তায় কবি এতই আস্থাশীল ছিলেন



যে, তিনি তাঁর হৃদয়ে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে নিদ্রিত জগতের বুকে আসন্ন মুক্তিপ্রভাতকে প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন ঃ

কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে
আমাদের চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে
কয়েকটি কথা—
পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে আজো স্বপ্ন।
কিন্তু জানি একদিন সে সকাল আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়। ('খবর'—ছাড়পত্র)

কিন্তু এত সব স্বপ্ন—বাস্তবে পৌঁছতে বহু পথ পার হতে হবে—রক্ত, কাঁটা-বিছানো কাঁকর-ছড়ানো বন্ধুর পথে চলতে অবিরাম রক্ত ঝরবে। বন্ধুর হাত ধরে এগোলে হয়ত কিছুটা সাহায্য পাওয়া যাবে—কিছু সান্ত্বনা—তাই ডাক দেন সবাইকে—

তোমরা এসেছ, বিপ্লবী বীর! অবাক অভ্যুদয়!
যদিও রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে সারা কলকাতাময়।
তবু দেখ আজ রক্তে রক্তে সাড়া—
আমরা এসেছি উদ্দাম ভয়হারা।
আমরা এসেছি চারিদিক থেকে, ভুলতে কখনো পারি!
একসূত্রে যে বাঁধা হয়ে গেছে কবে কোন্ যুগে নাড়ী।
আমরা যে বারে বারে
তোমাদের কথা পৌঁছে দিয়েছি এদেশের দ্বারে দ্বারে,
মিছিলে মিছিলে সভায় সভায় উদাত্ত আহ্বানে,
তোমাদের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছি জনতার উত্থানে।
('মুক্ত বীরদের প্রতি'—ঘুম নেই)

রাশিয়ার বিপ্লবীচেতনা এবং তার কেন্দ্রীয় প্রেরণা লেনিনের জীবন কবিচিত্তকে নন্দিত স্পন্দিত করেছে সর্বাপেক্ষা বেশি ঃ থরোথরো আবেগ-কম্পিত ছন্দ এবং বিদ্রোহীচেতনার শঙ্কাবিজয়ী তীব্রব্যঞ্জনাবাহী উৎক্ষিপ্ত সংবেগের কবিতা হিসেবে এটি বাংলাকাব্যে বিরল স্বাতন্ত্র্যচিহ্ন বহন করছে ঃ—

লেলিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।

* * *

বিদ্যুৎ—ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,—
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ;
—আসে শত্রু জয়ের সংবাদ।

* * *

ইতালী, জার্মান, জাপ, ইংলণ্ড, আমেরিকা. চীন,
যেখানে মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন।
অন্ধকার ভারতবর্ষ ঃ বুভুক্ষার পথে মৃতদেহ—
অনৈক্যের চোরাবালি; পরস্পর অযথা সন্দেহ.
দরজায় চিহ্নিত নিত্য শত্রুর উদ্ধত পদাঘাত,
অদৃষ্ট ভর্ৎসনা-ক্লান্ত কাটে দিন, বিমর্ষ রাত
বিদেশী শৃঙ্খলে পিষ্ট, শ্বাস তার ক্রমাগত ক্ষীণ—
এখানেও আয়োজন পূর্ণ করে নিঃশব্দে লেনিন।

* * *

লেলিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন।

('লেনিন'-ছাড়পত্র)

'মার্শাল তিতোর প্রতি' কবিতাতেও কবি একই বিপ্লবী ভাবধারার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন সুগভীর প্রত্যয় ও অসীম কর্মোদ্দীপনায়—

লক্ষ জনতা রক্তে শপথ রচনা করে—
'আমরা .তো নই মৃত্যুভীত,



তৈরী আমরা; যুগোশ্লাভের প্রতিটি ঘরে
তুমি আছ জানি বন্ধু তিতো।

জনগণের মুক্তির অসমসাহসিক বীর, বিশ্বনন্দিত অহিংসা মন্ত্রের ঋষি গান্ধীজীও কবির সুগভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। যেখানেই নিপীড়িতের ত্রাতা যে কোন ভাবে আবির্ভূত, যেখানেই জনমানসের শ্রদ্ধেয় মহানায়কের উপস্থিতি—সেখানেই কবি-আত্মার মুক্তি পিপাসু প্রেরণা অনিবার্য দীপ্তিতে জ্বলে উঠে আলোকশিখা বিকীর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হয়েছে। কমুনিজ্মের প্রতি একান্ত আস্থাশীল হলেও গান্ধীজী সম্পর্কে তাঁর অসংবরণীয় আবেগপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ ভাষা পেয়েছে নম্রসুন্দর কবিকণ্ঠে—

তাইতো এখানে আজ ঘনিষ্ঠ স্বপ্নের কাছাকাছি,
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক
তাইতো আজকে গ্রামে ও নগরে স্পন্দিত লাখে লাখ

('মহাত্মাজীর প্রতি'—ঘুম নেই)

একান্ত সমকালের বিশ্বে নানা দেশের কবিতায় জনযুদ্ধের যে ঐতিহাসিক পরিচয় গণঅভ্যুত্থানের যে বিপুল বিজয় সংবাদ নির্যাতিত মানবাত্মার মুক্তির আকাশে বিস্ফারিত মহাত্রাণের যে অতন্দ্র-আন্দোলিত কাব্য কবিতা রচিত হয়েছে তাব সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে সহজবোধ্য হবে, বাংলার চিরকিশোর কবির দীন আর্ত অবদমিত কালিমাম্লান গণজীবনে আগুন -ঝরিয়ে-দেওয়া কবিতার উৎস কোন্ ঈশান কোণের বজ্রবাঁশির সুরের আহ্বানে।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত AU RENDEZ-VOUS ALLEMAND নামক প্রতিরোধ কালের কাব্যগ্রন্থে পল এল্যুয়ার লিখলেন—

মানুষ অনুযায়ী বিদ্রোহীরা
সমস্ত মানুষের আকাশের নীচে
পরিপূর্ণ সমভূমি পৃথিবীর উপর
এই পাকা ফলের ভিতরে
রোদ অকলুষ হৃদয়ের মতো
সমস্ত রোদ মানুষের জন্যে

সমস্ত মানুষ মানুষের জন্যে
সমগ্র পৃথিবী এবং সময়
সুখ এক অদ্বিতীয় শরীরে।

(অনুবাদ : অরুণ মিত্র)

সমকালীন আর এক ফরাসী কবি লুই আরাগঁ, গেব্রিয়েল পেরির শহীদত্ব বরণের পরে 'ফাঁসির মঞ্চে যে বীর গেয়েছে গান' কবিতায় লিখলেন—

বধ্যভূমি অবাক—শোনে গান
"রক্তে রাঙা পতাকা ওড়ে মেঘে"

(অনুবাদ : দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী)

স্পেনের রণক্ষেত্র থেকে লেখা কবিতায় জন কর্ণফোর্ড লিখলেন—

কমিউনিজম ছিল আমার প্রাত্যহিক ঘুম-ভাঙানি ভোর—

(অনুবাদ : অমলেন্দু গুহ)

বিশ্বখ্যাত মহাপ্রাণ কবি পাবলো নেরুদা স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে রচিত কবিতায় লিখলেন—

স্পেনের প্রত্যেকটি ফোকর থেকে
ঝাঁপিয়ে পড়ছে স্পেন,
প্রত্যেকটি নিহত শিশুর কাছে থেকে এসে যাচ্ছে
চোখ ফাটানো একটি ক'রে বন্দুক।
প্রত্যেকটি পাপ থেকে জন্মাচ্ছে বুলেট
যা একদিন ঠাঁই খুঁজে নেবে হৃৎপিণ্ডে

(অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের মাদ্রিদ-প্রবেশ উপলক্ষে নেরুদা যে কবিতা লিখলেন তাতে ভবিষ্যৎ গণজীবন সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে দৃঢ় মনোভাবাপন্ন গতিময় জীবন ছন্দের প্রতি আস্থা, শান্তিকল্যাণের মাধুর্যময় কল্পনাবিহার অথচ রূপে রসে গন্ধে গানে প্রেমে অন্য যে কোন আদর্শ জীবনের সঙ্গে তার কোথাও ব্যাপক ব্যবধান নেই—

কারণ, তোমাদের আত্মত্যাগে পুনর্জন্ম ঘটিয়ে'ছ তোমরা
বিনষ্ট বিশ্বাসের, অনুপস্থিত আত্মার, পৃথিবীতে আস্থার,
এবং তোমাদের প্রাণ প্রাচুর্যের তোমাদের মহত্ত্বের,



তোমাদের শহীদদের
ওপর দিয়ে, যেন জমাট-পাথুরে রক্তের উপত্যকা ছাপিয়ে
প্রবাহিত ইস্পাত ও আশার পাবাবত-সংকুল এক মহতী নদী।
(অনুবাদ ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

সংগ্রামে জাগবণে বিনিদ্র রজনীর সাধনায় যে ভোর হবে তার প্রতি অসীম উৎসুক কবিকিশোব তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে প্রত্যাশা জানিয়েছেন—

তবুও প্রতিজ্ঞা ফেরে বাতাসে নিভৃত,
এখানে চল্লিশ কোটি এখনো জীবিত,
ভাবতবর্ষের 'পরে গলিত সূর্য ঝরে আজ—
দিগ্বিদিকে উঠেছে আওয়াজ,
বক্তে আনো লাল,
রাত্রিব গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।
('বিবৃতি'—ছাড়পত্র)

কবি এদেশেব মানুষ প্রকৃতি, প্রাচীন ঐতিহ্য, গৌববময় অতীত, যন্ত্রণাময় বর্তমান ও স্বপ্নছোঁয়া ভবিষ্যতেব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন—রণরক্তময় দিন পার হয়ে একঝাঁক সন্ধ্যার পাখির মতো যে জনতা ফিবে আসছে রোমাঞ্চিত তৃণে তৃণে পা ফেলে সুখস্বপ্নময় শান্ত নীলিমার প্রান্ত দিযে আশার ঔৎসুক্যে—

এ আকাশ, এ দিগন্ত, এই মাঠ, স্বপ্নের সবুজ ছোঁয়া মাটি,
সহস্র বছব ধ'রে একে আমি জানি পরিপাটি,
জানি এ আমার দেশ অজস্র ঐতিহ্য দিয়ে ঘেরা,
এখানে আমার রক্তে বেঁচে আছে পূর্বপুরুষেরা।
যদিও দলিত দেশ, তবু মুক্তি কথা কয় কানে,
যুগ যুগ আমরা যে বেঁচে থাকি পতনে উত্থানে।
যে চাষী কেটেছে ধান, এ মাটিতে নিয়েছে কবর,
এখানো আমার মধ্যে ভেসে আসে তাদের খবর।
অদৃশ্য তাদের স্বপ্নে সমাচ্ছন্ন এ দেশের ধূলি,
মাটিতে তাদের স্পর্শ, তাদের কেমন ক'রে ভুলি?

*   *   *

ওরা আসে, কান পেতে আমি তার পদধ্বনি শুনি,
মৃত্যুকে নিহত ক'রে ওরা আসে উজ্জ্বল আরুণি;
পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে আজ অসহ্য আবেগে,
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান, রঙ লাগে মেঘে।
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ প্রথম অধ্যায়,
ওরা আজ পলিমাটি অবিরাম রক্তের বন্যায়,
ওদের দুচোখে আজ বিকশিত আমার কামনা,
অভিনন্দন গাছে, পথের দুপাশে অভ্যর্থনা।
ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে গ্রামে নগরে বন্দরে,
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেরে স্বপ্নময় ঘরে।

('মণিপুর'—ঘুম নেই)

যদিও রুশ বিপ্লবের ভাবচ্ছবি ও ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কবির মানসপটের যবনিকার অন্তরালে থেকে বাবরংবার উঁকি দিয়েছে অতন্দ্র প্রেরণা দিয়েছে, তবু ইতিহাসের একনিষ্ঠ পাঠক জানেন ভারতবর্ষের মুক্তি ঠিক সেভাবে আসেনি। ভারতবর্ষে যথার্থভাবে ঐ রীতি পদ্ধতি অবলম্বনে গণজাগরণ-সংবাদ শোনা যায়নি। তবু প্রত্যাশা উদ্দীপনা ও প্রেরণার সাধর্ম্য সুকান্তকে ভারতবর্ষের মুক্তিপ্রয়াসী কবিগণের মধ্যে স্থান গ্রহণ করতে অবশ্যই সাহায্য করেছে। সমস্ত মতবাদের উর্ধ্বে তিনি দীন মানবসমাজের মুক্তিবাণীর চারণ কবি হিসেবে চিরন্তন সমাদর লাভ করবেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলন—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথার সত্য আত্মীয়তা ক'রেছে অর্জ্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি' কান পেতে আছি।

সুকান্ত সেই কবিদের একজন। দেশের নানা সমস্যা, দুঃসহ দুর্বহ সাধারণ মানুষের জীবন এবং সেই জীবনের দুঃখ দ্বন্দ্ব ক্ষোভ ও জ্বালা এবং সেজন্য প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ কবির বহু কবিতার ছত্রে ছত্রে আশ্চর্য তীব্র নিবিড় ব্যঞ্জনা ও যন্ত্রণাভরা হৃদয়ের আর্তি বহিঃপ্রকাশের সুরে চাঞ্চল্যভরা চরণে চরণে মন্দ্রিত হয়েছে।

দারুণ দুর্দিনে কবির প্রশ্ন—

কী হবে আর কুকুরের মতো বেঁচে থাকায়?



কতদিন তুষ্ট থাকবে আর
অপরেব ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট হাড়ে?
('১লা মে-র কবিতা'৪৬'—ঘুম নেই)

কবি প্রতিরোধের আহ্বান জানান—একই কবিতায়

তৈবী হোক লাল আগুনে ঝলসানো আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে।

শ্রমিকদেব শোনাতে চেয়েছেন কবি আসন্ন ঝড়ের সতর্কবাণী—

ঝড় আসছে—সেই ঝড় ঃ
যে ঝড় পৃথিবীব বুক থেকে জঞ্জালদের টেনে তুলবে।
আর হুঁশিয়ার মজুর ঃ
সে ঝড় প্রায় মখোমুখি ॥ (মজুরদের ঝড ঃ ছাড়পত্র)

দুর্ভিক্ষ যুদ্ধের আতঙ্ক মৃত্যুভয়পরিকীর্ণ পরিবেশে শ্বাসরোধকারী গ্রাম ও শহর জীবনে কবি জনমানসের নির্ভুল প্রতিচ্ছবিকে প্রকাশিত করেছেন তাঁর কবিতায়—। নিজের ভাবে নিজস্ব অনুভূতিতে যা উজ্জ্বল নিষ্ঠুর রক্তাক্ত অন্ধকার-ভাঙা চেতনায় বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মতো সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে সেই দৃপ্ত প্রবল বেদনামন্থর অথচ বহ্নিজ্বালাময় কাব্যপঙ্‌ক্তিমালা তাই উপহার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি'—

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।
তাই আজো আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস"।
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে ॥

কবি সুকান্ত আর এক ধরনের কবিতায় সাফল্য লাভ করেছেন জনজীবনবেদনায়

আশ্চর্য করুণ সহমর্মিতার ঐক্যসূত্রে। সে কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি হল—'একটি মোরগের কাহিনী', 'রানার' 'আঠারো বছর বয়স' ও 'হে মহাজীবন'।

'একটি মোরগের কাহিনী'তে—

অবশ্য খাবার খেতে নয়—
খাবার হিসেবে ॥

'রানার' এর তীব্র যন্ত্রণাভরা জীবনে—

রাত নির্জন, পথে কত ভয়, তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে

কবি চেয়েছেন—'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে ॥' কবি জানেন এবং আশ্চর্যভাবেই জানেন—যুগ যুগান্ত যা বিস্ময়কর উক্তি হয়ে রইল—

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।

কবির সর্ববিধ চিন্তার সংহত প্রকাশ একটি কবিতায় আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে। যদি কেউ একটি কবিতায় কবিকে জানতে চান, মনে হয় একটি কবিতাই তাকে সংক্ষেপে সব দিতে পারবে। বলা যেতে পারে সুকান্ত কাব্য-কাননের এইটিই সবচেয়ে সুন্দর ফুল। কবিতাটি 'বোধন'। কবির কাব্যের মুল প্রেরণা— (১) জনগণের প্রতি সহানুভূতি, (২) জনগণের জন্য সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম, (৩) কল্যাণ-আদর্শে ভবিষ্যৎ জন-জীবনের সংগঠন। এই কবিতাটি বিশ্লেষণ করে দেখলে সেই চিন্তাধারারই ক্রমবিন্যাস লক্ষ্য করা যাবে—

কোথাও নেই কো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখে কেটেছে সর্বনাশের খাল।

সংঘবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতি—

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজনহারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।

সর্বহারা মানুষের সংহতিতে কবির অসীম আস্থা ও আশ্বাস—

শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।



এত অল্প বয়সে এত পরিণত কবিপ্রতিভা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। মোহিতলালের কাব্যের প্রগাঢ় সংযম ও নজরুলের বন্ধনহীন ভাবোচ্ছ্বাসের মাঝামাঝি সুকান্তের জনজীবনধর্মী কবিতা। ভাষণ, বিবৃতি, ঘোষণা ও সংবাদপ্রচারধর্মিতা তাঁর কবিতায় প্রধান প্রধান অংশ গ্রহণ করলেও তা এজন্য অর্থবহ হয়ে উঠেছে যে, তাঁর কবিতা সর্বদা তীব্র আর্তি প্রকাশে বেগপূর্ণ বিদ্রোহের তন্দ্রাভাঙানো তূর্যনাদের মতো উচ্চ শব্দপূর্ণ, এবং সংগ্রামরত বীর জনগণের প্রতি উৎসাহ ও আবেগপূর্ণ প্রশস্তিতে উচ্ছ্বসিত। তিনি গণবন্ধু সংঘবদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাদের চারণকবি—এবং আদি মধ্য ও অন্ত সকল পর্বেই কখন প্রকাশ্য ও কখন প্রচ্ছন্নভাবে মানবদরদী কবি।

গ্রন্থপঞ্জী

১. সুকান্ত সমগ্র—সারস্বত লাইব্রেরী

২. সুকান্ত স্মৃতি—সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত

৩. বাংলার ফ্যাসিষ্ট বিরোধী ঐতিহ্য—মনীষা

৪. কাল মধুমাস—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

৫. পরিচয়—ফ্যাশিষ্ট বিরোধী সংখ্যা ১৯৭৫

৬. পরিচয়— (শারদীয়) ১৩৮২

৭. প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা —ভারবি

৮. সঞ্চিতা—নজরুল

৯. রুশ বিপ্লব প্রবাহ—আলবার্ট রিস উইলিয়মস

১০. অনুপূর্বা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

শতবর্ষে বউ-ঠাকুরানীর হাট

বউ-ঠাকুরানীর হাট' ১২৮৮ সালের কার্তিক থেকে ১২৮৯ সালের আশ্বিন পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালে; ১১ই জানুয়ারি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'বউ-ঠাকুরানীর হাটে'র স্থান গৌণ বলে মনে হতে পারে। এক হিসেবে একথা ঠিকই। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন, "এ যেন অশিক্ষিত আঙুলের আঁকা ছবি; সুনিশ্চিত মনের পাকা হাতের চিহ্ন পড়েনি তাতে।" কিন্তু সঠিকভাবে বিচার করতে গেলে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই উপন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক 'শারদোৎসব' নাটিকা, 'মুক্তধারা' 'পরিত্রাণ' নাটক, 'রাজা' 'অরূপরতন' নাটক এবং 'রাজর্ষি' উপন্যাসে অনুকূল ভাবাদর্শ গঠনে এ উপন্যাস অনেক পরিমাণে সহায়তা করেছে। এজন্যে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' রবীন্দ্রনাথের বহু সৃষ্টির আদি উৎস এবং একটি মুখ্যরচনা বলে গৃহীত হতে পারে। শতবর্ষে তাই এ গ্রন্থটিকে স্মরণ করার প্রয়োজন আছে।

'বউ-ঠাকুরানীর হাটে'র মুখ্য চরিত্র রাজা প্রতাপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য ঐতিহাসিক চরিত্র। এই ঐতিহাসিক চরিত্র বাংলা সাহিত্যে যেভাবে স্থান লাভ করেছে তা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে আমরা তার দুটি রূপ দেখতে পাই—এক, কিংবদন্তী-আশ্রয়ী; দুই, যথার্থ ঐতিহাসিক। আর এক ভাবেও এ চরিত্রের বিচার হয়েছে - রাজা প্রতাপাদিত্য কেমন রাজা, আদর্শ রাজা হিসেবে তাঁর স্থান কোথায়? এই শেষোক্ত বিষয়ে আলোচ্য উপন্যাস প্রসঙ্গে ১৩৪৬ সালে এক বিতর্কের অবতারণা করেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। আমাদের স্বাধীনতা - আন্দোলনের আদি পর্বে এই উপন্যাসের বক্তব্য সাধারণ জনমতকে প্রভাবিত করতে পারেনি। আরও পরবর্তীকালে দেশনেত্রী সরলাদেবী প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমতের বিরুদ্ধতা করে এক অবিস্মরণীয় মতান্তরের নজির রেখে গিয়েছেন।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচিত হয়েছিল আলীবর্দী খাঁর শাসনকালে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলাদেশে তখন জাতীয়তাবোধের কোন উন্মেষ ঘটেনি। তাই ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীর হিসেবে চিত্রিত করবার কোন প্রয়াস কোথাও দেখা যায় না। মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও ভারতচন্দ্র তাঁকে কোন স্বাধীনতা - সংগ্রামে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ যোদ্ধারূপে বর্ণনা করেন নি। বার্ষিক পনেরো লক্ষ টাকা আয়ের বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর, অবিশ্বাস্য ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে ভূষিত এই সামন্তরাজের কীর্তিকাহিনী অতিপল্লবিত হয়ে বাংলার সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে কিংবদন্তীর কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের রাজন্য মহিমার পরিচয় যেমন দিয়েছেন, আবার তাঁর ভাগ্য - বিপর্যয়েরও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে প্রতাপাদিত্যকে গ্রহণ করেছেন তিনি ইতিহাস নয়, কিংবদন্তীরই নায়ক। তাই কবি লিখেছেন—"যশোর নগর ধাম/প্রতাপ আদিত্য নাম/মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।/কেহ নাহি আঁটে তায়/নাহি মানে পাতশায়/ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।"



বাংলা জীবনী - সাহিত্য রচনায় প্রথম সার্থক লেখক রাম রাম বসু। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেখেন 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থ। বসু মহাশয়ের ভাষায়—"এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পারস্য ভাষায় গ্রন্থিত আছে সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদাইক নাহি আমি তাহারদিগের স্বশ্রেণী একেই জাতি ইহাতে তাহার আপনার পিতৃ পিতামহের স্থানে শুনা আছে অতএব আমরা অধিক জ্ঞাত .... যেমত আমার শ্রুত আছে তদনুযায়ী লেখা যাইতেছে।" জীবনী - সাহিত্যের লেখক তিনটি উপায়ে উপাদান সংগ্রহ করেন—ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে, লোক - পরম্পরায় প্রাপ্ত প্রবাদ ও জনশ্রুতি থেকে এবং বংশানুক্রমিক ইতিবৃত্তের সাহায্যে। রামরাম তাঁর গ্রন্থের প্রথম অংশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণনায় 'আকবরনামা' 'আইন-ই-আকবরী' 'তারিখ-ই-বদৌনী' ও নিজামউদ্দীন আহম্মদের 'তবকৎ ই-আক্‌বরী' প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। তাঁর রচিত কাহিনী যে সম্পূর্ণ ইতিহাস-তথ্যনির্ভর এ কথা অস্বীকাব করা যায় না। কিন্তু লেখক গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ রচনায় ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠাব পরিচয় দিতে পারেন নি। কারণ, তিনি যে সময়ে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন, সে সময়ে কোন ইতিহাস থেকে এই অংশের জন্য কোন তথ্য সংগ্রহ করার উপায় ছিল না। 'রাজনামা' নামক ফারসী গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বিস্তৃতভাবে থাকলেও সে গ্রন্থ সে সময় এবং একালেও দুর্লভ। এজন্য গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ রচনায় লেখককে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' এবং প্রচলিত প্রবাদ ও জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যের বিচিত্র চরিত্রের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, "একদিকে যেমন তিনি অধীনতার শৃঙ্খল ছেদন করিয়া আপনাকে স্বাধীনতা-লক্ষ্মীর উপাসক বলিয়া প্রচার করিতেন, অন্য দিকে আবার অপরের - এমনকি আপনার নিকট আত্মীয়ের পদে অধীনতা-শৃঙ্খল পরাইয়া তাহার রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য হস্ত সম্প্রসারণ করিতেন। একদিকে তিনি দানে কল্পতরু ছিলেন, অন্যদিকে আবার পরসম্পত্তি হরণে সচেষ্ট হইতেন।" প্রতাপাদিত্য চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে রামরাম বসু যে পথ দেখিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে বাংলা নাটক ও স্বদেশচেতনায় তা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেরব কৃশ ছিল। বোধ করি তখন পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কটা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। এই বইগুলির মধ্যে ছিল 'রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের জীবন চরিত্র।' বাল্যকাল থেকেই প্রতাপাদিত্য কাহিনীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন আরও একটি গ্রন্থ পাঠের সাহায্যে। এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, শীতের দুপুরে বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে "পড়ে শোনাতুম বঙ্গাধিপ - পরাজয়।" 'বঙ্গাধিপ - পরাজয়' প্রতাপাদিত্যের কাহিনী, লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গাধিপ - পরাজয়ে'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'বঙ্গাধিপ - পরাজয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গাধিপ - পরাজয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ড দ্বারা প্রভাবিত হন নি। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গাধিপ - পরাজয়ে'র প্রতাপের ধরনে 'বউ - ঠাকুরানীর হাট'-এর প্রতাপকে নিষ্ঠুর দুষ্কৃতকারী ও প্রজাপীড়ক রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গাধিপ-

পরাজয়ে'র দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্যকে উনিশ শতকের দেশপ্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত করে দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থে বন্দী প্রতাপের মুখে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মহিমা ঘোষণায় তা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু এ তথ্য কখনো ঐতিহাসিক সত্যের সমর্থন লাভ করেনি। সত্য বটে বারো ভুঁইয়াদের কাহিনী মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের পাশাপাশি এক রোমাঞ্চকর আখ্যায়িকা - মালা রচনা করে জনমানসে স্থান পেয়েছে। কিন্তু তা বলে তা ইতিহাস নয়।এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মন্তব্য বিশেষভাবে বিচার্য। তিনি বলেছেন, "A false provincial patriotism has led modern Bengali Writers to glorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invadors. They were nothing of the sort." প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক যুগের জাতীয়তাবোধ স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-চেতনার অস্তিত্ব মধ্যযুগের বাংলাদেশে ছিল না।

প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী জানা প্রয়োজন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এদেশে আসেন। তাঁর কার্যকাল ছিল পাঁচ বছরের। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলার মোগল সম্রাটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে মুসা খান ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানকে কথা দিয়েছিলেন যে, তাঁর সপক্ষে তিনি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে মুসা খানের বিরুদ্ধে যোগ দেবেন। কিন্তু তিনি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি। ক্রুদ্ধ ইসলাম খান তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করলেন। ইতোমধ্যে মুসাখান ও অন্যান্য জমিদারগণ ইসলাম খানের নিকট সবিশেষ পর্যুদস্ত হয়েছিলেন। এই অবস্থায় প্রতাপাদিত্য ভীত হন এবং ৮০টি রণতরীসহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ক্ষমা প্রার্থনা করবার জন্য ইসলাম খানের নিকটে পাঠান। কিন্তু ইসলাম খান এতে আদৌ সন্তুষ্ট না হয়ে বরং গভীর অসন্তোষই প্রকাশ করেন। তিনি ঐ রণতরীগুলি ধ্বংস করেন।

প্রতাপাদিত্য খুব শক্তিশালী রাজা ছিলেন। এ জন্য ইসলাম খান এক বিরাট সৈন্যবাহিনীকে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে পাঠালেন। এই সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের জামাতা বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠালেন। প্রতাপাদিত্য কোনদিনই প্রত্যক্ষ যুদ্ধের মাধ্যমে মোগল শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাননি। কিন্তু এবারে বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে তিনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হলেন। মাত্র একমাসের মধ্যেই তাঁর যশোহর রাজ্যের চিহ্ন মুছে গিয়েছিল। ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে বন্দী এবং তাঁর রাজ্য দখল করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকের প্রদত্ত বিবরণ স্মরণযোগ্য। তা এই যে, তীব্র সংঘর্ষে প্রতাপাদিত্য কোন মোগল বাহিনীকে পরাস্ত করতে পারেন নি। তাঁর পুত্র এবং সেনাপতি উদয়াদিত্য শালকায় এক নৌযুদ্ধে পরাজয়ের সূচনাতেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং তাঁর জীবন ও সম্মান রক্ষার ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করবার আগেই মোগল সেনাপতির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন— "প্রতাপাদিত্য যথেষ্ট শক্তি ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন এবং শেষ অবস্থায় মুঘলদের সহিত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা



সাহিত্যে তাঁহাকে যে প্রকার বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় দেশভক্তরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, উল্লিখিত কাহিনী তাহার সমর্থন করে না।"

'বউ-ঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ইতোমধ্যে, ঐ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে, দেশে স্বাধীনতা - আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। দেশের সামনে দেশের প্রাচীন রাজন্যবর্গের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে আদর্শ বীর চরিত্ররূপে অথবা আদর্শ দেশপ্রেমিকরূপে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস চলছিল। কাব্য নাটক এবং উৎসব - আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই ধরণের বীর চরিত্রের মহিমা ব্যক্ত করে দেখালে দেশের লোক স্বাধীনতা - সংগ্রামে উৎসাহিত হবে - এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু এ নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ভাগিনেয়ী (স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা) সরলাদেবীর মধ্যে।

সরলাদেবী বাঙালি জাতির মধ্যে স্বদেশ সম্পর্কে গৌরববোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মহারাষ্ট্রের শিবাজী - উৎসবের মতো এখানে প্রতাপাদিত্য - উৎসবের সূচনা করেন। ১৩১০ সালের বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে (১১ই মে, ১৯০৩ তারিখে) ভবানীপুর কালীঘাট বালিগঞ্জ ও বাগবাজারের বালকসমাজ কর্তৃক সরলাদেবীর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠান হয়। তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকা - 'সঞ্জীবনী' 'বেঙ্গলী' ও 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি সংবাদপত্র এই অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রশংসা করেন। বিপিনচন্দ্র পাল 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে লিখলেন, "As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a Hero for Bengal."

'বউ-ঠাকুরানীর হাটে' রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে বিশেষভাবে দুর্বিনীত হৃদয়হীন ও দম্ভের প্রতিমূর্তি হিসেবেই অঙ্কিত করেছেন। 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'বউ-ঠাকুরানীর হাটে'র যে সব অংশ আধুনিক প্রচলিত সংস্করণে বর্জিত হয়েছে সেগুলো পড়লে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যকে প্রবল প্রজাপীড়ক মূর্তিতেও চিত্রিত করেছিলেন। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রতাপাদিত্য-উৎসব সহ্য করা ছিল কঠিন ব্যাপার। সরলাদেবীর সঙ্গে তাঁর মতান্তর তীব্র হয়ে উঠল। সরলাদেবী লিখেছেন—"তীর এসে বিঁধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে— সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফত। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন, "আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর।"

'কেন?'

"আপনি তাঁর বৌঠাকুরানীর হাটে চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে, প্রতাপাদিত্য কখনও কোন জাতির হিরো - ওয়ারশিপের যোগ্য হতে পারে না।"

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দেই প্রকাশিত হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত 'প্রতাপাদিত্য' নাটক। তৎকালীন স্বাদেশিকতার ভাবধারায় এই নাটক কিঞ্চিৎ অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল। ১৩১৩

সালে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বঙ্গ আমার জননী আমার' নামে বিখ্যাত সংগীতটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' ইতোপূর্বে রচিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার' বেশী জনপ্রিয় হল। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতাপাদিত্যকে মহত্ত্বের সিংহাসনে স্থাপন করলেন। লিখলেন, "যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য তুই ত মা সেই ধন্য দেশ।/ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে মা তাঁদের রক্তলেশ।"

রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যা-ই বলুন না কেন, দেশের জনসাধারণ তাঁর চিন্তাধারা গ্রহণ করেনি। তখন দেশবাসীর মনোভাব ছিল ব্রিটিশের "অত্যাচারের বক্ষে পড়ি, হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।" কিংবদন্তীতে বিশ্বাসী জনসাধারণ একথাও সেদিন ভেবেছিল, যে প্রতাপাদিত্যকে তারা স্বদেশীযুগের আগে থেকেই বাঙালি জাতির বাংলা দেশের শেষ গৌরব বলে শ্রদ্ধা করে আসছে, তাঁর এ কী মূর্তি রবীন্দ্রনাথ আঁকলেন। এজন্য কেবল 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' নয়, রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটিকেও (১৩১৬ সালে প্রকাশিত) জনমতের বিরুদ্ধে রচিত বলে মনে করা হতে লাগল। কোন পাবলিক থিয়েটারে তার অভিনয়ও হল না। 'প্রায়শ্চিত্তে' রবীন্দ্রনাথের অহিংস স্বাধীনতা - আন্দোলনের ভাবধারা জনমতের দ্বারা উপেক্ষিত হল।

রবীন্দ্রনাথ 'বউ-ঠাকুরানীর হাটে' আদর্শ রাজার চরিত্র আঁকতে চেয়েছেন। প্রতাপাদিত্য আদর্শভ্রষ্ট রাজা। তাঁর বিপরীত দিকে রয়েছেন তাঁর পিতৃব্য বসন্ত রায় - যিনি সব দিক দিয়েই আদর্শ রাজা। বৈষ্ণব পদকর্তা বসন্ত রায়ের সঙ্গে অভিন্ন করে তিনি এক অপূর্ব রাজর্ষি সৃষ্টি করেছেন এই চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন যে, এই চরিত্রটিতে তাঁর বাল্যকালের পরিচিত শ্রীকণ্ঠ সিংহের চরিত্রের ছাপ আছে। 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' প্রতাপাদিত্যের পারিবারিক ঘটনা নিয়ে লেখা। কিন্তু এ কাহিনী প্রায় সম্পূর্ণই কাল্পনিক, আংশিক ঐতিহাসিক। বসন্ত রায় - উদয়াদিত্য - বিভার সম্পর্কের মধ্যে যে মাধুর্য ও সৌন্দর্য তা রবীন্দ্রনাথের কৈশোর জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উপন্যাসে নিষ্ঠুর ঘটনা বসন্ত রায় হত্যা যা প্রতাপাদিত্য চরিত্রকে অনপনেয় কলঙ্কে লিপ্ত করেছে।

'বউ-ঠাকুরানীর হাট' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালে। গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় ষাট বছর পরে ১৩৪৬ সালে রবীন্দ্রনাথ এর 'সূচনা' লিখতে বসে পূর্বস্মৃতি অনুসরণে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। বলেছেন, এই গ্রন্থের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি পত্রে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'র শেষাংশে যা বলেছেন, তা বিতর্কের বিষয়। তিনি বলেছেন, "স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে- সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর



পূজা প্রচলিত হয়নি।”

রবীন্দ্রনাথের ‘আমি যে- সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি’—এ উক্তি ইতিহাস - সমর্থিত নয়। উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র হিন্দুমেলা ও বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুপ্রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি উপন্যাস লেখেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির নাম ‘প্রতাপসংহার’। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ‘বঙ্গাধিপ পরাজয়ে’র প্রথম খণ্ড ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। জনসাধারণ এই বই পড়ে খুশি হয়নি, অনেকেই বিরূপ মন্তব্য করেছিল। সুতরাং, “তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।”—এই উক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না।” রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিও ঐতিহাসিক সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলার শাসনকর্তা সোলেমান ও দাউদের চিত্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল। বাংলার আর এক সামন্ত রাজা প্রতাপাদিত্যের মনেও ঐ রকম আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল ও পরিণামে করুণ সমাপ্তি লাভ করেছিল। “দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্যে”র পরিচয় সে কালে বাংলার বারো ভুঁইয়াদের অনেকেই দিয়েছিলেন। তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিই এরকম ছিল। এজন্য কেবল প্রতাপাদিত্য একাই দায়ী নন।

মহৎ স্রষ্টার কোন সৃষ্টিই নিষ্ফল নয়। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাটে’ রবীন্দ্রনাথ আদর্শ রাজচরিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছিলেন। সে বিশেষ ভাবাদর্শ তাঁকে এই সৃষ্টিকার্যে নিয়োজিত করেছিল, পরবর্তীকালের কয়েকটি নাটকে তার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই উপন্যাস স্মরণীয় এই কারণে যে, “প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয়নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে মনোবিজ্ঞানে .....।”

সংযোজন। প্রাসঙ্গিক বিবিধ তথ্যের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ-

১. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড; চতুর্থ সংস্করণ।

২. ডঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ — রবীন্দ্র-উপন্যাসের প্রথম পর্যায়।

৩. সরলা দেবী চৌধুরানী — জীবনের ঝরা পাতা।

৪. ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার — বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

প্রাক্-বিপ্লব যুগ এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি চমৎকার ভাষায় বলেছিলেন—

And when
its Coming
With rebellion acclaiming,
You pour out to meet the Saviour,I
Will pull out my Soul,
big, bloody and flaming,
a banner for you to lift on high. (could in pants).

দেশে যদি বিপ্লব আসত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও একথা বলতে পারতেন। তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন তার জন্যে অলংকারের ঝংকার ছন্দের নৃত্যকলা ও শব্দবিন্যাসের কলাকৌশল প্রয়োজন হয়নি। তিনি সরল সহজ দ্বিধা ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর বক্তব্যপ্রধান কবিতায় বলতে চেয়েছিলেন—

চারিদিকে যত অত্যাচার
যত ব্যথা যত দুঃখভার
জমিয়াছে জঞ্জাল সমান
ঘুচাইয়া দিব নব প্রাণ। (মাটির কাছের কিশোর কবি)

এজন্যে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে—

আমার জগতে কাল মানুষের জন্মক্ষণ থেকে
তিলে তিলে করেছে সঞ্চয়
মহাসম্ভাবনাময় যে মহাবিপ্লব
আমি তারি আত্মীয়তা চাই।....
আমি তার চোখে দেব কয়লাখনির কালো
মরণ কাজল,
টিপ দেব চাকায় মাখানো গাঢ় জমাট রক্তের।
সর্ব অঙ্গে এঁকে দেব লালিম অঙ্কনা
বুলেটের তাজা তাজা ক্ষতের চিহ্নের।

এমন দিনেই সংগ্রামী কবিচিত্ত সাক্ষাৎ পেলো আরও কিছু সংখ্যক দরদী সংগ্রামী কবির। তারা কোন অলৌকিক আশ্বাসে জনগণকে ফাঁকি দিতে চায়না, তারা বাস্তব সমস্যার সমাধান কর্মের



মাধ্যমেই সম্পন্ন করতে চায়—

আমরা হাতে হাতে শুধু ছিঁড়ে আনব না মেঘ,
শুধু দেখব না গ্রহণ-ক্ষুণ্ন ম্লান সূর্যের মুখ,
হাতুড়িতে গুঁড়ো করে, কাস্তেয় কেটে
সাফ করব দুর্যোগের কারখানার হাড়-মাস মগজ-হৃদয়,
হাসব দীপ্ত সূর্যালোকে, সবুজ।

চাষি মজুর কেউ বসে নেই—অবিরত চলেছে তাদের বাঁচার লড়াই। 'একার আকাশ ছেড়ে' সব কবিরা তাদের সঙ্গে সংগ্রামে একত্র মিলিত হয়ে বলল। এমন কথাই বলেছিলেন গোর্কি—"Every citizen has full liberty to develop his capacities, gift and talents. The only demand presented to the individual is that he should be honest in his attitude to the heroic work of creating a classless society." এমন দিনে মানিকের সাক্ষাৎ হল এক কিশোর কবিসৈনিকের সঙ্গে। তিনি যেসব কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি তাই নানাভাবে নানারূপে প্রকাশিত হল ঐ কবির কবিতায়। ঐ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবির অকাল মৃত্যুতে তিনি দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। লিখেছিলেন তাঁর 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' কবিতায়—

তাকে জমিয়ে দিল ভাতের মালিকের ছড়িয়ে রাখা
উপোসী শীতের ফাঁদ,
ক্ষইয়ে দিল জিইয়ে রাখা রক্তপায়ী কীট।

কবিতায় তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ তেমন ঘটল না। তাই তিনি যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে—তার সন্ধান করলেন অতন্দ্রভাবে, তাঁর গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে। কিন্তু দীনদরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, অবহেলিত নিপীড়িত বঞ্চিত জনসমাজের জীবন—অনুসন্ধানে তিনি ব্যর্থ হলেন না, বরং তিনি সেই জনজীবনে পরিচয় পেলেন এক 'সহজ সরল বিরাট সুন্দরের', মহাকাব্যোপম জীবনচ্ছন্দের গতিভঙ্গি ও বিপুল করুণরসের অবিরাম প্রবাহ। মানিক দেখলেন এবং উপলব্ধি করলেন—

পদ্মায় যে ডিঙ্গি চালায়, মেদনিপুরের শক্ত মাটি চষে,
বোম্বে থেকে কলকাতাতে লাখো চাকা ঘোরায়,
উদয়াস্ত লাখো কলম পেশে,
বুঝতে যেন পারছি
তাদের ফাঁসে আটক গলার ঐকতান,
অনুভব করছি ব্যাহত জীবন কামনার উজ্জ্বল তাপ,
সূর্যালোকের মত।
তুলনা পাইনি রাজকীয় কাব্য ইতিহাসে,
এমন সহজ সরল বিরাট সুন্দরের।

সমাজসচেতন সংগ্রামী কবি তাই নতুন সমাজ গডবার আগ্রহ অনুভভ করলেন--

অনেক আলো জ্বালতে হবে মনের অন্ধকারে,
অনেক ভাঙা পাঁজর জোড়া দিয়ে
শুধরে নিতে হবে অনেক গান।

এক সময়ে সূর্য কবির অত্যন্ত প্রিয় হয়েছে—আগামী দিনের আলোকোজ্জ্বল সম্ভাবনাময় দিনগুলির স্বর্ণসম্ভার তাঁর মানসনেত্র উদ্ভাসিত করেছে, তাই 'কলম-পেষা মজুর' শ্রমিক শ্রেণীব একজন হয়ে বললেন—

আমার ঘৃণার মতো
তোমারও আদিম আলো তাপ
দিবানিশি মৃত্যু চায় জীবনের সমস্ত শত্রুর?

'ডিসেম্বর' 'শ্রাবণ মাস' এবং 'তুষের আগুন' কবিতাগুলিতে কবিভাবনার মধ্যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের জনজীবনে দেশেব বিভিন্ন প্রান্তে যে মুক্তি কামনা প্রদীপ্ত হয়েছিল তার পরিচয় আছে। মানিক যে কবিতা লিখতে চেয়েছেন তা হচ্ছে "মানুষের আসল কবিতা—/আমার যে মানুষেরা/রোগশোক ক্ষুধা ব্যথা বঞ্চনা হত্যায/জীবিকার ব্যভিচারে পচে গলে যায়/আমার জীবন জুড়ে স্বপ্ন জাগরণে।/রেখে যায় প্রতিবাদ, অক্ষম কবির বুকে শত কোটি ভাষাহীন বিরহী ধ্বনির।" কবিতার মধ্যে তিনি ভাববিলাসিতা আকাশকুসুম চয়ন বোমান্টিক ন্যাকামি চাইতেন না। তাই লিখেছিলেন বিদ্রূপবিমিশ্রিত ভাষায়—

শব্দ-মদ বেচা শুঁড়িগুলো
কাব্যলক্ষ্মীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল
শুঁড়িগুলো সব মরে যাক্
কাব্যলক্ষ্মীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

সুকান্তের জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে মানিক লেখেন কিশোর-উপন্যাস 'মাটির কাছের কিশোর কবি'। জীবনসংগ্রামে শেষ পর্যন্ত নানা দুঃখসংঘাতকে জয় করে কবিকিশোর সাফল্যলাভ করেছেন। যে উপন্যাসের নাম ছিল 'কবির জবানবন্দী' পরে তার নাম হয় 'ছন্দপতন'। এই উপন্যাসে মানিক বলতে চেয়েছেন কবি নবকুমারের আত্মসমীক্ষার মধ্য দিয়ে যে, সত্যিকারের মানুষের কবিতা লিখতে হলে মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড়, অন্তরঙ্গ যোগ চাই শ্রদ্ধায় ভালবাসায় সহমর্মিতার ঐক্যে। তা না হলেই ছন্দপতন।

মানিক প্রধানতঃ কথাসাহিত্যিক। কিন্তু তাঁর বিপুল ও বিরাট কথাসাহিত্যের মর্মকথা তাঁর কবিতাতেই খুঁজে পাই। মাত্র ১৫/১৬টি কবিতায় তাঁর জীবনদর্শনের সারাৎসার বিধৃত। মায়াকোভ্স্কি লুই আরাগঁ পল এলুয়ার পাবলো নেরুদা, লু স্যুন নজরুল, সুকান্ত প্রমুখ কবি ও ভাবুকদের মতোই তাঁর কবিতা সংগ্রামী জনগণের তথা শ্রেণীসংগ্রামের মর্মসত্য বহন করছে। সহমর্মিতার ঐক্যসূত্রে তিনি বিশ্বের মুক্তিকামী মানবসমাজের একান্ত কল্যাণকামী সহযোদ্ধা ও বন্ধু —অন্যায় শাসন ও শোষণমুক্ত রক্তসূর্যদীপ্ত প্রভাতের স্বপ্নদ্রষ্টা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্র-সমীক্ষা

"Others abide our question — Thou art free!
We ask and ask — Thou smilest and art still,
Out-topping knowledge"

শেক্‌স্‌পীয়ারের কল্পনা যেখানে আরোহণ করেছে সেখানে সকল জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত হয়ে যায়, তাঁর প্রজ্ঞা জ্ঞানকেও অতিক্রম করে। তাই কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড শেক্‌সপীয়ারের সেই অতি উচ্চ স্রষ্টার সিংহাসনের প্রতি চেয়ে হতাশায় একথা বলেছেন। বলতে চেয়েছেন, তিনি মুক্ত স্থির আত্মার আলোকে চির ভাস্বর। শেক্‌সপীয়ার নিজের সম্পর্কে নির্বাক। মোহিতলাল বলেছেন, "আর কে এমন করিয়া নিজে নির্বাক থাকিয়া জগৎ-রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যগুলি কেবলমাত্র উদঘাটন করিয়া দেখাইয়াছে।" এই নির্লিপ্ত নির্বিকার গহনচারী জীবনশিল্পী শেক্‌সপীয়ারের আত্মগোপনশীলতার পাশে আত্মউন্মোচন পরায়ণ রবীন্দ্রনাথের নিত্য নব আত্মপরিচয় দানে ঔৎসুক্য পারস্পরিক বৈপরীত্যের পরিচয় দেয়। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুর্নিরীক্ষ্য কবিসত্তা, অত্যুচ্চ কবিকল্পনা ও সর্জনশীলতার অলোকসামান্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; আর সেজন্যেই তিনি লিখেছিলেন—

"বাহির হইতে দেখো না এমন করে
আমায় দেখোনা বাহিরে।
আমায় পাবেনা আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে।
* * *
যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে।"

—না, তাঁকে কেউ ধরতে পারেনি, পারবেও না। অর্থাৎ যে মূল উৎস থেকে তাঁর প্রতিভার এই সহস্রধারায় আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণ, কবিচিত্তের সেই মহত্তম সৃষ্টি-কেন্দ্রটির পরিচয় চিরকালই আমাদের চেনাজানার বাইরে থেকে যাবে। আর তা আমাদের চেনাজানার বাইরে থেকে যাবে জেনেই তিনি বারংবার আমাদের কাছে ধরা দিতে চেয়েছেন নানা কবিতায় ও গানে, আত্মজীবনীমূলক রচনায়, পত্র ও অন্তরঙ্গ স্মৃতিকথায়। এমন কথা শোনা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ বড়ো বেশী নিজের কথা লোককে শুনিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্র-জীবনের অনেক আশ্চর্যের মধ্যে এও এক পরম আশ্চর্য যে, তিনি নিজেকে এমন ভাবে না জানালে আমরা তার জীবনের অনেক সত্যই জানতে পারতাম না। রবীন্দ্র-জীবনের সমগ্রতার সর্বোত্তম ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। এ ঘটনা যেমন অনিবার্য, তেমনই অপরিহার্য।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের রচিত স্বজীবনবৃত্তান্ত আছে। কিন্তু অন্যান্য বৃত্তান্ত থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের। তিনি প্রথমেই বলেছেন, "জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যে-ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে" - জীবনের সেই রূপটিকেই তিনি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। সেই তাঁর কবিজীবনের 'সত্য'। এখান থেকেই আমরা পাই তাঁর 'জীবনদেবতা' বাদ। এই রচনাটি প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনেকে দাম্ভিকতা, অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ আনেন। এসব অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা কালক্রমে বোঝা গিয়েছে; এখনো হয়তো বা এসব অভিযোগ কেউ কেউ আনতেও পারেন। কিন্তু এ-তো সব রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা ও তাঁর কবিপ্রতিভার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার কবি স্বপ্ন যেভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে বিতর্ক-বিচারের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবি নন তিনি একজন কর্মীও। তিনি দেশনেতা, জাতীয় আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, 'স্বদেশী সমাজ' সংগঠক পল্লী-উন্নয়ন-চিন্তানায়ক, দুঃখে সুখে দেশের জনগণের পথ চলার সঙ্গী, বিশ্বের যুদ্ধ-বিরোধী রাষ্ট্রনেতা ও চিন্তাশীল মনীষিগণের বন্ধু ও সহকর্মী, বিশ্বজনসমাজের শান্তি ঐক্য ও প্রগতির দিশারী এবং 'মানুষের ধর্ম' নামক দার্শনিক চিন্তার প্রবক্তা হিসেবে সাম্প্রতিক বিশ্বের অন্যতম পরিত্রাতা। রবীন্দ্রনাথের এইসব পরিচয়, তাঁর মহিমার এই বিশালতার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত তাঁর অনন্যসাধারণত্ব—এ সবের কথা আমাদের বুঝিয়ে বলবে কে প্রত্যক্ষদর্শীর চোখ দিয়ে যিনি তাঁকে দেখেছেন, খুব কাছাকাছি থেকে শ্রদ্ধায় প্রীতিতে চিনে নিয়ে যিনি তাঁকে বুঝেছেন—এমন ব্যক্তিই পারেন উত্তরকালের কাছে তাঁর সম্যক্ পরিচয় তুলে ধরতে। এমন এক ব্যক্তি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রভাতকুমার সেই শ্রেষ্ঠ লেখক যিনি রবীন্দ্রজীবনকথাকে ভক্তের বিনম্র শ্রদ্ধাভক্তি এবং গবেষকের বিশ্লেষণ ও সমীক্ষার সাহায্যে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যার তুলনা নেই, যে কীর্তির বিকল্প নেই, হয়তোবা ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে না। প্রবোধচন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন, "রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনার পক্ষে এমন বহুমুখী যোগ্যতা আর কার ছিল, আর কার জীবনে এ কাজের জন্য এমন নিরলস সাধনা ও প্রস্তুতি দেখা গিয়েছে? ...... ভবিষ্যতে হয়তো আরও বড় বড়



পণ্ডিত আবির্ভূত হবেন, তাঁরা হয়তো উৎকৃষ্টতরভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাষ্য রচনা করবেন। কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রযুগের তথা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রাণস্পন্দনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকবেন।" কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে প্রশান্ত কুমার পালের 'রবিজীবনী' 'রবীন্দ্র জীবন' এবং 'রবিজীবনী'র লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত লিখেছেন, "তরুণ গবেষক প্রশান্ত পাল ঠাকুর বাড়ির পুরনো দলিল থেকে কিছু নতুন খবর সংগ্রহ করেছেন। ইতিপূর্বে অব্যবহৃত সমকালীন আকর থেকে তথ্যকে নতুন করে যাচাই করে দেখছেন। এ-উদ্যম সাধুবাদ যোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনী রচনায় প্রভাত কুমারের লক্ষ্য থেকে কিছু ভিন্ন। প্রশান্ত পাল উপাদান পরীক্ষাই করেছেন। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ব্যক্তিত্বের ছবিকে গড়ে দিতে চেয়েছেন। সেইজন্য প্রভাতকুমারের প্রয়াস সৃষ্টিশীলতার প্রয়াস, প্রশান্ত পালের প্রয়াস প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রয়াস। তবু সব চেয়ে বড় .. কথা এই যে, প্রভাতকুমারের সূত্র থেকেই পরবর্তী গবেষণার পথ তৈরী হয়েছে।"

কিন্তু এই ধরনের কাজে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তেমন তৃপ্তি খুঁজে পাননি। কবিজীবনী রচনার আদর্শটি স্বতন্ত্র। সে কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন জীবনবৃত্তান্তের অন্যান্য দিকের আলোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কি তার পর্যালোচনা প্রয়োজন। কবি লর্ড টেনিসনের দু'খণ্ডে সমাপ্ত জীবনীগ্রন্থ রচনা করেন কবিপুত্র হ্যালাম টেনিসন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। ১৩০৮ সালের আষাঢ়ে প্রকাশিত তাঁর 'কবিজীবনী' প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছেন— "ইহা টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনরচিত নহে। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহৃদয়সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া এত জ্ঞান ও ভাব আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সুরগুলি তাঁহার বাঁশিতে অভ্যাস করিয়া লইলেন। ..... যেভাবে তিনি মানুষের সহিত মানুষকে, সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্তাকে একটি উদার সংগীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া দেখাইয়াছেন, তাঁহার সেই বৃহৎ ভাবটি জীবনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই। .... টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত একটি লেখা যাইতে পারে-বাস্তব-জীবনের পক্ষে তাহা অমূলক, কিন্তু কাব্যজীবনের পক্ষে তাহা সমূলক।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের অন্যত্র কয়েকটি কথা বলেছেন। তাঁর নিজের জীবনী-রচনার ব্যাপারে কথাগুলি মূল্যবান। তিনি লিখেছেন —"কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়ই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে। দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।"

দান্তে গ্যেটে ও রবীন্দ্রনাথ তিনজনই কেবল কাব্য বা শিল্পের জগতে নিজেদের বন্দী করে রাখেননি, কবিতা-সংগীত-চিত্রকলা এই তিন সুকুমার শিল্পের বাইরে সভ্যতা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-দর্শনের অন্যান্য প্রসঙ্গেও তাঁদের আগ্রহ ছিল সীমাহীন এবং মহাকবি ছিলেন বলেই বোধ হয় মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ছিল তাঁদের অনুধ্যেয় এবং প্রাসঙ্গিক সমস্ত

ব্যাপারে অধ্যয়নও ছিল নানাপথে। কেবল কবি নন, ঘটনাজালজড়িত ব্যক্তিজীবনের পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ একজন কর্মবীরও। এই প্রবন্ধে এই ধরনের 'কর্মবীর' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যাঁহারা কর্মবীব তাঁহারা নিজের জীবনকে নিজে সৃজন করেন। ..... কর্মবীরগণ সংসারের কঠিন বাধার মধ্যে নিজের জীবনের ছন্দ নির্মাণ করেন এবং চারিদিকের ক্ষুদ্রতাকে অপূর্ব ক্ষমতাবলে বড়ো করিয়া লন। তাঁহারা হাতের কাছে যে-কিছু সামান্য মাল-মশলা পান তাহা দিয়াই নিজের জীবনকে মহৎ করেন এবং তাহাদিগকেও বৃহৎ করিয়া তোলেন। তাঁহাদের জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য, সেইজন্য তাঁহাদের জীবনী মানুষ ফেলিতে পারে না।" কবির 'সৃষ্টির সহিত সৃষ্টিকর্তাকে একটি উদার সংগীতরাজ্যে সমগ্র করিয়া' দেখানোর কাজে এবং কর্মবীরের 'জীবনের কর্মই তাঁহাদের কাব্য' এই সত্য প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারে রবীন্দ্র-জীবন আমাদের কাছে দুই কাব্যের যুগল সম্মিলনে মহত্তম প্রাপ্তি। কবিকে তার সত্য স্বরূপে দেখাতে হলে কীভাবে দেখাতে হবে তার সন্ধান পাওয়া যাবে 'চৈতালি'র 'কাব্য' নামক কবিতাটিতে। সেখানে কবি কালিদাস সম্পর্কে লিখেছেন যে, তাঁর জীবনে সুখ-দুঃখ আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, রাজসভা ষড়যন্ত্রচক্র গোপন আঘাত-এসবই নিশ্চয়ই ছিল। তাঁকে হয়ত অপমান অনাদর, অবিশ্বাস অন্যায় বিচার এবং কঠোর ক্রুর অভাব সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু কালিদাসের কবিসত্তার গৌরব তাতে অমলিনই থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় রয়েছে এখানে— "তবু সে সবার উর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্মল/ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য কমল/আনন্দের সূর্য-পানে...

'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত সমূহের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্র-জীবনচরিত রচনার মূল কথা যে, রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বোত্তম রূপের আরতি একথা প্রভাত কুমারের মতো অল্প কয়েকজনই বুঝেছেন। প্রভাতকুমার জানতেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কবির বিজ্ঞান' কবিতায় লিখেছিলেন, ".....হে অন্তরযামী,/আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। ..../তত্ত্ববিদ্ ..../কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর শিশু নাই,/শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার/অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।/একমাত্র তুমি জান এ ভবসংসারে/যে আদি গোপন তত্ত্ব—আমি কবি তারে/চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া/অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।" প্রভাতকুমার লিখছেন, "স্বদেশী যুগের দৃপ্ত রবীন্দ্রনাথের জীবনে আজ কী পরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোন অবস্থাকেই চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, চিরদিনই ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনী হইতে বৃহত্তর পরিবেষ্টনীর মধ্যে যাইবার জন্য তাঁহার মনের আকুতি। তাই আজ ক্ষুদ্র জাতীয়তার গণ্ডি ও স্বদেশের প্রতি মোহ হইতে মুক্তির জন্য মন এমন ব্যাকুল। এমনকি, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্মবেষ্টনী হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া মানবের বিশুদ্ধতম ধর্মের মধ্যে আত্মসমর্পণের জন্য অন্তরের মধ্যে আহ্বান অনুভব করিতেছেন। 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধ তাহারই অগ্রদূত। সাহিত্যের মধ্যেও আমরা নূতন সুর এখন হইতে শুনিব। তবে তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে স্থানিক, সাময়িক সমস্যাদির দ্বারা আচ্ছন্ন হয় নাই তাহা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক হইলেও মানুষ এবং এমন নিবিড়ভাবে মানুষ যে, তিনি কোনোদিন পৃথিবীর সুখ-দুঃখ আনন্দ আবেগের উচ্ছ্বাস হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারেন নাই।